

**The Ramakrishna Mission  
Institute of Culture Library**

**Presented by**

**Dr. Baridbaran Mukerji**

**RMICL-8**

**21216**











# ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ

---

ଶ୍ରୀରାଧାଲଦାସ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରଣୀତ ।

---

“ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ପିହିତଂ ଗୁହାୟାଃ  
ମହାଜ୍ଞନୋ ଯେନ ଗତଃ ସ ପଟ୍ଟାଃ ॥”

---

ଭବାନୀପୁର ।

୧୪ ନଂ ଜେଲିୟାପାଡ଼ା ରୋଡ୍

ସୁବରବନ ସଙ୍ଗେ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ୱାରା

ମୁଦ୍ରିତ ।

---

୧୨୪୫ ମାଲି ।



## বিজ্ঞাপন ।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, ধর্মতত্ত্ব লইয়া সমাজ মধ্যে নানাবিধ বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে । কতকগুলি ব্যক্তি নূতন উদ্ভাবিত “ব্রাহ্ম” ধর্মের পদ্ধতি অবলম্বন কবিয়া ভারতবর্ষীয় চিরন্তন দেব দেবীর উপাসনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি বীতরাগ ও অশ্রদ্ধাবান হইয়াছেন ; তৎপ্রতিশোধ-স্বরূপে পুরাতন ধর্ম্মানুবাগী ব্যক্তিগণ নবোদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ও তদঙ্গ স্বরূপ রীতি, নীতি ও ক্রিয়াদিবি প্রতি দ্বেষ ও বৈবিভাব প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন । যে স্থানে একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত আছে ; সেই স্থানেই তাহার প্রতিযোগিতা সাধন জন্য একটী ব্রাহ্মসভা স্থাপিত কবা হইয়াছে ; অথবা যে স্থানে নূতনরূপে একটী ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানেই যেন, তাহার প্রতিবন্ধি-স্বরূপ একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে । ধর্ম্ম আর ব্রহ্ম যেন পরস্পর বৈবিভাবাপন্ন এবং উভয়েই যেন পরস্পরকে পবাজয় কুঁবিতে ও আত্মজয় লাভে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন । একবিধ উদ্দেশ্যের অহুসরণকারী দুই সম্প্রদায়ের এই বিষ্ময়কর প্রতিকূলতার গ দৃষ্টি করিলে ধার্ম্মিকজনের অন্তঃকবণে অবশ্যই ক্ষোভের উদয় হয় । ফলিতার্থে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মে অভেদ ভাবের পরম পথানু-সন্ধাবী ব্যক্তির নিকট উভয়ই আদরণীয় । যদিও ব্রাহ্মদলাক্রান্ত বিধগ্নিগণ ধর্ম্মকে অনাদর ও ধর্ম্মদলাক্রান্ত অধার্ম্মিকগণ ব্রহ্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু নিবপেক্ষ ধার্ম্মিকগণ কখনই সেকপ আচরণ করেন না ; কারণ তাঁহারা তাঁহাদিগের সঙ্গত ধ্যেয় বস্তুকে সর্ব্বধর্ম্মের আধার স্বরূপ বলিয়া জানেন । যিনি যে ভাবে ভাবময় ঈশ্বরের ভাবনা করুন না কেন, ফলিতার্থে সকলেই সেই এক সর্ব্বেশ্বরের উপাসনা কবিয়া থাকেন ।

জ্ঞানপ্ৰণেব মধ্যে যদিও ব্যবহার-প্রণালী বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনেবা

ভাবের বড় অন্তর দেখা যায় না। অর্থাৎ দেশ কাল পাত্র ভেদে জ্ঞানের বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় না। অতএব জাতি ও পন্থাভেদে ধর্ম ও ব্রহ্ম-ভেদ জ্ঞান করা নিতান্ত হীন-বুদ্ধির কার্য। ঐ ভেদভাব পৰিহার 'পূর্বক সেই অভেদাত্মা পরমাত্মাকে ( অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম এবং যাঁহা হইতে সকল ধর্মের মর্ম প্রকাশ পাইতেছে ) আমাদের সর্বার্থ সাধনের একমাত্র উপযোগী জ্ঞান করা কর্তব্য।

ইদানীন্তন যুবকবৃন্দ প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞানাপন্ন হইয়া ধর্ম কর্মের ও ক্রিয়া-কাণ্ডের নাম শ্রবণ করিতে চাহেন না ; কিন্তু ধর্ম ও ব্রহ্ম পরস্পর বিবোধীক না এবং উভয়ের সাধনে কোন স্থানে বিরোধ ঘটে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না। কেবল এই মাত্র ভাবিয়া থাকেন, যে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন ও যাজ্ঞন করিতে হইলে হিন্দুধর্মকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিতে হয় ; হিন্দুগণও ব্রাহ্মধর্মের বিপর্ষিত আচরণ করিয়া চলেন। এই ভাব যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, করিতে হইলে অগ্রে সাকার উপাসনা যাগ যজ্ঞ ও তপস্যাদির আবশ্যক এবং তজ্জন্যই নিরাকার পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া ভজন পূজন ও সাধনাদি করিবার বিধি প্রদর্শিত হইরাছে। ঐ সকল কার্যের দ্বারা ( বিশেষতঃ যখন তাহা ঈশ্বরার্পিত-বুদ্ধিতে কৃত হয় ) চিত্তের মলাপকর্ষণ ও গুচ্ছি জন্মিলে মনুষ্যাগণ ক্রমশঃ নিগুণ ত্রিরাগাও অর্থাৎ ব্রহ্ম-যজ্ঞনাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পাবেন ; কিন্তু উপাস্য মূর্তিকে ব্রহ্মবিভূষিত ভিন্ন মনুষ্য দেহরূপে কখনই পৰিগণিত করা উচিত নহে। ব্রাহ্মদেব এতৎ সম্বন্ধে একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার আছে ; তাঁহার ঈশ্বরের সেই সকল কল্পিত মূর্তিকে বিকারময় মনুষ্যাদি-মূর্তির ন্যায় জ্ঞান করিয়া নানা মত দোষাবোপ কবেন ; এবং তদুপাসনা যে নিতান্ত অপ্রাণ তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এ দিকে তাঁহার যে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের যথার্থ অধিকার ও সামর্থ্য জন্মিয়াছে কি না, একবারও তাঁহার অন্তসন্ধান করেন না।

আমি ইতিপূর্বে সৌভাগ্য বশতঃ জনৈক পরমজ্ঞানী পরমহংসের সন্দর্শন লাভ করিয়া অশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাকে আপন নিকটে কিছুকাল রাখিয়াছিলাম। সেই সময়ে কলিকাতা নিবাসী নিত্যাধর্ম্মানুরঞ্জিকা-পত্রিকা লেখক পণ্ডিতবর ৬ নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয় আমার সহিত আত্মীয়তা থাকা প্রযুক্ত আমার তাৎকালিক কর্মস্থান হুগলিতে সর্বদা যাতায়াত করিতেন। আমরা উভয়ে একত্র হইয়া সময়ে সময়ে ঐ পরম জ্ঞানী সাধু পরমহংসকে হিন্দুধর্ম্মানুগত ক্রিয়াকাণ্ড ও উপাসনাদি সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন এবং সেই সকল কার্যের নিগূঢ় মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি কৃপা করিয়া যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কবিরত্ন মহাশয় ঐ সকল উপদেশাবলী সময়ে সময়ে বিস্তারিত করিয়া নিত্যাধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে সমাজ-মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া যে প্রকার মতভেদ ও বিতর্ক সকল উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল উপদেশ একত্রিত করিয়া প্রচার করিলে বোধ হয়, বিবাদিগণের মনে অনেক পরিমাণে সংশয়চ্ছেদ হইতে পারিবে; এই বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত ঐ সকল নিগূঢ় মর্ম্ম ও উপদেশ পুস্তকাকারে একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক “হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব” নাম দিয়া সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল মহাত্মাগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা অবশ্যই এই পুস্তক থানি পাঠ করিলে মনোমধ্যে অপার আনন্দ লাভ করিবেন এবং আমারও যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লেখকদ্বারা আমাব পুস্তকের মুদ্রণার্থ যে পরিকৃত কাপি প্রস্তুত হইয়াছিল; ভারানীপু ব চক্রবেড় শিশুবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহা দেখিয়া দিয়াছেন; আর উপক্রমণিকা অংশটি স্বয়ং লিখিয়া এই পুস্তকে সংযোজিত করিয়াছেন।

“হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব” পুস্তকে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ পুস্তক প্রচার করিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতিলাভ যে আকাশ-

কুসুমের নাথ অলীক, আমি তাহা নিমেষের নিমিত্তও বিস্মৃত নহি। তবে যে সকল মহাশয় ব্যক্তি আমাদের ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় গৌবর্ধ্বের সামগ্রী সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ইহার সার মর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, যদি এই পুস্তকদ্বারা তাঁহাদিগের এক জনেরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপকার হয়, তাহা হইলেই আমি সমস্ত যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় সকল জ্ঞান করিব।

ভবানীপুর }  
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।



## উপক্রমণিকা।

পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া সর্বকালে, সর্বদেশে, সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এক বাক্যে উত্তর করিয়াছেন, যে “ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ”। বস্তুতঃ আদিম কালাবধি বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধির অকাট্য ও চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জগতে ধর্মই সার পদার্থ। কি বেদ, কি বাইবেল, কি পুরাণ, কি কোরাণ, সকল দেশের সকল ভাষায় রচিত সর্ব প্রকার প্রধান শাস্ত্রই ধর্মের উৎকৃষ্টতা প্রখ্যানের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছে।

ধর্মের নিমিত্ত প্রতিবৎসর, প্রতিমাসে, প্রতিদিন, এমন কি সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিলে, প্রতিমুহূর্তে, পৃথিবীতে কত সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কত শত মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ কেবল ধর্মরক্ষার নিমিত্ত ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে কত শত বা কত সহস্র ব্যক্তি কেবল ধর্মের নিমিত্ত সহানু-বদনে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে ! এবং বোধ হয় চিরকালই এইরূপ করিবে। ইহা অপেক্ষা ধর্মের সারবত্তা ও উৎকৃষ্টতা



বিষয়ে আর কি অকাট্য উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।  
ফলতঃ অনিত্য ঐহিক স্বথ অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট,  
পারত্রিক স্থখের নিদান স্বরূপ ধর্ম পদার্থ যে সর্বোৎকৃষ্ট  
হইবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ ; ইহা প্রতিপন্ন করিবার  
নিমিত্ত প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতাই হয় না।

প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি যে পশ্বাদি ইতর জন্তু অপেক্ষা  
অত্যন্ত পদবীতে অধিকৃষ্ট হইয়াছে, ধর্ম-প্রবৃত্তি স্বরূপ অমূল্য  
রত্নে বিভূষিত হওয়াই তাহার সর্ব প্রধান কারণ। চিন্তা  
শক্তি, বাকশক্তি ও তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বৃত্তি, তাহার সাহায্যকারী  
মাত্র। নীতি-শাস্ত্র-বেত্তারা ধর্মহীন মানবকে পশুজাতির  
অভিন্নরূপ গণ্য করেন।

“ আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ

সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মোহি তেষামধিকো বিশেষো

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ ”

(অর্থাৎ) আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই চতুর্বিধ কার্য্যে  
পশুজাতির সহিত মানবজাতির প্রভেদ নাই। ঐ কার্য্য-  
চতুষ্টয় উভয় জাতীয় জীবের সাধারণ ধর্ম। কেবল ধর্ম কার্য্য  
বিষয়েই মানব জাতির বিশেষ প্রভেদ আছে। সুতরাং  
ধর্মহীন মানব পশুতুল্য।

ধর্ম এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবীস্থ সর্বপ্রকার  
মনুষ্যের সকল অবস্থায় ধর্মের উৎকর্ষ সমানরূপে প্রতীয়মান

হয় না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহের স্থিরতা না হয়, যাবৎ শারীরিক শক্তি বিলক্ষণ প্রবল এবং ইন্দ্রিয়গণ সবল ও কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বলবতী থাকে, তাবৎ প্রায় মনুষ্যগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। আবার, যে পর্য্যন্ত মানবমনে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের স্ফূর্তি দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও স্ফূর্তি দৃষ্ট হয় না।

জঠরানল-দগ্ধব্যক্তিকে লোভ-রিপুর সংযম বিষয়ে এবং প্রবলতর শারীরিক শক্তিমান ব্যক্তিকে “অন্যের নিকট প্রহৃত হইবে, তথাপি অন্যকে প্রহার করিবে না,” এতাদৃশ বিষয়ে, অথবা যে পূর্ণযৌবন ব্যক্তির কাম-ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল রূপে স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে বিষয় ভোগ-জনিত স্নেহের নিকৃষ্টতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা উহাদিগের মনের নিকটেও যাইতে পারে না; কেবল কর্ণে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করে মাত্র। আবার নিতান্ত অবোধ শিশুকে যদি এরূপ উপদেশ দেওয়া যায় যে, গুরুতর ব্যক্তিকে প্রণাম করিয়া তদীয় পদধূলি গ্রহণ করা অতি কর্তব্য কর্ম্ম, তবে সেই শিশু উন্মত্ত-প্রলাপবৎ আমাদিগের ঐ উপদেশবাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া হয়ত সেই গুরুতর ব্যক্তিকে সেই ক্ষণেই পদাঘাত পূর্ব্বক ক্রীড়া প্রদর্শন করিবে।

উল্লিখিতরূপে সময়-বিশেষে বা পাত্র-বিশেষে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতেই দেখা যায় না। কিন্তু

যখন সংসারের অধিকাংশ বাধার অতিক্রম হয়, যখন মনুষ্য-গণ জীবিকা-নির্বাহের স্থিরতা দেখিতে পান, যখন বার্কিক্য-বশতঃ শারীরিক শক্তি, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং আপনা হইতেই আপনার পরাধীনতা বা অন্যের সাহায্য-সাপেক্ষতা অনুভব হয়, তখনই লোকের ধর্মপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়।

ধনবান্ ব্যক্তিগণ যখন উৎকৃষ্ট খাদ্যপেয়াদি উপভোগ পূর্বক নিশ্চিন্তমনে অট্টালিকায় উপবিষ্ট হন, তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তাদৃশী অবস্থাতেও তিনি প্রকৃত সুখী হয়েন নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ যেন আরও কিছু পাইবার আশা করে। যাবৎ সেই আশা পূর্ণ না হয়, তাবৎ তাঁহার প্রকৃত সুখ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই আশা “ধর্ম জিজ্ঞাসা” এবং সেই আশার বিষয় “ধর্ম” ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

এইরূপে ধর্মপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইলেই, প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রণালীসকলের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট কোনটী বা নিকৃষ্ট, তাহা জ্ঞানিবার ইচ্ছা মানব মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী প্রচলিত আছে। যাহারা ঐ সকল সংবাদ জানেন, অথবা তত্তদধর্ম্ম বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একবার সেই সকল ধর্ম্মের বলাবল বিচার করিতে চান, তাহার সন্দেহ নাই।

“স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

পরধৰ্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।” \*

( অর্থাৎ ) উৎকৃষ্ট রূপে পরধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধৰ্ম্মে থাকিয়া যদি নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ-কল্প।

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় শাসন বাক্য সকল আমাদিগের মস্তকো-পরি যতই বলবৎ থাকুক না, আমাদিগকে ধর্ম্মান্তরের আলোচনা করিতে দেখিয়া আমাদিগের অভিভাবক মহাশয়েরা যতই বিরক্ত হউন না, সামাজিক-শাসন আমাদিগের উপরি যতই কর্তৃত্ব করুক না, আমাদিগের মন এমনই স্বাধীন যে, তাহা সকল শাসনকে অতিক্রম করিয়া অন্ততঃ নির্ভ্রনে বসিয়াও একবার চিন্তা করিবে, যে চিরপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, অথবা নব্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট, কিন্না হিন্দু-ধর্ম্ম সমদ্রুত বৌদ্ধ ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট ? কাহারই এরূপ ক্ষমতা নাই যে, এরূপ স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত করে।

আমাদিগের মনের ঐরূপ স্বাধীন চিন্তার এই ফল হয়, যে যাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির যেরূপ সীমা, অথবা যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি বা মমোর্ত্তি, তিনি তদুপযোগিনী ধর্ম্ম-প্রণালীকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, উপভোগস্পৃহার চরিতার্থতা এবং

অপরাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, অথচ একটী অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য ধর্মের অনুষ্ঠান হইবে, যাঁহাদিগের একরূপ প্রবৃত্তি, অথবা জ্ঞান ও বুদ্ধির এই পর্য্যন্ত সীমা, তাঁহারা হয়ত প্রচলিত নব্য-ব্রাহ্ম ধর্ম বা “স্বৈচ্ছাচার” ধর্মের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হন। আবার যাঁহার পরদুঃখ হরণেচ্ছা-প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী, তিনি দেখিতে পান যে, কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টিয়, কি মুসলমান, কি নব্য ব্রাহ্ম ধর্ম, সর্বত্রই পশ্বাদির জীবন-বিনাশের ব্যবস্থা রহিয়াছে, অথবা তদ্বিষয়ে বিশেষ নিষেধ নাই। তিনি,

“অহিংসা পরমো ধর্মঃ।”

( অর্থাৎ ) জীবের প্রতি হিংসা না করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম, এই ধর্ম-সূত্র যে বৌদ্ধ ধর্মের মূল, তাহারই দিকে আকৃষ্ট হন। এইরূপে চিরকাল এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও আপন আপন প্রকৃতির দাস হইয়া রক্ষা করিতে গিয়া ধর্মাস্তর অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ স্বাধীন-ভাবে ধর্মোন্নয়ন প্রবৃত্তি হইতে যে যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে, তাহা সমভাবাপন্ন নহে। স্থূলতঃ উহা দুই প্রকার। গভীর-বুদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম জিজ্ঞাসার একবিধ ফল; চঞ্চল-বুদ্ধিতে ধর্ম পরিবর্তন চেষ্টার অন্যবিধ ফল। শেষোক্ত প্রণালীতে ধর্মের বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়।

উপরি বর্ণিত প্রকারে স্বাধীন ভাবে ধর্ম চর্চা করিতে গিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় বুদ্ধিমান তত্ত্বানুসন্ধানী ব্যক্তি যে কিছু ধর্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন বা করিতেছেন,

প্রকৃত পক্ষে তাহা ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যতই ধর্ম-চর্চা করিতেছেন, আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্মের যতই সংস্কার করিতেছেন, ততই তাহা হিন্দুধর্ম রূপে পরিণত হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে, ইহার সূত্র করিতে হইলে, অগ্রে ধর্ম-পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ আবশ্যক হইয়া উঠে। ধর্ম কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রদান করিতে পারেন ; কিন্তু “জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যই ধর্ম” এরূপ সূত্র সর্ব্ববাদি-সম্মত, তাহার সংশয় নাই। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী ধর্মকে অর্থাৎ ঐ চতুর্বিধ শাস্ত্রে সামঞ্জস্যরূপে জগদীশ্বরের যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, তাহাকে “হিন্দুধর্ম” বলা যায়। “হিন্দু” এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে \* । ফলতঃ ভারতবর্ষবাসী আৰ্য্য-জাতিরই নামান্তর হিন্দু, এ বিষয়ে মত-ভেদ নাই।

হিন্দুধর্ম বা সনাতন বৈদিকধর্ম পৃথিবীতে কত কাল উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্ত

\* কোন মতে “হিন্দু” শব্দটি সংস্কৃত ও চির প্রচলিত। অন্যমতে প্রাচীন ইংরাজী ভাষাতে “হেন্দু” শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায় পুস্তক দেখ।

একরূপ, + প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী দূরদর্শী ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত  
অন্যরূপ। হিন্দুধর্ম-প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র যে ভাষায় রচিত,  
তাহার জন্মকাল নির্ণয় করিতে গিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ  
ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মস্তক বিষুর্গিত হইয়াছে। আবার  
বেদ শাস্ত্র যখন গ্রন্থাকারে পরিণত ছিল না, “শ্রুতি” নামে  
গুরু-পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিতে ছিল, সেই সময়ের  
নির্দেশ কে করিতে পারে? ফলতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম কতকাল  
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। ইহা অনন্তপ্রায়-সুদীর্ঘ-  
কাল পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণকার অতি প্রামাণিক ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্যা দ্বারা সপ্রমাণ  
হইয়াছে যে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা প্রচ-  
লিত আছে, বৈদিক ভাষা তাহার মূলস্বরূপ এবং যত প্রকার  
ধর্ম প্রচলিত আছে, সে সকল একমাত্র আর্য্যধর্মের রূপান্তর  
মাত্র। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কোথাও কেবল রূপান্ত-  
রিত, কোথাও বিকৃত, কোথাও অর্দ্ধ-বিকৃত ভাবে পরিণত  
হইয়াছে।

অতি পূর্বের ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতি বা হিন্দুজাতি ধর্ম-  
বিস্তার, রাজ্য-বিস্তার ও বাণিজ্য-বিস্তারাদি উপলক্ষে পৃথিবীর  
বর্তমান চারি মহাদেশে যাতায়াত করিতেন। সুতরাং “অতি  
পূর্বের হিন্দুধর্ম ও আংশিকরূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া-

---

+ কোলকাতা সাহেবের মতে খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্বের বেদ রচিত হয়।  
খৃষ্টাব্দাবলম্বী অনেকের সিদ্ধান্ত যে, ৫ হাজার বৎসর সময়ের মধ্যে।

ছিল, এরূপ অনুমান চিত্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট অন্ধ হইয়াছে।

হিন্দুজাতির সমস্ত পৃথিবীতে যাতায়াত বিষয়ে, মহাভারত রামায়ণ, ভাগবত, মৎস্য-পুরাণ, রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থ, দেশপর্যটক পুরাণ-পুরাণ নামক সম্রাসীর বর্ণনা এবং ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন-কালীন তাম্র-ফলকাদি ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ সকল স্বাক্ষ্য প্রদান করে।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু রাজার ১১৫ পুত্র মেরু পর্বতের উত্তরে এবং ১১৪ পুত্র মেরু পর্বতের দক্ষিণে রাজ্য করেন।

রামায়ণ আদিকাণ্ড ৬২ সর্গে কথিত হইয়াছে যে, পরশুরাম স্রমেরু পর্বতে তপস্যা করিতেন।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারে প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিক ক্ষুদ্র বোখারা দেশস্থ উন্নত পর্বতই পৌরাণিক “স্রমেরু পর্বত।”

ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত তাম্রফলক দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে জেনিসি নদীর তীরস্থ কুষজক্ষনগরে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজধানী ছিল।

মহাভারতের বর্ণনানুসারে পাণ্ডু-পুত্র ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব বর্তমান আসিয়া মহাদেশের প্রায় সকল দেশই জয় করিয়াছিলেন।

পুরাণ পুরী নামক সম্রাসী আসিয়ার ব্রহ্মদেশ হইতে ইউরোপীয় রুসিয়ার মস্কো নগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি



লিখিয়াছেন যে, “তুরস্ক” দেশের বসোরা নগরে “কল্যাণ রাও” ও “গোবিন্দ রাও” নামক দুই দেবমূর্তি আছে। “পারস্য” দেশের হিঙ্গুলাজ নগরে, “তাতার” দেশের বাখ নগরে, আসিয়িক রুসিয়ার আষ্ট্রাকান নগরে, এবং জাবা-দ্বীপ, বালিদ্বীপ ও খরক উপদ্বীপে বহুতর হিন্দু বাস করিতেছেন।

রোম দেশীয় পণ্ডিত জ্রাবো ও ডাইরো লেখেন, যে খ্রীষ্টাব্দের ২০ বৎসর পূর্বে পণ্ডিয়ন রাজা রোমীয় সম্রাট আগষ্টস সীজরের নিকট যে দূত প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে এক জনের নাম “খড়গ শম্মী”।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কোন স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে তাত্ত্বফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টাব্দের ২২০০ বাইশ শত বৎসর পূর্বে হিন্দুজাতি ইউরোপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ঐ তাত্ত্বফলক এক্ষণে ইংলণ্ডের চিত্রশালিকায় আছে।

বিশ্ব-ইতিহাস-লেখক টাইটেলার এবং প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত মনসেয়ার বেলী লেখেন যে, আফ্রিকা মহাদেশস্থ ঈজিপ্ট ও কালডিয়া দেশে যে যে বিদ্যা প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষই তাহার বিদ্যালয়স্বরূপ।

পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, বলিরাজা ও পুরুবংশীয় কোন কোন রাজা পাতালে বাস করিতেন। মহাভারতের

বর্ণনা এই যে, ভীমসেন পাতালে গমন করেন। বর্তমান সময়ের প্রচলিত ভূগোল-শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইতেছে যে, আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ অংশে দুইটি প্রদেশের নাম পুরুভিয়া ও বলিভিয়া। তথাকার অধিবাসীরা আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অনেকাংশে হিন্দুজাতির সদৃশ। তাহারা অদ্যাপি রাম-সীতার পূজা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় “পাত” শব্দের একটি অর্থ—উদ্ধাধভাবে অবস্থিত। ব্যাকরণের যে সূত্রানুসারে বাচ্ শব্দ হইতে “বাচাল” শব্দ সিদ্ধ হয়, সেই সূত্র অনুসারে “পাত” শব্দ হইতে “পাতাল” শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। পৌরাণিক বর্ণনা, পাতাল শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং আমেরিকার প্রচলিত ভূগোল র্তাস্ত একত্র অনুধাবন করিতে গেলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে আধুনিক আমেরিকা নামক স্থানই পূর্বকালে “পাতাল” শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছিল; এবং সংস্কৃত “পুরুভূমি” শব্দের অপভ্রংশে পুরুভিয়া ও “বলিভূমি” শব্দের অপভ্রংশে বলিভিয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ যে হিন্দুজাতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে পৃথিবীকে কদম্বকুসুমাকার পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আমেরিকাই যে তাঁহাদিগের পাতাল, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণই নাই।

এই সকল ও এতাদৃশ অন্যান্য প্রমাণপ্রয়োগ দৃষ্টি করিলে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, পূর্বকালে সমস্ত পৃথিবীতেই হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

আদিম কালীন হিন্দু জাতীয় ব্যক্তির। চরম জ্ঞানী, চরম ধার্মিক এবং প্রায় চরম সভ্য হইয়াছিলেন।

অদ্বিতীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনার পরিচায়ক বেদশাস্ত্র, উপনিষৎ শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্র সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ।

মানববুদ্ধির অদ্বিতীয় গৌরবের সামগ্রী, সারবান্ প্রকৃত “ব্রাহ্মধর্ম” হিন্দু জাতিরই জ্ঞানচর্চা হইতে সম্ভূত।

হিন্দু জাতি কেবল ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহারা অপরিত্যজ্যবৎ সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যবদনে কোপীন ধারণ পূর্বক বনবাস-আশ্রয় করিতেন ; সমুদ্রেবৎ বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র সকল তাহা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতেছে।

শাস্ত্রে প্রমাণিত হইতেছে যে, সভ্যতাসাধনের উপকরণ স্বরূপ ব্যোমযান, দূরবীক্ষণ, গ্লোব, ঘটিকা, তাপমান, বায়ুমান এবং দিগদর্শন যন্ত্র প্রথমে হিন্দু জাতিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। \*

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কুসংস্কার-রহিত জ্ঞান, মার্জিত ধর্ম এবং পরিশুদ্ধরূপ কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যই প্রকৃত সভ্যতা নামক পদার্থের উপাদান। জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলে আদিম হিন্দু জাতিতে ঐ সকলেরই বিদ্যমানতা দেখা যায়।

---

\* সংস্কৃত ভাষায় উল্লিখিত “শিল্প সংহিতা” এবং “সূর্য্য সিদ্ধান্ত” গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালে সকল পদার্থেরই লয় হয়। তদনুসারে হিন্দু-জাতির উল্লিখিত উচ্চতম অবস্থা যুগে যুগে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে বর্তমান কলিযুগে যবনাদি জাতির অত্যাচারে প্রায় লোপ প্রাপ্ত হয়।

ইতিহাসবেত্তারা হিন্দুধর্মের ঐরূপ প্রলয়াবস্থা সর্বিশেষ অবগত আছেন। নিতান্ত সংক্ষেপে নির্দেশ করিলে, খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ৫১৮ বৎসর হইতে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২৩০০ বৎসর কাল যবনজাতির অত্যাচার এবং ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে বর্তমান ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১১০ বৎসর কাল খ্রীষ্টীয়জাতির প্রবর্তনা হিন্দু-ধর্ম-সংক্রান্ত ছুরবছার মূল কারণ।

যখন দীর্ঘকালব্যাপিনী মহাপ্রলয়-ঝঞ্ঝার ন্যায় যবন-জাতির অধিকার রূপ পাপ-রাশির আগমন দর্শনে নির্মূল জ্ঞান ও সভ্যতার দর্পণস্বরূপ পবিত্র ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পলায়ন করেন, তদবধি কাহারই মনে এরূপ প্রত্যাশা নাই যে, এই হতভাগ্য ভারতভূমিতে আর কস্মিন্‌কালে, যুতপ্রায় সনাতন হিন্দুধর্ম জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে ইউরোপীয় জাতির রাজ্য উপস্থিত হওয়াতে ভারতবর্ষে বিবিধ বিদ্যার চর্চা এবং তদ্বারা পুনরায় অপেক্ষাকৃত ধর্ম চর্চা অধিক হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ বিকৃত ও লুপ্তপ্রায় হইতেছে।

এইরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, বিজাতীয় রাজার নিকট হিন্দুধর্মের প্রশংসা নাই ; প্রত্যা ত নিন্দা ও অবজ্ঞা আছে ।

দ্বিতীয়তঃ, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুধর্মের অধিক অনুষ্ঠাতা অথবা অধিক উৎসাহদাতা, তাঁহাদিগের জীবিকা নির্বাহ হওয়া কঠিন । এদিকে যে সকল ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করেন অথবা খৃষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও হিন্দু ধর্মের প্রতি বিলক্ষণ বিরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ই রাজ-দ্বারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন এবং অধিক অর্থজনক বিষয়কার্যের অধিকারী হন ।

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত নব্য ব্রাহ্ম ধর্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম সর্বদাই হিন্দু ধর্মের প্ৰাণি করিয়া থাকে, অথচ অনেক বুদ্ধিমান লোকে ব্রাহ্মধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াও গণ্য করেন । সুতরাং ঐ সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকের মন বিচলিত হইতেছে ।

চতুর্থতঃ, হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ আছে, এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম করা অর্থব্যয়সাধ্যও বটে ; খৃষ্টীয় ও নব্য ব্রাহ্মধর্মে তাহার বিপরীত ভাব । সুতরাং অলসপ্রকৃতি এবং ব্যয়কুণ্ঠ লোকেরা হিন্দুধর্মে বীত-শ্রদ্ধ হইতেছে ।

ফলতঃ যে কার্যের অনুষ্ঠান করিলে পুরস্কার নাই, প্রত্যা ত তিরস্কার আছে, যাহার অনুষ্ঠান না করিলে তিরস্কার নাই, প্রত্যা ত পুরস্কার আছে, তাহার যে অবনতি হইবে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানাপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহার চারিটি প্রধান কারণ নির্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

ক। খ্রীষ্টিয়দিগের প্রকৃত হিন্দুধর্মে অনভিজ্ঞতা। হিন্দুধর্মের যুতপ্রায় অবস্থাতেই এতদ্দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মের আগমন হয়। তৎকালে, হিন্দু ধর্মের গুণ-গৌরব ও আভিজাত্যের পরিচায়ক অত্রাস্তপত্রিকা স্বরূপ বেদ, উপনিষৎ, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্র সকল, ছিন্ন ভিন্ন ও লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। তাহাদিগের গৌরব-কীর্তনে প্রকৃতপ্রতিজ্ঞ হিন্দু-পণ্ডিতচূড়ামণিদিগের অমূল্য উত্তমাস্ত্র সকল কালমূর্ত্তি যবন-জাতির অপবিত্র তরবারিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। যে আর্য্যশোণিতের প্রত্যেক বিন্দুতে গভীর জ্ঞান নিহিত, তাহা তখন ভারতবর্ষে স্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। সুতরাং একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তির নিকট আপনার পাণ্ডিত্য বা আভিজাত্যের যতটুকু পরিচয় দিতে পারে, অপরিচিত খ্রীষ্টীয় জাতির নিকট মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম তৎকালে তাহার অধিক পরিচয় দিতে সমর্থ হয় নাই। খ্রীষ্টীয়েরা যেমন বুঝিলেন, তাহাতে ইহাকে অসার বলিয়াই বোধ করিলেন।

খ। বাইবেল শাস্ত্রের উপদেশানুসারে খ্রীষ্টিয়দিগের যে কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ।

যাহারা বাল্যকাল হইতে ধর্ম শাস্ত্রে একরূপ উপদেশ পাইয়াছেন যে, প্রকারান্তরে মদ্যপান দোষাবহ নহে ; আহারার্থে পশাদি জীব হত্যা করা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য ; যে কোন প্রকার সাকার দেব দেবীর আরাধনা নরকগমনের কারণ ; তাহাদিগের পক্ষে আজন্মপরিচিত ঐ সকল কুসংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ হইতে পারে না ।

গ। আপনাদিগের সিদ্ধান্তে মত্ততা—ইহার তৃতীয় কারণ স্বরূপ ।

খ্রীষ্টীয় জাতি যদবধি বন্য পশুর অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ উপায়ে আপনাদিগের বাহ্য উন্নতি সাধন করিতেছেন, তদবধি এপর্য্যন্ত ইহাদিগের কর্তৃত্বের উপর কেহই ব্যাঘাত প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই । সুতরাং ইহারা আপনাদিগের ধর্ম বিষয়ক সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক হইতে পারে, ইহা ভাবিতেও ইচ্ছা করেন না ।

ঘ। প্রকৃত ধর্মপ্রবৃত্তির হীনতা এবং কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধ প্রবলতা ও জন্মভূমি-ঘটিত জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা, ইহার চতুর্থ কারণ ।

ইউরোপ যে প্রকার শীতপ্রধান দেশ, তাহাতে তথায় মদ্য মাংসাদি আহার না করিলে, মানুষের শরীর রক্ষা হইতে পারে না । জন্মাবধি মদ্য মাংসাদি ব্যবহার যাহাদিগের অভ্যাস, তাহাদিগের কাম, ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ও জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হইবে, ইহা জগদীশ্বরের অখণ্ডনীয়

প্রাকৃতিক নিয়ম। দয়া, ন্যায়পরতা, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম-প্রবৃত্তি সকল কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিরোধী; সুতরাং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা থাকিলেই ধর্ম-প্রবৃত্তির হীনতা থাকিবে, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম।

এক্ষণে, যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সারাংশ বলিয়া গণ্য, হিন্দুধর্ম হইতেই বাহার উৎপত্তি, তাহাই আবার হিন্দুধর্মের মূলোচ্ছেদনে কৃত সংকল্প হইয়াছে; এরূপ অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ কি, তাহা নির্দেশ করা যাইতেছে;—

প্রথমতঃ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বাহা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম, তাহা বস্তুতঃই সাকার উপাসনারূপ হিন্দুধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং সকলের মনেই তাহার উৎকর্ষ অনুভব হওয়া এবং বস্তুত্ব দ্বারা অন্যের নিকট তাহার উৎকর্ষ প্রখ্যাপন করিতে সমর্থ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ ধর্মানুষ্ঠানে সমর্থ বা অধিকারী এবং প্রকৃত-রূপে তাহার অনুষ্ঠান না হইলে, মনুষ্যের ও সমাজের ইচ্ছা কি অনিষ্ট সাধন হইবে, নব্য ব্রাহ্মধর্মীরা তাহা অনুধাবন না করাতেই নব্য ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী হইয়াছেন।

মুখ্য ব্যক্তি অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি অধিক মাননীয় বটে, কিন্তু তাহাই ভাবিয়া যদি মুখ্য ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কি তাহারা সম্মানের পরিবর্তে উপহাস প্রাপ্ত হয় না?

দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ কারণে এতদ্দেশের প্রচলিত হিন্দুধর্ম-



মধ্যে এত পরিমাণে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে যে, কিছুকাল হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বক্তৃতা না করিলে ঐ সকল কুসংস্কারের নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্তও বিষয়-বিশেষে কোন কোন হিতৈষী ব্রাহ্মধর্মী ব্যক্তি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

কোন কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী অতি নীচজাতীয় ও নীচ কর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের এইরূপ সংস্কার যে, তাহারা ধর্মকার্য্য বলিয়া যে সকল জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা বস্তুতঃ অতি সৎকার্য্য এবং অন্য সম্প্রদায়ী উৎকৃষ্ট জাতীয় অতি সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও তাহাদিগের অনুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করেন না বলিয়া তাহারা অতি অশ্রদ্ধেয়।

এইরূপ মহা-অনিষ্টকারী বাল্য-বিবাহ এবং বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মজাতির মধ্যে অতি জঘন্য কোলিন্য প্রথা ইত্যাদি কুসংস্কার এরূপ প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, কিয়ৎকাল একবারে সমস্ত হিন্দুধর্মের উপর বিরুদ্ধ-বক্তৃতারূপ কুঠারাঘাত না করিলে উহা নিবারিত হওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্মের বিকৃতি স্বরূপ প্রচলিত “নব্য ব্রাহ্মধর্ম” বা স্বেচ্ছাচার ধর্ম পূর্বোন্নিখিত খ্রীষ্টীয় ধর্মের ন্যায় সুখসাধ্য। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির ধর্মপ্রবৃত্তি নিতান্ত অল্প, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী, তাহারা কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে ঐ ধর্ম-প্রণালীতে অনুরক্ত হইয়া আপনা-

দিগের দলপুষ্টি করিবার নিমিত্ত সাধারণের নিকট হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছে।

প্রচলিত নব্য ব্রাহ্ম বা স্বেচ্ছাচার ধর্মের মতে ঈশ্বরো-  
পাসনা বিষয়ে নিয়ম নাই; যবন স্বেচ্ছাদি জাতির নিয়ম  
নাই, অর্থাৎ সকল জাতিরই এই কার্যে অধিকার আছে।  
স্ত্রী পুরুষের নিয়ম নাই, ব্রত উপবাস নাই; আহার ব্যবহার  
বিষয়ক কোন বিচারের আবশ্যিকতা নাই; মদ্য মাংসাদি  
ভোজনে বিশেষ বাধা নাই। যে কোন দিবসে হউক, এক-  
বার ব্রাহ্ম সভায় গিয়া মুখে বলিলেই হইবে যে, “একমাত্র  
পরব্রহ্ম আছেন।” অনন্তর সকল কার্যই চলিবে।  
সাংসারিক কোন কার্যের ব্যাঘাত নাই। অভিলষিত কার্য-  
সাধনের কোন বাধা জন্মিবে না। যদি এতাদৃশ অনিয়মে  
ধর্মরক্ষা হয়, তবে নিয়ম-পাশে বদ্ধ হইয়া অহরহ ক্লেশ  
স্বীকার পূর্বক যে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে হয়, তাহাতে লোকের  
প্রবৃত্তি হইবে কেন?

উল্লিখিত কারণপরম্পরা হইতে বর্তমান সময়ে হিন্দু-  
ধর্মের যে রূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার  
উল্লেখ করা যাইতেছে;—

( ১ ) খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক অধিকাংশ ব্যক্তি, যাহারা  
ধর্মাস্তরের অকাট্য যুক্তিকেও শ্রবণ করিবেন না এবং নিজ  
ধর্মের নিতান্ত অসার যুক্তিকেও প্রবল বলিয়া মানিবেন, মনে  
মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াই নিজ কার্যে ব্রতী হইয়া-

ছেন, ইহারা ও “উন্নতিশীল” এই সাড়ম্বর নামধারী স্বেচ্ছা-চারী নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায় নিরবধি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ বক্তৃতা-রূপে শাণিত তরবারি দ্বারা আবালবৃদ্ধ হিন্দুজাতির একীভূত অন্তঃকরণকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে।

( ২ ) একমাত্র হিন্দুধর্ম শৈব শাক্তাদি পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হিন্দুজাতির চরম লক্ষ্য একমাত্র জগদীশ্বর সকলেরই লক্ষ্য পদার্থ। কিন্তু যদবধি হিন্দুধর্মে বিকার রোগের সূত্রপাত হইয়াছে, তদবধি বহুসংখ্যক বিভিন্নপ্রকৃতি ধর্ম-প্রচারক, আপন আপন প্রকৃতির অনুযায়ী উপদেশ দ্বারা এই এক পথাবলম্বী ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে কেমন ভয়ানক বিদে-ষায়ী প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণ-বাদির মধ্যে কোন এক ধর্মাবলম্বী নীচতম ব্যক্তি ও অন্য এক ধর্মাবলম্বী উচ্চতম ব্যক্তিকে অহিন্দু ও পাপাচারী ব্যক্তির ন্যায় ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে।

( ৩ ) নির্বোধ ও হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বালকেরা একবারে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া চির-প্রত্যাশাকারী পিতাকে চিরকালের জন্য নিরাশ এবং উপায়াক্ষা স্নেহময়ী জননীকে চিরকালের নিমিত্ত শোকমাগ-রের অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া পলায়ন করিতেছে।

( ৪ ) যে সতীত্বের প্রতিমূর্তি-স্বরূপ হিন্দুরমণীগণের পবিত্র চরিত্রের বিষয় ইতিহাসে পাঠ করিলে ধার্মিক ব্যক্তি-গণের অন্তঃকরণে পবিত্রতার উদয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়,

ধর্মধর্মের দূতীগণ কলে কৌশলে হিন্দুগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই হিন্দুজাতীয় রমণীগণের সরল উর্বর ও কোমল চিত্তক্ষেত্রে, আমাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত অস-  
তীত্বের বীজ, যাহার নাম স্বাধীনতা বা পূর্ণ সভ্যতা রাখিয়াছে,  
বপন করিতেছে।

( ৫ ) লোকে ধর্মবোধে যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, কিরূপ মর্মান্তিক কষ্ট হয়, তাহা পৃথিবীস্থ যে কোন ধর্মাবলম্বী যাবতীয় ব্যক্তিই জানেন ; কিন্তু সম্প্রতি, অন্যে পরে কা কথা, বিজাতীয় ধর্মের উপদেশে বিকৃতপ্রকৃতি ঔরস পুত্রেরাও বৃদ্ধ পিতার ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে অহোরাত্র অবজ্ঞা করিতেছে।

( ৬ ) গৃহস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে আপন আবাস বাটী যেমন শান্তি ও সুখের স্থান, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু এক্ষণে তথায় এক এক জন পরিবার এক এক ধর্ম্মাবলম্বী। কেহ নাস্তিক, কেহ অর্দ্ধ-নাস্তিক, কেহ খৃষ্টান, কেহ অর্দ্ধ খৃষ্টান, কেহ উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, কেহ বা তাহার অর্দ্ধাংশ। সুতরাং সেই শান্তিনিকেতনে অহোরাত্র বিবাদ ও বিষাদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

( ৭ ) গ্রামস্থ বা দেশস্থ ব্যক্তি যে স্বগ্রামস্থ বা দেশস্থের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবেন, কোন্ ব্যক্তি এরূপ প্রত্যাশা না করেন ? কিন্তু এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের এমনই দুর্ব্বস্থা যে, গ্রামস্থ ও দেশীয় ব্যক্তিরাই স্বগ্রামস্থ ও

অদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অধিকতররূপে শত্রুভাব প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালীর নিন্দাবাদ কাহার কণ বধির-প্রায় না করিতেছে।

( ৮ ) হিন্দুসম্প্রদায়সকলের দৃঢ় বন্ধনীস্বরূপ জাতিভেদের শিথিলতা উপস্থিত হওয়াতে, এক্ষণে হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাজ্য ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। শিষ্যগণ আর পরমারাধ্য গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করে না। রজকেরা বস্ত্র পরিষ্কার এবং ক্ষৌরকারেরা ক্ষৌর-কার্য পরিত্যাগ করিতেছে। ডোমেরা বেদপাঠ করিবার নিমিত্ত যত্নবান। ব্রাহ্মণদিগের ডোমের নির্ম্মাতব্য বস্তু সকল স্বহস্তে প্রস্তুত না করিলে, সংসার চলা ভার হইয়াছে।

এইরূপ শত শত প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অন্ত্রবিধা হিন্দুধর্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া হিন্দুসমাজকে দক্ষ করিতেছে।

কৌতুকের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কলিযুগে চিরপবিত্র ভারতবর্ষের যে এইরূপ ছুরবস্থা ঘটিবে, তাহাও অতি পূর্ব্বকালীন আৰ্য্যজাতির জ্ঞাননেত্রের অগোচর ছিল না। তাঁহারা শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন যে,

“ কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যানে বিজর্ষভাঃ ।

য়েচ্ছানীকাঃ স্বেতবর্ণাঃ শূরা বস্ত্রোপশোভিনাঃ !

ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌ বৈ বেদনিন্দকাঃ ॥ ”

কলিযুগের প্রথমাবধি পঞ্চ সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন  
কালে স্বেতবর্ণ, অতি বলিষ্ঠ, সৰ্বভরণশূন্য, কেবল বস্ত্রো-  
পশোভী, বেদাদি ধর্মশাস্ত্রের নিন্দাকারী স্লেচ্ছ সৈন্যেরা  
পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে।

“অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ।

সৰ্কে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।

নানুগচ্ছন্তি মৈত্রেয় শিম্বোদরপরায়ণাঃ।

বেদবাদরতাঃ শূদ্রা বিপ্রা যবনসেবিনাঃ।

স্বচ্ছন্দাচারিণঃ সৰ্কে বেদমার্গবহিকৃতাঃ।

স্লেচ্ছোচ্ছিষ্টোন্নভোক্তারঃ সৰ্কে স্লেচ্ছাঃ কলৌ যুগে ॥”\*

কলিযুগে অন্ন বিচার, বিশেষতঃ যোনির বিচার থাকিবে  
না। সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া বাদানুবাদ করিবে, কিন্তু  
যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের পথেও গমন করিবে না; কেবল শিম্বোদর-  
পরায়ণ হইয়া কালযাপন করিবে। শূদ্রেরা শাস্ত্রাতিক্রম  
করিয়া বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইবে, ও তাহার প্রকৃত অর্থ অবগত  
না হইয়া অর্থবাদকেই প্রকৃত অর্থ জ্ঞান করিয়া বেদমার্গ পরি-  
ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণেরা যবনের সেবা করিবে। ফলতঃ  
সর্বজাতীয় ব্যক্তিই বেদমার্গ বহিকৃত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া  
স্লেচ্ছদিগের উচ্ছিষ্ট অন্নাদি ভোজন করত স্লেচ্ছ হইয়া  
যাইবে।

বর্তমান সময়ের অবস্থার সহিত শাস্ত্রীয় ভবিষ্যৎ বাণীর

মিলন করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

নিতান্ত নিঃসহায় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে, বৈদেশিক পণ্ডিতের পক্ষে সম্বলস্বরূপ ধনসম্পত্তি যেমন মহোপকারী, জীবন রক্ষার যেমন অধিতীয় উপায়, একান্ত নিঃসহায় অনন্তসংসারে অনন্ত কালের নিমিত্ত ভ্রমণ-প্রবৃত্ত আমাদিগের অমর জীবাত্মা ধর্মসম্পত্তিকে সম্বল স্বরূপ লইয়া না চলিলে, তাহার কি দুঃবস্থা হইবে, তাহা ভাবিলে চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট মানবজাতির মর্ম বিদারণ করিবে, সন্দেহ কি ? অতএব হিন্দু-জাতীয় আত্মহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে কিরূপ পদার্থ, কিরূপে ইহার চর্চা করিতে হয়, এবং বিজাতীয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা ইহার যাহা কিছু দোষ বাখ্যা করেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং জ্ঞানলাভানন্তর নিজেই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করা অল্প দিনের, অল্প যত্ন ও অল্প পরিশ্রমের কার্য্য নহে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম কিরূপ পদার্থ তাহা জানিতে হইলে বহুতর শাস্ত্র পাঠের আবশ্যিকতা আছে। যথা ;—

বেদ—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামক অতি বিস্তৃত ও অতিগূঢ়ার্থ মূল ধর্মশাস্ত্র এবং তাহার বহুতর শাখা প্রশাখা।

উপনিষৎ—কঠ, মণ্ডুক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি বেদোল্লিখিত ঈশ্বরতত্ত্বের সারাংশ স্বরূপ অতি গূঢ়ার্থ প্রায় ৭০। ৭৫ খানি তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্র।

বেদান্ত—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত ও ছন্দঃ এই চারি গ্রন্থ এবং মাহেশ, পাণিনি প্রভৃতি প্রায় ১০। ১২ খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ, আর অসীমপ্রায় জ্যোতিষ গ্রন্থ, এই ষট্ প্রকার শাস্ত্র ।

গণিত ও ফলিত ভেদে জ্যোতিঃশাস্ত্র দুই প্রকার । যথা ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, সূর্যসিদ্ধান্ত এবং গোলাধায় প্রভৃতি গ্রন্থ সকল গণিত জ্যোতিষের অন্তর্গত ।

গ্রহগণের ফলাফল, অদৃষ্টের ফলাফল, ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্ণয় সংক্রান্ত গ্রন্থ সকল ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত ।

স্মৃতি—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষির প্রণীত প্রায় ৫০ খানি মূল ধর্মসংহিতা গ্রন্থ ।

পুরাণ—ভাগবত, বামন, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অষ্টাদশ গ্রন্থ ।

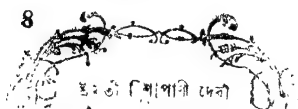
উপপুরাণ—পুরাণের অধিকাংশ লক্ষণাক্রান্ত অষ্টাদশ গ্রন্থ ।

তন্ত্র—মুণ্ডমালা, রুদ্রজামল ও কুলার্ণব প্রভৃতি অসংখ্য-প্রায় তন্ত্র সকল ।

দর্শন শাস্ত্র—চার্বাক, বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি ষোড়শ গ্রন্থ ।

ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ ।

শব্দশাস্ত্র—যাদব, মেদিনী, হড্‌ডচন্দ্র প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানি কোষ শাস্ত্র, বা অভিধান গ্রন্থ ।





এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বিদ্যা চতুষ্টয় কলাতে বিভক্ত,  
যথা,—

মঙ্গীত বিদ্যা, শারীরবিধান বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসা-  
য়ন বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি ।

উল্লিখিত শাস্ত্র সকলের মূলগ্রন্থ ভিন্ন বহুতর টীকা, বহু-  
তর টীপ্পনী, বহুতর সংগ্রহগ্রন্থ এবং প্রত্যেক সংগ্রহ গ্রন্থের  
বহুতর টীকা ও টিপ্পনী গ্রন্থ আছে ।

শাস্ত্র সকল হইতে মনুষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক বিধি  
বা নিষেধ সংগ্রহ করিতে হইলে, অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়  
লক্ষ্য করিতে হইবে ; যথা,

ক। এই সকল শাস্ত্র এক কালে ও এক ব্যক্তি কর্তৃক  
রচিত নহে । বেদশাস্ত্র অসীমবৎ অনির্দেশ্য, প্রাচীন কাল  
হইতে প্রচলিত । কোন কোন তন্ত্রশাস্ত্র বর্তমান সময়ে  
রচিত হইয়াছে ।

খ। কোন শাস্ত্র প্রধান ও কোন শাস্ত্র অপ্রধানরূপে  
গণ্য । বেদ ও স্মৃতির মধ্যে বেদ প্রধান । স্মৃতি ও পুরাণের  
মধ্যে পুরাণ প্রধান ; ইত্যাদি ।

গ। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অবিকল একরূপ নহে ।  
রসাত্মক-বাক্য প্রয়োগ সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । পূর্বকালীন  
ঘটনা অত্রিকল বর্ণন করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য । মহাভারত  
গ্রন্থ কাব্যও বটে, ইতিহাসও বটে । স্মৃতির ঐ গ্রন্থে উভয়  
প্রকার উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে ।

ঘ। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সত্য যুগের ধর্ম এক প্রকার, কলিযুগের ধর্ম অন্য প্রকার। সহজ ব্যক্তির ধর্ম একরূপ, আপদগত ব্যক্তির ধর্ম অন্য রূপ। গৃহস্থের কর্তব্য যে রূপ, সম্যাসীর কর্তব্য সে রূপ নহে।

ঙ। স্থল বিশেষে একই ব্যবস্থার “বিশেষ বিধি” ও “সাধারণ বিধি” এই দুই বিভাগ আছে। বিশেষ বিধির ব্যতিরিক্ত স্থলেই সাধারণ বিধির প্রয়োগ হইয়া থাকে।

চ। অনেক শাস্ত্রে রূপকাদি অলঙ্কার ও পরোক্ষ এবং কল্পিত বর্ণনা আছে। আমরা অন্যের মুখে কোন একটা ঘটনার যে রূপ বর্ণনা শ্রবণ করি, আমাদিগের অন্তঃকরণ তাহার অল্প অংশেই বিশ্বাস করে; ইহা মানবমনের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি, বিশ্বাসের স্বাভাবিক ধর্ম। বিশ্বাস পদার্থের এই ধর্ম লক্ষ্য করিয়াই পরমহিতৈষী হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতারা পুরাণ ও মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে ভূরি পরিমাণে “রূপক” ও “অতি-শয়োক্তি” প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ছ। হিন্দুজাতি মানবগণের প্রকৃতি-ভেদে অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার দণ্ডবিধানের মধ্যে পারিত্রিক নরকযন্ত্রণারূপ দণ্ডের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ধর্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে সর্বপ্রকার অসৎ কার্যেরই পাপজনকতা এবং পাপ-মাত্রেরই পারিত্রিক নরকভোগের কারণতা কল্পনা করিয়াছেন।

আমরা জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বহুতর ব্যক্তির নিকট এবং বহুতর শাস্ত্রে উপদেশ পাইতেছি যে,—সদা সত্য বাক্য কহিবে; অন্যের প্রতি দয়া করিবে; অন্যায় কার্য্য করিবে না; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে।” কিন্তু ইহাতে কি আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে ঐ উপদিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়? কখনই নহে।

আবার যখন আমরা শ্রবণ করি যে, “মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে সত্যের অপলাপ ও অন্য ব্যক্তিকে প্রতারণিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়; বিপন্নকে দয়া না করিলে, আপনার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় এবং লোকের নিকট অবজ্ঞা-ভাজন হইতে হয়; অন্যায় কার্য্য করিলে এক সময়ে অন্য ব্যক্তিও আমাদিগের প্রতি অন্যায় করিবে; ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন না করিলে লোকে অধার্মিক বলিয়া অখ্যাতি ঘোষণা করিবে;” তখন এই সকল ঐহিক শাসন-বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অনেকের অন্তঃকরণ কিয়ৎপরিমাণে উপদিষ্ট-পথে প্রধাবিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাতেও পরমহিতৈষী শাস্ত্রকর্তাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। কর্তব্যতার বিধান এবং অকরণের ঐহিক দণ্ড অবগত থাকিলেও সংসারে অবস্থানকালে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবার সময় মনুষ্যের রসনা সহজেই সঙ্কুচিত হয় না। অন্যের ছুঃখ দর্শনে তাহাদিগের নয়ন-যুগল অমবরত বাষ্প বিসর্জন করে না। অন্যায় কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগের

জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কৰ্মেন্দ্রিয় সকল অকৰ্মণ্য হইয়া যায় না ।  
ঈশ্বরভক্তি-বিহীন হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগের কঠোর অন্তঃ-  
করণ বিষাদ বা মলিনতায় পরিপূর্ণ হয় না !!!

তবে আর তাহাদিগের হতভাগ্য জীবাত্মার উপায় কি ?  
ইহা চিন্তা করিয়াই আমাদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী বিজ্ঞ-  
চূড়ামণি শাস্ত্র কর্তারা পরকালের অন্তিতে বিশ্বাসকারী মনুষ্য-  
দিগের পক্ষে প্রাত্যহিক সর্বপ্রকার কার্যেরই পারত্রিক দণ্ড ও  
পুরস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অর্থাৎ যে সকল অসৎ কার্যের  
প্রকৃতপক্ষে ঐহিক অনিষ্টরূপ দণ্ডই ঘটিবে, স্থল বিশেষে  
শাস্ত্র-কর্তারা তাদৃশ কার্যেরও পারত্রিক দণ্ড বিধানের ভয়  
প্রদর্শন করিয়াছেন । এইরূপ যুক্তি হইতেই হিন্দুশাস্ত্রে  
“পুতিকা ব্রহ্ম-ঘাতিকা”—পুতি শাক ভক্ষণ করিলে ব্রহ্ম-  
হত্যার পাপ হয়, ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে ।

জ। ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম-প্রবৃত্তি এত ন্যূন এবং মূঢ়তা-  
প্রযুক্ত পারত্রিক বিশ্বাস এত অল্প যে, তাহাদিগের পক্ষে  
পারত্রিক আশা বা ভয় তাদৃশ প্রবল নহে । তাহারা ঐহিক  
আশা ও ভয়েরই পরতন্ত্র । এতাদৃশ ব্যক্তির নিমিত্ত শাস্ত্রে  
পাপ-বিশেষে পারত্রিক দণ্ড ব্যতিরেকে ঐহিক দণ্ডেরও  
ব্যবস্থা হইয়াছে ।

যদি নরকের বহির্তাপ সকলের পক্ষে তত ভয়ানক বোধ  
হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে পাপ-কর্মের এত বাহুল্য  
থাকিত না । কোন্ জাতির শাসন-বাক্যে ঐহিক পাপের

ভীষণ পরিণাম বিষয়ে লোকদিগকে প্রবোধিত না করিয়াছে? যদি একবার নরকের যন্ত্রণা-বর্ণন পাঠ কর, হৃদয় কম্পিত হইবে, গাত্র উৎপলক হইবে, এবং সংসারের সমুদয় দুঃখ লঘু বোধ হইবে। তথাপি পাপাচারীদিগের পাপাণময় অন্তঃকরণে সেই ভয়ের ভীষণমূর্তি অঙ্কিত হয় না; তথাপি সে সমুদয় দুঃখ কাল্পনিক ও অপরিষ্কৃত বোধ হয়; তথাপি পরদ্রব্য হরণার্থ বিসারিত হস্ত সহজে সঙ্কুচিত হয় না। তথাপি পাপকার্য্যে বিষের ন্যায় অপরিস্রুত হয় না, ইহার কারণ কি? কিন্তু যদি বলা যায় যে, দেবভক্তি না করিলে মনুষ্যের গুণবান্ সন্তানের মত হইবে এবং তাহার আবাস স্থল নানাবিধ দুঃখের রঙ্গভূমি হইবে, তবে কোন্ মনুষ্য দেবভক্তি প্রদর্শন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ফলতঃ এই কারণেই হিন্দুর লৌকিক শুভাশুভের সহিত ধর্ম্ম কার্য্যের এক অপরিচ্ছেদ্য ও অনির্বচনীয় সম্পর্ক হইয়াছে। এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রের মতে স্ববর্ণচোর ব্যক্তি কেবল পারত্রিক দণ্ড পাইবে এমন নহে; জন্মান্তরে স্ববর্ণচোরের নখ বিস্ত্রী হইবে এবং সে ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের ঘৃণাপাত্র হইবে। ২১, ২১৬

ঝ। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক স্থলে দণ্ড পুরস্কারাদি বিষয়ে অর্থবাদ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সত্যোপলক্ষে অতিরিক্ত বর্ণন আছে।

ঞ। কোন একটি কর্তব্য কার্য্যের প্রধান ও অপ্রধানাদি বিবিধ অঙ্গ থাকিলে, তন্মধ্যে প্রধান অঙ্গই অবশ্য অমুঠেয়। অপ্রধান অঙ্গের হানি হইলে, প্রকৃত কার্য্যের হানি হয় না।

এই সকল সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিয়া হিন্দুশাস্ত্রের মৰ্মগ্রহণ  
করিতে হইবে। 212)6

পূর্বে হিন্দুধৰ্ম্ম-সংক্রান্ত যে বিবিধ শাস্ত্রের উল্লেখ করা  
গিয়াছে, ঐ সকল শাস্ত্রের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে ; হুতরাং  
এক প্রকার মাত্র শাস্ত্র পাঠ দ্বারা হিন্দুধৰ্ম্ম নির্ণীত হইতে  
পারে না ; প্রত্যুত অনেক স্থলে বৈপরীত্য ভাব নির্ণীত হইয়া  
উঠে। আবার কেবল প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কতকগুলি শাস্ত্র  
পাঠ করিলেই হইবে না। তর্ক ও যুক্তির সহিত বিচার দ্বারা  
ধৰ্ম্ম নির্ণীত হয় না।

“আৰ্যং ধৰ্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যত্তর্কেনানুসন্ধ্যন্তে স ধৰ্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥” \*

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা আৰ্য  
অর্থাৎ বেদশাস্ত্র এবং ধৰ্ম্মোপদেশ অর্থাৎ স্মৃতি-শাস্ত্রের  
অনুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধৰ্ম্ম জানিতে পারেন। ইতর  
অর্থাৎ তর্করহিত ব্যক্তি ধৰ্ম্ম অবগত হইতে পারেন না।

শাস্ত্র সকলের পরস্পর সাপেক্ষতার বহুতর প্রমাণ প্রদ-  
শিত হইতে পারে। আগম শাস্ত্রের উল্লিখিত মদ্য, মাংস,  
মুদ্রা প্রভৃতি পঞ্চোপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্য “আগমসার”  
গ্রন্থ পাঠ না করিলে স্থির হইতে পারে না।†

উল্লিখিত সাপেক্ষতা বোধের অভাবেই বিতণ্ডা দ্বারা স্বাক্

\* প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত মহাবচন।

† এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে।

বেদের একটি ঋকের অর্থান্তর করিতে গিয়া চিরকালের এক-  
ত্রিত-মূল আৰ্য্যজাতি হইতে “জরথুষ্ট্রস্প্রিতম” নামক ব্যক্তির  
প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায় বা আদিম মুসলমান জাতির সৃষ্টি  
হইয়াছে। ঐ কারণে একমাত্র হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈব  
শাক্তাদি পঞ্চবিধ উপাসক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্বতঃসিদ্ধ মানসিক প্রকৃতি অনুসারে একমাত্র মানবজীব  
অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। তদনু-  
সারেই একমাত্র হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,  
ও শূদ্র এই চারি শ্রেণী বা অন্তর্ভূত জাতির সৃষ্টি ও শাস্ত্রে  
তাহাদিগের পৃথক পৃথক কার্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রের উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ  
লইয়া বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে বিদ্বৎসমাজে তুমুল বাদানুবাদ  
চলিতেছে। অথচ এই জাতিভেদ হিন্দুধর্মের কঙ্কাল স্বরূপ। এই  
নিমিত্ত জাতিভেদ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা একান্ত আবশ্যিক।

ক। আৰ্য্য জাতীয় তীক্ষ্ণমনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডি-  
তেরা জগদীশ্বর ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদার্থকে  
সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

“দ্রব্যং গুণান্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং ।

সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥” \*

পদার্থ সাত প্রকার। যথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সম-  
বায় ও অভাব।

---

● “বৈশেষিক” দর্শনের অন্তর্গত “ভাষা পরিচ্ছেদ”।

“সীমানা” পদার্থেরই নামান্তর “জাতি” পদার্থ। জাতির  
লক্ষণ এই,—

“ নিত্য। অনেক-সমবেত। জাতি। ”

যে পদার্থ-নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, এবং  
যাহা-অনেক সংখ্যক পদার্থে সমবেত অর্থাৎ যাহা এক কালে  
একাধিক পদার্থকে বুঝায়, তাহার নাম “জাতি” ।

তাৎপর্য্য এই যে, জাতি শব্দে শ্রেণী বুঝায়। একবিধ  
একাধিক পদার্থকেই শ্রেণী শব্দে নির্দেশ করা যায়। আর  
এই দৃশ্যমান জগৎ একাধিক দ্রব্য ও একাধিক গুণাদির সমষ্টি;  
সুতরাং যাবৎ জগৎ বিনষ্ট না হইবে, তাবৎ ঐ জাতি বা  
শ্রেণী পদার্থ বিলুপ্ত হইবে না ; এই নিমিত্ত ঐ জাতি-পদার্থ  
নিত্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

( খ ) ঐ জাতি-পদার্থ প্রথমতঃ দুই প্রকার। যথা—

“ পরা ” অর্থাৎ সাধারণ জাতি এবং “ অপরা ” অর্থাৎ  
বিশেষ জাতি।

“ ব্যাপকত্বাৎ পরাপি সাং

ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ ॥ ”

যে জাতি-পদার্থ ব্যাপক অর্থাৎ বহুব্যাপী, তাহা পরা  
জাতি ; এবং যাহা ব্যাপ্য, অর্থাৎ অল্প-ব্যাপী তাহা অপরা  
জাতি।

( গ ) দ্রব্য পদার্থ ও গুণ পদার্থের ইতর বিশেষই ভিন্ন  
ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি পদার্থ উৎপন্ন হইবার কারণ।



রসায়নশাস্ত্র দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দুইটী পরমাণু সমষ্টির গুণ একবিধ, তিনটী পরমাণু সমষ্টির গুণ অন্যবিধ। এইজন্য ঐ দ্বিবিধ পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিগণিত।

সচেতন জীবদিগেরও আহারের ইতর বিশেষ এবং ব্যবহার্য জল বায়ুর ইতর বিশেষ দ্বারা শারীরিক পরমাণুদিগের অন্যথাভাব অর্থাৎ পরিবর্তন হইয়া থাকে; ইহাও শারীর-বিধান শাস্ত্রের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত। সুতরাং মনুষ্যমাত্রেয় শরীর যে একবিধ বা এক-পরিমিত পরমাণুতে নির্মিত, ইহা বলিবার উপায় নাই। অতএব “দ্রব্য ভেদে” মানব জাতির শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত হইয়াছে।

যেমন নীলপীতাদি বর্ণ এবং অগ্নমধুরাদি রস ইত্যাদি গুণভেদে অচেতনদ্রব্যপদার্থের শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ সর্ববাদিসম্মত, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদে সচেতন জীবদিগের জাতিভেদ অপরিহার্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে ঐরূপ কারণ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে,—

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবন্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যাস্মহ্॥” \*

---

\* ভগবদ্গীতা উপনিষৎ।

হে মহাবাহো ! ( অৰ্জুন ) প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অব্যয় স্বরূপ জীবাত্মাকে দেহ ধারণ করাইয়া দেহী অর্থাৎ প্রাণী রূপে (সংসারে) বদ্ধ করে ।

“চাতুর্কণ্যঃ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্মবিভাগতঃ ।

তস্য কর্তারহপি মাং বিদ্ধি কর্তার মব্যয়ম্ ॥” \*

তত্র সত্ত্বগুণ-প্রধানাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং শমদমাদীনি কার্য্যাণি । সত্ত্বমিশ্রিত-রজোগুণ-প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কার্য্যাণি । রজোমিশ্রিত-তমোগুণ-প্রধানাঃ বৈশ্যাঃ, তেষাং বাণিজ্যাদীনি কার্য্যাণি । তমোগুণ-প্রধানাঃ শূদ্রাঃ, তেষাং ত্রিবর্ণশুশ্রূষারূপাণি কার্য্যাণি ।

ভগবান বাসুদেব অৰ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে, মানব-গণের গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ বিভাগ আমারই সৃষ্ট । অতএব আমাকে ( সত্ত্বগুণ অব-

\* শম দম প্রভৃতি কার্য্য শাস্ত্রান্তরে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা—

“শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং ।

জ্ঞানং দয়াচ্যুতান্নত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥”

[ ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায় ] : —

শম, ( ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে অন্তরিস্থিরের নিগ্রহ ) দম, ( শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ) তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, আর্জব, ( সরলতা, ) জ্ঞান, ( আত্মা অনাত্মা বিষয়ক বোধ ) দয়া, অচ্যুতান্নত্ব ( ঈশ্বর ভক্তি ) ও সত্য বা ক্য এই একাদশটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম ।

স্বায় ) ঐ কার্যের কর্তা বলিয়া জানিও, অথচ ( নিষ্ঠুর অব-  
স্বায় ) আমি উহার কর্তা নহি, ইহাও জানিও ।

ঐ জাতিবিভাগ ও কার্যবিভাগ এইরূপ ;—

মানবজাতির মধ্যে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সহগুণের প্রধা-  
নতা আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; শম দম প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদের  
অবলম্বনীয় । যাঁহাদিগের কক্ষিৎ সহগুণ এবং প্রধান রূপে  
রজঃ গুণ আছে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ; শূরত্ব প্রকাশ পূর্বক  
যুদ্ধাদি কার্য্যই তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় । যাঁহাদিগের কক্ষিৎ রজো-  
গুণ এবং প্রধান রূপে তমোগুণ আছে, তাঁহারা বৈশ্য ; বাণি-  
জ্যাদি কার্য্যই তাঁহাদিগের অবলম্বনীয় । যাঁহাদিগের কেবল  
তমোগুণ প্রধানরূপে বিদ্যমান, তাঁহারা শূদ্র ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়  
ও বৈশ্য এই তিন জাতির শুশ্রূষাই তাঁহাদিগের কর্তব্য  
কৰ্ম্ম ।

শাস্ত্রান্তরে নির্দেশ আছে যে,

“ আকৃতিপ্রকৃতিগ্রাহ্য

জাতিঃ কৰ্ম্মানুসারিণী । ”

মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতি দ্বারা জাতিভেদ জানা  
যাইবে । জাতি পদার্থ মনুষ্যদিগের কৰ্ম্মের অনুসারিণী ;  
অর্থাৎ মনুষ্যেরা আপন আপন পাপ-পুণ্যাদি কার্য্যের ফল-  
স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে  
উৎপন্ন হয় ।

উল্লিখিত শাস্ত্র-ব্যবস্থাতে আকৃতি ও প্রকৃতির প্রভেদ

মনুষ্যদিগের জাতিভেদের কারণ ও লক্ষণ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জগতের প্রকৃত ঘটনার সহিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলে শাস্ত্রব্যবস্থার একান্ত যুক্তিসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়া উঠে।

ফলতঃ পূর্বলিখিত দার্শনিক সূত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, “ব্রাহ্মণ” বা “ক্ষত্রিয়” ইত্যাদি প্রত্যেক শব্দে যখন একবিধ বহুসংখ্যক প্রাণীকে বুঝাইতেছে, তখন উহা যে শ্রেণী বা জাতি শব্দের বাচ্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার দ্রব্য ও গুণের ইতর বিশেষ যদি একই জাতির অর্থাৎ সাধারণ জাতির অন্তর্গত বিশেষ জাতি উৎপন্ন হইবার কারণ হইল, তবে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট একই মনুষ্য-জাতি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা অনুভব হইতে পারে না।

জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কার্যসাধনের উপযোগী। একবিধ পদার্থ দ্বারা সাধনীয় কার্য, অন্যবিধ পদার্থ দ্বারা সাধন করা যায় না। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ মানব, যখন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, তখন তাহাদিগের সকলের দ্বারা একবিধ কার্য সাধন সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে জাতিবিশেষের পক্ষে উল্লিখিত রূপ কার্যবিশেষ অবলম্বনের আবশ্যকতা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ঘ। জাতিভেদবিষয়ে শাস্ত্রান্তরে অন্যরূপ ব্যবহাও দেখা যায়। যথা—

“লোকানাস্ত বিবৃদ্ধার্থঃ মুখবাহুকপাদতঃ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥” \*

বিধাতা, জীবদিগের বুদ্ধির নিমিত্ত আপন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

“এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাস্তুয়ঃ।

দেবো নারায়ণো নান্য একোহগ্নি বর্ণ এবচ ॥” +

পূর্বকালে, একমাত্র বেদশাস্ত্র ছিল; সকল রাক্ষসের মূল-স্বরূপ একমাত্র প্রণব ছিল; দেব সকলের মধ্যে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, অন্য কেহই ছিলেন না; (চতুর্বিধ অগ্নির মধ্যে) একমাত্র অগ্নি ছিল; (চারি বর্ণের মধ্যে) একমাত্র বর্ণ অর্থাৎ জাতি ছিল।

পূর্ব ব্যবস্থা এবং যুক্তির সহিত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে, সৃষ্টিকাল অবধি ব্রাহ্মণ চারি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির উৎপত্তি শাস্ত্রের কল্পনাবিশেষ। যথাক্রমে চারি জাতির উৎকর্ষ ও নিকর্ষ বুঝাইবার নিমিত্ত যথাক্রমে উৎকর্ষ ও নিকর্ষ হইতে উৎপত্তি এবং এই জাতি বিভাগ যে, দীর্ঘকাল হইয়াছে, তাহা বুঝাই-

\* মনুসংহিতা।

+ ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায়।

বার জন্য সৃষ্টিকালাবধি উৎপত্তির বিষয় কল্পিত হইয়াছে। আর, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগের মানসিক গুণভেদ স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী-বিভাগ সম্পন্ন হয় নাই। এই জন্য সেই সময় লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বিশেষে পূর্বকালে একমাত্র জাতির অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

ঙ। কার্য্য বিশেষ অবলম্বন দ্বারা মনুষ্য জাতির প্রকৃতির পরিবর্তন হইতে পারে। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণজাতি নিকৃষ্ট জাতির কার্য্য অবলম্বন করিলে, জাত্যন্তরে অধঃপতিত হইতে পারেন। এই জন্য শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যে যুক্তিতে উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি নিকৃষ্ট জাতির কার্য্যাবলম্বন দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইতে পারেন, সেই যুক্তিতে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিরও দীর্ঘকাল তপস্যাদি উৎকৃষ্ট জাতির কার্য্যাবলম্বন দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ কার্য্যবিশেষের অবলম্বন দ্বারা মানসিক স্বতঃসিদ্ধ সত্ত্বাদি গুণের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে। কাল-বিশেষে ব্রাহ্মণ জাতিতে শূদ্র-বৎ-প্রকৃতি এবং শূদ্র জাতিতেও ব্রাহ্মণবৎ-প্রকৃতি মানবের উৎপত্তি হইতে পারে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে যে,—

“শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।

কজিয়াজাত মেবন্ত বিদ্যাধৈশ্যাভৈথৈ চ ॥” \*

---

\* মনুসংহিতা, ১০ ম অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয় ; ব্রাহ্মণও শূদ্র হয় । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতেও এইরূপ উৎপত্তি হইতে পারে । অর্থাৎ সময় বিশেষে বিবিধ কারণে মানসিক-প্রকৃতি-পরিবর্তন দ্বারা চারি জাতির প্রত্যেক জাতি হইতে অপর তিন জাতীয় ব্যক্তির উৎপত্তি হইতে পারে ।

চ। একবিধ জাতি হইতে অন্যবিধ জাতির উৎপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু যাবৎ এক জাতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির সমান না হয়, তাবৎ কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির কার্য্য অবলম্বন করিলে তাহা স্ফূটারূপে সম্পাদিত না হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে । পণ্ডিত ব্যক্তি মুখের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন ; কিন্তু মুখ ব্যক্তি পণ্ডিতের কার্য্য নির্বাহ করিতে সমর্থ নহে । এইজন্য দূরদর্শী ও পরম হিতৈষী হিন্দু শাস্ত্র-কর্তারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,

“ জীশূদ্রবিজবন্ধু নাং ।

ত্রয়ী ন ঞ্জতিগোচরা ॥ ”

স্ত্রীলোক, শূদ্রজাতি ও বিজবন্ধু ( অর্থাৎ অসদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ) এই সকল ব্যক্তির, “ ত্রয়ী ” অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় শ্রবণের অধিকার নাই ।

এতাদৃশ ব্যবস্থা দর্শনে শাস্ত্রকর্তাদিগের জাতি-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন হইয়াছে বলিয়া আশ্চর্য্য জন্মিতে পারে । কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, উল্লিখিত বেদত্রয় যেরূপ

গূঢ়ার্থ, তাহাতে নির্বোধ ও মূঢ়প্রকৃতি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিলে, প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম উপার্জন পূর্বক উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং এতাদৃশ ব্যবস্থা দ্বারা শাস্ত্র কর্তাদিগের পক্ষপাত দূরে থাকুক, মানবমাত্রের প্রতি পরম হিতৈষিতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

( ছ ) প্রস্তাবিত স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তির প্রকৃতি-তুল্য হইয়াছে কি না, তাহা অসম্ভব-রূপে নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে।

একমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যে যে কারণে, অর্থাৎ যে মানসিক প্রকৃতি-ভেদ-রূপ গুরুতর কারণ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই কারণেই ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালীও সাধারণতঃ দুই ভাগে পরিগণিত। প্রথম, সাকার উপাসনা ; দ্বিতীয়, নিরাকার উপাসনা।

সাকার উপাসকদিগের মধ্যে প্রকৃতিভেদে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর এই পাঁচ সম্প্রদায় হইয়াছে।

ঐ কারণেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আবার আংশিক বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা, — শাক্ত সম্প্রদায়ে বীর ভাব ও পশু-ভাব ; বৈষ্ণবদিগের রামানুজ সম্প্রদায়, চৈতন্য সম্প্রদায় ইত্যাদি ; চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নেড়া, বাউল ইত্যাদি।

এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য দেখা যায়।



কতকগুলি যুক্তিপথাবলম্বী ; কতকগুলি যুক্তিপথত্যাগী  
অর্থাৎ গোড়া ।

শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উপাসনা-প্রণালী  
সকলের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমো-  
দিত ; কোনটী তদপেক্ষা নিকৃষ্ট । কোনটীতে সারাংশ  
অধিক, অসারাংশ অল্প ; কোনটীতে অসারাংশই অধিক ।  
স্থূল কথা এই যে, সর্বপ্রকার সাকার উপাসনা নিরাকার  
উপাসনার সোপান স্বরূপ ; \*—নিরাকার উপাসনাই নির্বাণ  
যুক্তির কারণ ;—নির্বাণ যুক্তিই জীবাত্তার চরম লক্ষ্য ।

ভিন্ন ভিন্ন সাকার উপাসনা দ্বারা যথাক্রমে উন্নতি  
সোপানে উত্তীর্ণ হওয়া অল্প দিবসের কার্য্য নহে । এই  
জন্য সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি-  
গণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া জীবাত্তার জন্মান্তর অর্থাৎ পরকালের  
অস্তিত্ব স্বীকার করাইয়াছেন ।

এই কার্য্যটী যেমন বৃহত্তম ও মহত্তম, ইহার উপকরণও  
তেমনই অধিক । বহুজন্মে বহুতর যত্ন-সাধ্য নিত্য নৈমিত্তিক  
দানধ্যানাদি সংকল্পই ইহার উপকরণ স্বরূপ । প্রকৃত তত্ত্ব-  
জিজ্ঞাসু হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ সুবিস্তৃত মহাসাগরের এক প্রান্ত  
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান-নেত্র দ্বারা এই বিষয়ের  
ব্যবস্থা অবলোকন করিলে অন্তরাঙ্গী প্রথমতঃ বিস্ময়ে অভি-

---

\* কোন কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে সাকার উপাসনার যে যুক্তিকার-  
ণতা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্তিজনক অর্থবাদ মাত্র ।

ভূত, অনন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। হিন্দুশাস্ত্র সকলের মধ্যে সাকার উপাসনা প্রণালীতে চারিটি প্রধান কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রথম। যাবৎ মনুষ্যের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ অদৃশ্য জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না। অথচ জগদীশ্বর সর্বব্যাপী। চেতনাচেতন যাবদীয় পদার্থেই তাঁহার বিদ্যমানতা রহিয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্থূল-জ্ঞানী ব্যক্তির যদি জগতের কোন অচেতন জড়মূর্তিতে ঈশ্বর-বোধ সংস্থাপন করে, আর তিনি বস্তুতঃ মনুষ্যবৎ সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন, এরূপ ভাবিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও দয়াদি প্রকাশ করিতে অভ্যাস করে, তবে অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ও নিশ্চল হইবে, এবং ধর্ম প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই যুক্তিতে ঈশ্বর-মূর্তির “আত্ম-বৎ সেবা” নামক প্রথম কৌশল সৃষ্ট হইয়াছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রের পৌত্তলিক আরাধনা ঘটিত যাবদীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা এই কৌশল হইতে সমুদ্ভূত।

দ্বিতীয়। যখন এরূপ জ্ঞান জন্মে যে, সকল পদার্থে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা থাকিলেও কোন জড়মূর্তিতে বিদ্যমান ঈশ্বরংশ বাস্তবিক সুখদুঃখ অনুভব করেন না; মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই; তখন তাঁহাকে কেবল ভক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাই বলবতী হয়। কিন্তু সম্মুখস্থ কোন মূর্তির নিকট কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তদীয়

পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভক্তি-প্রকাশের চিহ্ন, এরূপ আর কিছুই নহে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া “চিত্র বা নির্মিত-মূর্তিতে সচেতনত্ব কল্পনা পূর্বক ঈশ্বরপূজা” রূপ দ্বিতীয় কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্যনাди ঘটিত যাবদীয় ব্যবস্থা এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।

তৃতীয়। ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা যখন ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব-বোধ দৃঢ় হইয়া আইসে, তখন নির্মিত প্রতিমূর্তি ব্যতিরিক্ত যে কোন বাহ্য বস্তুতে ঈশ্বর-পূজার সফলতা অনুভব হয়। তজ্জন্য “বাহ্য-পূজা” রূপ তৃতীয় কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

তাত্রকুণ্ড ইত্যাদি জলপাত্র, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলাশয়ে এবং তুলসী বৃক্ষাদি বা ঘটাদিতে পূজা এই কৌশল হইতে উৎপন্ন।

চতুর্থ। ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দ্বারা যখন এরূপ বোধ হয় যে, জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ স্বরূপ, তখন আপন দেহ মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব হয়। তৎকালের নিমিত্ত “আন্তরিক আত্মপূজা” নামক চতুর্থ কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাত্যহিক পূজাকালে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মানসিক পূজা ইত্যাদি এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।

অতি সংক্ষেপে সনাতন হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি কথা লিখিত হইল। মহাসাগরের সমস্ত তলপ্রদেশ অন্বেষণ

অথবা হিমালয়কে বিচূর্ণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রত্ন সকল সংগ্রহ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার ; জ্ঞান-নেত্রের অলক্ষীভূত অন্ধ-তমসচ্ছিন্ন আদিম কাল হইতে যে হিন্দুধর্ম পৃথিবীতে প্রবহমান রহিয়াছে, কোটি কোটি বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যাহার চর্চা করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, অল্প সময়ের মধ্যে অতি সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তাহার প্রকৃত মর্ম নির্ণয় করা ও তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া তেমনই দুরূহ ব্যাপার । অতএব পাঠক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, আপনারা অপক্ষপাত-চিত্তে যথার্থ ধর্ম জিজ্ঞাসার সহিত উপক্রমণিকা অংশের উল্লিখিত স্কুল তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা করুন ; তাহা হইলেই গ্রন্থকর্তার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে যে সকল কথা লিখিত হইল, তাহা কি পরিমাণে সঙ্গত বা অসঙ্গত, বোধ করি, তাহাও প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ।





# হিন্দুধর্ম তত্ত্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

হিন্দুধর্মের যাবদীয় শাস্ত্র প্রকৃত-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহিত পর্যালোচনা করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরোপাসনা প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে সময়-বিশেষ ও পাত্র-বিশেষ নির্দিষ্ট আছে । যথাসময়ে ও যথা নির্দিষ্ট পাত্র অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য অবলম্বন করিলেই শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে । নতুবা অনিষ্টের সীমা থাকে না । প্রথম অধ্যায়ে এই প্রস্তাবিত বিষয়েরই আলোচনা করা যাইতেছে ।

শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে,—

“অর্চাদাবর্জয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কস্মকুৎ ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্বস্থিতম্ ॥” \*

[ ২৩ ]

“অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাদ্বানাং কৃতালয়ং ।

অইয়েদানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুবা ॥” \*

[ ২৩ ]

( ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে )  
 মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত সর্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে ( পর  
 মাত্মাকে ) আপনার হৃদয়ে না জানিবে, ( অর্থাৎ ধ্যান দ্বার  
 আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে  
 না পারিবে ) সে পর্য্যন্ত কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান পূর্বক প্রতিমা  
 দিতে অর্চনা করিবে ।

অনন্তর যখন বুঝিবে যে আমি ( পরমাত্মা ) সর্ব-প্রাণীতে  
 বাস করিতেছি, তখন সর্ব প্রাণীর আত্মাকেই দানে, মানে  
 ও মৈত্র্যভাবে অর্চনা করিবে এবং সকলকেই অভিন্ন নেত্রে  
 অবলোকন করিবে ।

এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান  
 না জন্মিবে, তাবৎ অন্তঃকরণের নিশ্চলতা ও নির্মলতা সম্পা-  
 দনার্থ মনুষ্যকে সাকার উপাসনা করিতে হইবে ।

শাস্ত্রান্তরে নিরাকার উপাসনার অধিকারী নির্ণয় বিষয়ে  
 আরও স্পষ্টতর নির্দেশ আছে । যথা —

“ অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদান্ত্বেনোপাততোহধিগতাখিল-  
 বেদার্থোহগ্নিন্ জন্মানি জন্মান্তরে বা কাম্যানিধিদ্ধবর্জনপুরুষঃ সতঃ নিত্য-  
 নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনামুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত-  
 নির্মলস্বাস্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা । ●

যিনি যথাবিধি বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপা-  
 ততঃ অর্থাৎ স্থূলরূপে সকল বেদের অর্থ বুঝিয়াছেন, ইহ

জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুই প্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই চতুর্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল প্রকার পাপ ধ্বংস হওয়াতে অন্তঃকরণকে একান্ত নিৰ্ম্মল করিয়াছেন, এবং নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামূত্র ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পত্তি ও মুমুক্শুত্ব এই চতুর্বিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রমাতা অর্থাৎ প্রাণীই (মনুষ্য) ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপসনার অধিকারি।

স্বর্গাদি ইষ্টকামনায় যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। নরকাদি অনিষ্টসাধক কার্য্যকে নিষিদ্ধ বলা যায়। যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহাকে (যেমন প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ও পিতামাতার প্রতিপালনাদি) নিত্য কৰ্ম্ম বলে। কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে কার্য্য হয় (যেমন অপুত্রক ব্যক্তির পুত্রকামনায় যজ্ঞাদি) তাহা নৈমিত্তিক। পাপক্ষয়মাত্র-সাধক কার্য্যকে (যেমন চান্দ্রায়ন) প্রায়শ্চিত্ত বলে। সপ্তগ ব্রহ্ম অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের আরাধনাকে উপাসনা কহে। কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের হীনতাকে অন্তঃকরণের নিৰ্ম্মলতা বলা যায়। ইহ কালের নিতান্ত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের কিছু অধিকক্ষণ স্থায়ী (অনিত্য) স্বথের ভোগ বিষয়ে বিরক্তিকে ইহামূত্র ফল-ভোগ-বিরাগ বলে।

শম, (ঈশ্বরের শ্রবণ, মননাদি ব্যতিরেকে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) দম, (ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) উপরতি,



( বিহিত কার্যের বিধিপূর্বক পরিত্যাগ ) তিতিক্ষা ( শীতো-  
ফাদি সহ্য করিতে পারা ) সমাধান ( ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ  
মননাদিতে আকর্ষিত মনের একাগ্রতা ) ও শ্রদ্ধা, ( গুরুরূপ-  
দেশ ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন এই ষড়্‌বিধ কার্যকে  
শমদমাদি সাধন-সম্পত্তি বলা যায় । নির্ব্যাণ-মুক্তি লাভের  
ইচ্ছাকে মুমুক্শুত্ব বলে ।

অত্বেত মতের প্রধান প্রবর্তক শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে লিখি-  
য়াছেন যে, অসংসারী ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না, অর্থাৎ  
অনিত্যের সংসর্গ দোষে নিত্যেরও প্রভাব থাকে না । যেমন  
অশ্ব লঙ্ঘন করিয়া যবস গ্রহণ হয় না, তদ্রূপ অপরিসমাপ্ত-  
কর্ম্মী কদাচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারে না ।  
পূর্বের কর্ম্মকাণ্ডে তৎপর হইয়া শমদমাদি সাধন দ্বারা ক্রমে  
ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হইতে মুক্তি হইলে স্বভাবতঃই কর্ম্ম  
রহিত হইয়া যায় । তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সহজেই স্থলভ  
হয় । উপনিষদ্‌ শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে ।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতি তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১০

“ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিত্রিয়ধারণাং ।

অপ্রমত্ত্ত্বদা ভবতি যোগোহি, প্রভাবাপ্যয়ো ॥ ১১ \*

যৎকালে ( স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ) মনের  
সহিত পঞ্চজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, ( আত্মাতে ) অবস্থান করি-

\* কঠোপনিষৎ ষষ্ঠ ব্রহ্মী ।

বে, এবং স্বব্যাপারে বুদ্ধির চেষ্টা না থাকিবে, সেই কালের যে গতি তাহাকেই পরমা গতি কহে। ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের নিশ্চলতারূপ তাদৃশী অবস্থাকেই যোগ ( অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ) বলে। তৎকালে অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জিত হইবে, এই যোগপ্রভাব হয়।

আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পূর্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় মহাশয় জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বকৃত বেদান্তানুবাদ ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, “যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইলে কর্মকাণ্ডের তাদৃক্ প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্মকাণ্ড সাধন করা অবশ্য কর্তব্য, উহা কোন মতে ত্যজ্য নহে। কেন না, তৎ-সাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সর্বথা স্ফূর্তি হয়, বিশেষতঃ বেদ-বেদান্ত-বিধি অনুসারে ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান হওয়া দুর্লভ। সকাম সাধনার নাম ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। নিকাম সাধনার নাম ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার একান্ত আবশ্যকতা আছে।” তদর্থে বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ॥ ১ ॥ বেদান্তঃ।

কর্মকাণ্ডান্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে।

বেদের মর্ম্ম এই যে, যাবৎ কর্মকাণ্ড রাখিবে, তাবৎ গৃহস্থধর্ম্মে থাকিবে, কর্মের দ্বারা চিন্ত-শুদ্ধি হইলে অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য দেখিলে, অনন্তর সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

দণ্ড গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিবে। যেহেতু ঋক বেদের অনুক্রমণিকাতে লিখিত আছে যে,—

“ব্রহ্মানুষ্ঠানং পরমহংসস্যৈব ধর্মঃ”।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান পরমহংসেরই ধর্ম।

সুতরাং অসংসারী ব্রহ্মজ্ঞান সংসার-দোষ-সংযুক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য নহে। তথাপি যে ব্যক্তি শাস্ত্রাতিক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সে জ্ঞানীদিগের নিকট অজ্ঞান, উন্মত্ত ও ভ্রষ্টা-চারী রূপে পরিগণিত হয়।

যে রূপ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কোন সংসারাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি সম্ভরণ কার্যে অশিক্ষিত নহে, সে ব্যক্তি নদী উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ নহে; ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাকে নদ্যাতি জলাশয়ে অবগাহন পূর্বক অবশ্যই সম্ভরণ শিক্ষা করিতে হইবে। সংসারাসক্ত ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহে, ইহা সত্য; কিন্তু যদি সংসারে অবস্থান কালে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস না করে, তবে কিরূপে তাহার তৎকার্য্যে পারগতা জন্মিতে পারে?

দূরদর্শী শাস্ত্র-কর্তারা এরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে বিম্বৃত হন নাই। তাঁহাদের মতে যদি সংসারী ব্যক্তির ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে তাহাতে বাধা নাই। সংসারোচিত কর্ম-

কাণ্ড অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক যাগযজ্ঞ ও দেব-পিতৃ-কার্য্য ত্যাগ না করিয়া, বৈধাবৈধ বিচার ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া, শাস্ত্র নিষিদ্ধাচরণে পরাধ্বুত হইয়া ও প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সংসারী ব্যক্তিও পরিমুক্ত হয়। যথা—

“ন্যায়াগতধনন্তব্জ্ঞাননিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ।

শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে॥” \*

যে ব্যক্তি ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জন করিবে এবং তদ্ব-নিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদ্-বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথি-মেবা-পরায়ণ হইবে, নিত্যনৈমিত্তিক মাতৃপিতৃ-শ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্য বাক্য কহিবে, এবস্তূত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়।

এতাদৃশ শাস্ত্র ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে গৃহস্থ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিপথত্যাগী স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মিথিলাধিপতি জনকাদিও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু তাঁহা-দিগের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড-প্রবাহের অবরোধ হয় নাই; বরং তাঁহারা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রনিন্দা, দেব-ব্রাহ্মণ নিন্দা, অপ্ৰসিদ্ধা-হার ও সদাচার-পরিত্যাগ, অথবা ব্রত নিয়মোপবাস, এবং তীর্থ স্নানাদির ব্যাঘাত করেন নাই।

শাস্ত্রান্তরেও এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

---

\* যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

“বহির্ব্যাপার-সংরম্ভো

হৃদি সংকল্প-বর্জিতঃ ।

কর্তা বহিরকর্তাস্ত-

রেবং বিহর রাঘব ॥” \*

বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছেন, হে রাম ! তুমি বাহিরে সকল কৰ্ম্ম কর, মনে সংকল্প-রহিত হও, বাহিরে আপনাকে কর্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু মনে আপনাকে অকর্তা বলিয়া জানিও। এইরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিও। অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞান-প্রশংসা প্রবণে ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মের ব্যাঘাত করিও না। যে হেতু পরম হংসের ধৰ্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সংসারী ব্যক্তির কেবল কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া লাভ হইতে পারে না।

শাস্ত্র-কর্তারা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে কেবল যে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্মত্যাগের নিষেধ করিয়াছেন, এরূপ নহে ; প্রবলতর প্রত্যাবায় প্রদর্শন পূর্বক ঐ নিষেধের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

“আচারহীনং ন পুনস্তি বেদা

যদ্যপ্যধীতাঃ সহ বড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

ছন্দাংসোনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি

নীড়ং সপক্ষা ইব জাতপক্ষাঃ ॥” †

\* যোগ বশিষ্ঠ ।

† মনু যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ সংহিতাদি ।

মনুষ্য যদি ব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গ সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করেন, তথাপি আচারহীন ব্যক্তিকে বেদসকল পবিত্র করিতে পারেন না। যেমন পক্ষি শাবকের পাখা জন্মিলে সে আপন নীড় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ সকল আচারহীন ব্যক্তিকে যত্নাকালে ত্যাগ করিয়া গমন করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত মানবগণ সদাচার অনুষ্ঠান করেন, তাবৎ বেদ সকল তাঁহার পারিত্রিক মুক্তি সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করেন ; আচারহীন হইলেই পরিত্যাগের কারণ পাইয়া ত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন।

ইহা সত্য বটে যে, ব্রহ্মোপাসনার মুখ্যত্ব আছে ; কিন্তু তাহা সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নহে। ব্রহ্মানুষ্ঠান পরম-হংসের ধর্ম্ম। সংসারী ব্যক্তিকে নিয়ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে হয়, নচেৎ পতিত হইতে হইবে। যথা—

“সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোন্মীতি বাদিনম্

কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজে দস্ত্যজংযথা ॥” \*

শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠ দেব কহিয়াছিলেন যে, সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রহ্মজ্ঞ, আমার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে সেই ব্যক্তি কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তির অস্ত্যজের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

---

\* যোগবশিষ্ঠ ।

এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতি-  
 পন্ন হয় যে, মনুষ্য যে পর্য্যন্ত আপন অন্তঃকরণকে নিশ্চল  
 ও নিশ্চল করিতে সমর্থ না হইবে, তাবৎ সংসারে থাকিয়া  
 বিবিধ সাকার দেব দেবীর আরাধনা ও বহুতর কৰ্ম্মকাণ্ডের  
 অনুষ্ঠান পূর্বক জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিতে থাকিবে।  
 মধ্যে মধ্যে সাধুব্যক্তিদিগের নিকট নিরাকার ঈশ্বরের গুণানু-  
 বাদ ও আরাধনার আবশ্যকতা শ্রবণ করিবে। ক্রমশঃ  
 মনের পবিত্রতা ও নিশ্চলতা এবং জ্ঞানালোকের প্রখরতা  
 উপস্থিত হইলে, অল্পজ্ঞান ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তের নিমিত্ত  
 নিত্যনৈমিত্তিকাদি সকল কার্যেরই অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু  
 তাহাতে ফল কামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। পরি-  
 শেষে প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়তা, নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পর-  
 কালের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সর্বশাস্ত্রে নিঃসন্দেহ নিশ্চল  
 জ্ঞান উপস্থিত হইলে সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সমাধি অব-  
 লম্বন করিয়া নির্ব্যাণ মুক্তির উপায় দেখিবে। X

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথমতঃ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ভগ-  
 বান বিষ্ণুমূর্ত্তির কল্পনাকে এইরূপে অধ্যায় কল্পে স্ফুট করা  
 হইয়াছে।

ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞরূপ পুরুষ, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ,  
 চৈতন্যরূপের উপকরণ দ্বারা তাঁহার দেহ নির্মাণ হইয়াছে।

প্রাকৃত শরীরের ন্যায় তাঁহার শরীরের নাশ নাই। শুদ্ধ জীব চৈতন্য তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত কোমলমণি। নানা গুণময় মূল্যগ্রথিত যজ্ঞসমূহ তাঁহার বনমালা। চৈতন্যের প্রকাশ তাঁহার শ্রীবংশ, অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী। ছন্দো-ময় বরগীয় তেজঃ তাঁহার পীতবস্ত্র। প্রণব তাঁহার যজ্ঞো-পবীত। প্রবৃতি নিবৃতিমার্গ অর্থাৎ সগুণ নিগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি ও সাংখ্য যোগ তাঁহার কর্ণভূষণ, অর্থাৎ মকরাকৃতি কুণ্ডলবয়। তদ্বিস্ময়ের পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ তাঁহার শিরোদেশ। সত্ত্বগুণ তাঁহার পদ্ম। প্রাণতত্ত্ব তাঁহার গদা। জলতত্ত্ব তাঁহার শঙ্খ। তেজস্তত্ত্ব সূদর্শন চক্র।

বিস্মুপুরাণে ব্যক্ত আছে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাঁহার হস্ত-চতুষ্টয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুরবস্থা তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র। অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থা গদা। স্বপ্নাবস্থায় মনঃ-স্বরূপ সূদর্শন। সুষুপ্তাবস্থায় জলতত্ত্ব শঙ্খ। তুরীয়াবস্থায় সহস্রাক্ষ পদ্ম। আকাশতত্ত্ব তাঁহার অসি তমোময় চর্ম্ম। কালরূপ ধনুঃ। সকাম নিকাম কর্ম্মময় তুণ্ডবয়। ইন্দ্রিয়গণ শর। ক্রিয়া শক্তিরথ। বেদময় সুপর্ণ বাহন। রূপ, রস ইত্যাদি বিষয় রথ-প্রকাশ অর্থাৎ অভিব্যক্তি। বরাভয়াদি, মুদ্রা। ধর্ম্ম এবং যশঃ তাঁহার চামর দ্বয়। মুক্তি তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম। সন্তাপহারক বেদান্ত তাঁহার ছত্র। চিত্ত-শক্তিই তাঁহার লক্ষ্মী ও অক্ষৈশ্বর্য্য তাঁহার দ্বারপাল হয়।



এই সকল শ্রবণ ও চিন্তন করিলে, কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি এরূপ অনুভব না করিবেন যে বিষ্ণুমূর্তি কেবল পরমাত্মার প্রকারান্তরে বর্ণনা মাত্র।

এক্ষণে এই বিষ্ণু-নামার্থেরও বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে।  
 বিষ্ণুধাতুর অর্থ প্রবেশন। নু প্রত্যয়ের অর্থ ব্যাপ্তি। সুতরাং বিষ্ণু-নু অর্থাৎ “ বিষ্ণু ” শব্দে যিনি বিশ্ব ব্যাপক তাঁহাকে, অর্থাৎ একমাত্র পরমাত্মাকেই বুঝায়।

ইহার নামান্তরেরও অর্থ এইরূপ। যথা—

নার শব্দে জল এবং জীব সমূহ। অয়ন শব্দে আশ্রয়। সুতরাং “ নারায়ণ ” শব্দে যিনি জলে এবং সর্বজীবে আত্মা-রূপে আশ্রয়স্বরূপ বর্তমান আছেন, তাঁহাকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকেই বুঝায়।

কৃষ্ণ = উৎকৃষ্ট, নি = নিষ্পত্তি, সুতরাং “ কৃষ্ণ ” শব্দে যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়, তাঁহাকে অর্থাৎ সর্ব-সাম্যকারী পরমাত্মাকে বুঝায়। অথবা ক বর্ণের অর্থ ব্রহ্মা। ক বর্ণের অর্থ অনন্ত। ষ বর্ণের অর্থ শিব। ন-ধর্ম্ম। সুতরাং ক+ঋ+ষ+ন অর্থাৎ “ কৃষ্ণ ” শব্দে যিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করেন; যিনি অপরিসীম; যিনি শিবরূপে সংহাব করেন এবং যিনি সর্ব-ধর্ম্মময় তাঁহাকেই বুঝাইবে। অথবা কৃষ্ণ = কৃৎস্ন, = আত্মা, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবের আত্মা তিনিই কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের মূর্তি এবং কতকগুলি নামান্তরের ব্রহ্মবিভূতির রূপতা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

আত্মা আকাশ শরীরী । ঐতিপ্রমাণে আকাশ অতি স্বরূপদার্থ; কিন্তু নীলবর্ণরূপে দৃষ্ট হয় । একারণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম “নীল নীরদ বর্ণ” হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম পীতাম্বর; তন্মধ্যে এই যে “রবিকর-গৌরাম্বরং দধানং” এই বাক্যটি আত্মার বিশেষণ । তেজঃস্বরূপ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থান হেতু রবির কিরণ তাঁহাকে আচ্ছাদন করে । একারণ পীতাম্বর পরিধেয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের ঐতিমূলে মকর-কুণ্ডল দোহুল্যমান আছে এবং সেই কুণ্ডলচ্ছলে ঐতি অতি সংকুচিতা হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য এই, শ্রীকৃষ্ণ সগুণ কি নিগুণ ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, সগুণ, নিগুণ উভয় প্রতিপাদক অর্থাৎ বেদবাক্য সঙ্কুচিত ও দোলায়মান হইয়াছে । মকরাকৃতি বলাতে, তাৎপর্য্য এই যে, মকর জন্তু রসনাহীন, তাহার যেমন রসজ্ঞান নাই এবং বাক্শক্তিও নাই, ঐতিও তদ্রূপ ব্রহ্মবিষয়ে বাগিন্দ্রিয়-রহিত এবং ব্রহ্ম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত । শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম । তন্মধ্যে এই যে, ঐ নামে ত্রিসর্গ-ভঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ আত্মাতেই সৃষ্টি-সর্গ, আত্মাতেই স্থিতি-সর্গ ও আত্মাতেই লয়-সর্গ । এই ত্রিসর্গ পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ হইতেছে । এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গভঙ্গিম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । তাঁহার যে যত্ন যত্ন হাস্য, তাহাই জগদুন্মাদিনী মায়া । এই জন্যই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ।

“সিদ্ধাস্তনবধরামৃত-পূরকেন হাসাবলোক ইত্যাদি ।”

শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম নয়ন বলাতে, ভগবৎ-প্রেম-কৌটিল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রেম করিতে হইলেই সংসারের সরল পথকে ত্যাগ করিয়া বক্রপথে গমন করিতে হয়। যথা—

“অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ সদৈব কুটীলা গতিঃ।”

অর্থাৎ ভুজঙ্গের ন্যায় প্রেমের সদাই কুটীলা গতি।

সমস্ত বিশ্ব আত্মাতে গ্রথিত। এজন্য বিশ্বকে “তদ্বন” বলিয়া কেনেঘিট উপনিষদে ব্যাখ্যা করেন। বন শব্দে একত্র স্থিত বৃক্ষসমষ্টি। সুতরাং সমস্ত বিশ্বস্থ বস্তু আত্মসূত্রে গ্রথিত থাকায় শ্রীকৃষ্ণকে বনমালী বলা হইয়াছে। নট শব্দে মায়াবী, অর্থাৎ বাজীকর। বাজীকরেরা অস্বরূপে স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা তাহা হইতেও আশ্চর্য্যরূপে মায়া প্রদর্শন করেন। একারণ শ্রীকৃষ্ণকে নটবর অর্থাৎ নটশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি করিয়াছেন। এই বিশ্ব যাঁহার নাট্য, তাঁহার নাম নটবর। যিনি অনন্তান্ধ সংকর্ষণ তিনিই জীব। এখানে তাঁহাকে বলরাম নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি নখাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহ অর্থাৎ পরমাত্মা সহ ক্রীড়া করেন। শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রীদামাদি অন্যান্য গোপসকল। অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য,—উদ্ধব অক্রুরাদি স্বরূপ। আত্মতত্ত্ব বিরোধী মহামোহাদি—কেশী, কংস, মুর, নরকাদি অশুর। নিকৃতি যায়াত্মজা পুতনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। অপর বলাশন অর্থাৎ ‘কফ’ আত্মতত্ত্ব বিদ্বেষকারী রমণাত্মক ভুজঙ্গ স্বরূপ। কারণ

উহা পিঙ্গলা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া বিষবৎ প্রাণায়াম যোগের  
বিস্তার করে। কিন্তু সাধকের মানস-হৃদে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়  
হইলে তিনি সেই বিদ্বৎকারী বলাশনকে দ্বীপান্তরে দূরীকৃত  
করেন ; অর্থাৎ রমণক দ্বীপবৎ অসাধক ব্যক্তির হৃদয়কে সেই  
ভুজঙ্গ আশ্রয় করে। ইহাই জানাইবার নিমিত্ত “কালীয়দমন”  
প্রস্তাব সংঘটিত হইয়াছে। তথায় কফই যোগ-বিদ্বৎকারী ;  
হৃদয় কালীয় সর্প। পিঙ্গলা যমুনা নদী। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ।  
অসাধু হৃদয়ই রমণক দ্বীপ।

তৎপরে নামরূপের আরও ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন। যথা—  
হরি ; হ্র ধাতুর অর্থ হরণ, ই = কর্তা ; স্তরাং হ+ই অর্থাৎ  
“হরি” শব্দে যিনি সংসাররূপ অধিহরণ করেন, তাঁহাকেই  
বুঝায়। অপর “হরি” শব্দ মঙ্গল বাচক ; কারণ তিনি  
পুনঃ পুনঃ অমঙ্গলরূপ মৃত্যুকে নিবারণ করিয়া থাকেন। বাসু—  
প্রলয়ে যাহাতে সকলের বাস, দেব—স্বতঃ-প্রকাশ, দীপ্তিমান  
পুরুষ ; স্তরাং “বাসুদেব” শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়। গো—পৃথিবী  
প্রভৃতি লোক সকল, পাল—রক্ষণ। স্তরাং যিনি জগৎ-  
পালক অর্থাৎ রক্ষক তিনিই “গোপাল” শব্দে বাচ্য হন।

এইরূপে কালরূপাত্মক শিবের নাম-রূপার্থ ব্যাখ্যাত হই-  
তেছে। প্রায় সর্ব শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিকে কালরূপে  
উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

“মহাকালো জগৎ কর্তা, শিবঃ পূরণ পুরুষঃ”

এবং “বাসুদেবো জগন্নাথো, ভগবান্ কালপুরুষঃ।”

এস্থলে সৃষ্টিকাল ব্রহ্মারূপ, পালন কাল বিষ্ণুরূপ এবং সংহারকাল শিবরূপে কল্পিত হইয়াছেন। সেই মহাকাল যে শিবরূপ, তাহা তাঁহার রূপ ও অবয়বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলেই চিন্তাশীল সাধকের বোধগম্য হইতে পারে। কালমূর্ত্তি শিবভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই ত্রিকালদর্শী। এই কারণেই শিব ত্রিলোচন ধারণ করিয়াছেন। এই সংসার জরাবস্থায় নিধন দশা প্রাপ্ত হয়; সেই জন্যই শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কালে, প্রলয়ান্নি-তাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ শিবকে ভস্ম-ভূষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কালে জীব-নিকরের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়; এজন্য অনাদি-নিধন শিবকে “কঙ্কালমালী” বলিয়াছেন। কালে, নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত হয়; একারণ শিবের করকমলে নর-কপাল সংস্থিত হইয়াছে। মুক্তিকালে জীব সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করে, সুতরাং তাহারা আর পুনর্ব্বার জাগরিত হয় না, অর্থাৎ সকলে শ্মশান-শায়িত হয়; এই কারণে শাস্ত্রে শিবকে শ্মশানালায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, শ্মশানভূমিতে মহাদেব-বাসের আরও এই কারণ যে, কালরূপে শঙ্কর সর্ব্ব-সংহারক হন। অপর, কালে সকল জীবেরই শিরোনিরন্ত অর্থাৎ নিপাতিত হয়, তৎপ্রদর্শনার্থ হরগলে নরশিরোমালা বিভূষিত হইয়াছে। কালের কালিমারূপ প্রদর্শন জন্য শিব নীলকণ্ঠ অর্থাৎ স্মীয় কণ্ঠদেশে কালের কালিমা-আভা ধারণ করিয়াছেন। কাল

অপরিচ্ছিন্ন, সূতরাং তাহাতে সর্বব্যাপকত্ব আছে। তদ্‌ক্টান্ত-  
স্বরূপে শিব দিগ্বাসা হইয়াছেন। এই বিশ্বস্থিতির যত অঙ্গ  
ও যত উপকরণ আছে, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত সে সকল অঙ্গ  
হইতে প্রধান অঙ্গ। একারণ, কালস্বরূপ শিবকে পঞ্চানন  
বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। কালের অমোঘ-বীৰ্য্যতা  
পদে পদে প্রদর্শন হয়, তাহাতে উত্তমাদম মধ্যম পক্ষে নিয়-  
তিই কালের প্রধানা শক্তি স্বরূপা হইয়াছে। সেই নিয়তিই  
শিবের ত্রিশূল স্বরূপ। তাহা অব্যর্থ; অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা  
কেহই করিতে পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্রক  
হউন না কেন, কালে তাঁহার নিধন হয় ও তাঁহার চর্ম্মোপরি  
কাল নিয়তিই অবস্থান করেন; এই হেতু শাস্ত্রে শিবকে  
“ব্যাস্ত্রচর্ম্মান্বরধর” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভুজঙ্গ-কুল  
বশীভূত হইবার নিতান্ত অযোগ্য এবং অতি খল। কিন্তু  
তাহারাও কালের বশীভূত, ইহা দেখাইবার জন্য সদাশিব  
“ভুজঙ্গ-ভুষণ” হইয়াছেন। জ্ঞান কেবল এক ধর্ম্মকে আশ্রয়  
করিয়া থাকেন, অতএব স্বরূপী ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে  
সর্বদা বহন করিতেছেন। কোন মতে শিবকে যে চতুর্ভুজ  
রূপে বর্ণনা করেন, তাহাতে মহাদেবের চতুর্বর্গ প্রদান  
ক্রিয়াই প্রমাণ হইতেছে। যথা—

“পরশু-মৃগ-বরা-ভীতি-হস্ত” মিত্যাদি।

যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তেই “কাম” অর্থাৎ সর্বাভিলাষ-  
পূরক “মৃগ মুদ্রা” হয়। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তেই

“অর্থ”; অর্থাৎ বিনা শত্রুনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে না। যে হস্তে বর, সেই হস্তেই “ধর্ম”; অর্থাৎ বিনা ধর্মে বিশুদ্ধ স্বর্গের সন্দর্শন হয় না। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তেই “মোক্ষ”। অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয় শান্তি হয় না। অতএব কালমূর্তিই যে শিব; তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ?

### তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্বাধ্যায়ে বিষ্ণু ও শিব দেবতার নাম ও রূপের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে শক্তি পক্ষের কিঞ্চিৎ বিবরণ করা যাইবে।

এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইহার কিছুই প্রকৃত বিদ্যমানতা নাই। মনুষ্যের বুদ্ধি পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্তই জগতের ব্রহ্মময়ত্ব অনুভূত হয় না।

জগদীশ্বরের “শক্তি” বা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি উৎপাদন-ক্ষমতাকে পুরাণাদি শাস্ত্রে বিবিধ নাম ও রূপ কল্পনা দ্বারা নানাবিধ দেবীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

মনুষ্যাদি জীব যে সকল কার্য সাধন করে, তাহা যে, তদীয় শক্তিদ্বারা সম্পাদিত, শক্তিহীন জড় দেহ দ্বারা নহে, এ বিষয়ে বোধ হয়, কাহারও কোন সন্দেহ নাই। ঐ ভ্রম-রহিত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র-কর্তারা সর্বশক্তিমান

জগদীশ্বরের “ শক্তি ” পদার্থকে পরমার্চনীয় দেবীমূর্তি বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন ।

ফলতঃ, যে কারণে আমরা কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির জড়াত্মক শরীরের প্রশংসা করি না, কেবল সেই শরীরস্থ বিদ্যারই প্রশংসা করি ; যে কারণে পূজনীয় ব্যক্তিদিগের জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিলে সেই অচেতন জড়দেহের সেবা শুশ্রূষা করি না, কেবল জীবিত অবস্থাতেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সেবা শুশ্রূষা করি, সেই কারণে প্রকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ জগদীশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির পূজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না ।

শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে,—

“ হর-গৌরীময়ং জগৎ ”

অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ হরগৌরীময় । তাৎপর্য্য এই যে, জগতের পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক । এ স্থলে “ হর ” শব্দে পরম পুরুষ, এবং “ গৌরী ” শব্দে পরমা প্রকৃতি, এরূপ বুঝিতে হইবে ।

বিবিধ শাস্ত্রীয় বাক্য এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে । তথাহি,—

“ স্ত্রীং লক্ষ্মীং পুরুষং বিষ্ণুং ” ইত্যাদি ।

অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রই লক্ষ্মীর অংশ এবং পুরুষ মাত্রই বিষ্ণুর অংশ ।



তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ জাতিই সম্ভানের উৎপাদক বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতিরূপ প্রধান উপকরণ না হইলে, ঐ সম্ভানোৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি বিষয়ে জগদীশ্বররূপ পরমপুরুষ কর্তা বটেন, কিন্তু তদীয় শক্তিরূপ প্রধান উপকরণ না হইলে, ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

শাস্ত্র-প্রণেতারা কেবল ঈশ্বর-শক্তিরূপ মহামায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে অঘণ্টা হেতু প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ব্যতিরেকী হেতুরও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

“যত্র নাস্তি মহামায়া  
তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।”

অর্থাৎ যেখানে মহামায়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান নাই, সেখানে আর কিছুই নাই।

জগতের সৃষ্টি কেবল ঐশ্বরিক “শক্তি” বা প্রকৃতি হইতেই হইয়াছে; এবিষয়ে অদ্রাস্ত সংস্কারাপন্ন শাস্ত্র-কর্তারা চেতন বা অচেতন, পুরুষ বা স্ত্রীজাতীয় পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তুমাত্রকেই মায়া শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। বেদ শাস্ত্রে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রকেই “মায়া” বলিয়া নির্দেশ আছে। অতএব মহামায়াই সকল পদার্থ। বিনা মায়া মূর্তি নাই; ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে। এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, ভ্রান্তের পক্ষে ঐ মায়া সংসার-বন্ধন-কারিণী; আর জ্ঞানীর পক্ষে উহা মোক্ষ-বিধায়িনী হয়েন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

“ সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ॥ ”

অর্থাৎ সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর-স্বরূপা, সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর-শক্তি ( পাত্র বিশেষে ) মুক্তির হেতু এবং ( পাত্র বিশেষে ) সংসার-বন্ধনের হেতু হন ।

শাস্ত্র মতে যে শক্তি মুক্তি-দাত্রী তিনিই “ বিদ্যা ”; আর যিনি সংসার-প্রবাহার্থবন্ধনকারিণী, তিনিই অবিদ্যা শব্দে পরিগণিত। এই মহামায়া প্রভাবেই এই জগতের সংস্থিতি হইয়াছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এ সকলেই প্রকৃতির রূপ ; বস্তুতঃ পুরুষের রূপ নাই। অতএব জগন্ময়ী প্রকৃতির আরাধনা ব্যতীত পরাংপর পরম পুরুষে অধিগমন করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক মহামায়া প্রকৃতিই পরমারাধ্যা হইয়াছেন।

ঈশ্বর শক্তি বা প্রকৃতি বা মহামায়া এক পদার্থ। কদাচই বিধাতৃত বা বিভিন্ন নহে। যথা—

“ সত্ত্বং রজস্তম ইতি

গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে ।

সাম্যাবস্থেতি যা তেষা

মব্যক্তপ্রকৃতিং বিদ্বঃ ॥ ”

( ইতি যামলম্ )

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমানাবস্থা, পণ্ডিতেরা তাহার নাম অব্যক্ত ও তাহাকেই প্রকৃতি বলিয়া জানেন।

“ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং  
ভবো যস্য নিজেচ্ছয়া ।  
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং  
নিত্যা সা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ”

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি ষাঁহার নিজ ইচ্ছাতে উদ্ভূত হন এবং পুনর্বার ষাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন, তিনিই নিত্য ( প্রকৃতি ) বলিয়া পরিগণিত ।

শাক্তেরা দুর্গাকে, বৈষ্ণবেরা কেহ লক্ষ্মী, কেহ বা রাধিকা, কে, হৈরগ্যগর্ভেরা কেহ সাবিত্রী, কেহ বা সরস্বতীকে পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানেন । ফলতঃ একমাত্র প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিগণিত । তথাহি,—

“ গণেশজননী দুর্গা  
রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী ।  
সাবিত্রী চৈব বিজ্ঞেয়া  
প্রকৃতিঃ পঞ্চধা ইতি ॥ ”  
ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্তম্ ।

গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী, প্রকৃতি এই পঞ্চ প্রকার ; অর্থাৎ এই পঞ্চ সংজ্ঞাতে অভিহিত হইয়াছেন ।

শাক্তে ইহাও নির্দেশ আছে যে প্রকৃতির উপাসনাতেই পরমাত্মার পরিতোষ জন্মে অর্থাৎ রূপনাম-বিশিষ্ট শক্তি-উপাসনাই ঈশ্বর সাধনার প্রধান উপায় । যথা,—

“ নিত্যং স্ত্রীং পূজয়েৎ যন্ত  
বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।  
প্রকৃত্যন্তস্য সন্তুষ্টা  
যথা কৃষ্ণো দ্বিজার্চনৈঃ ॥ ”

যেমন ব্রাহ্মণের অর্চনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন, সেই রূপ যে ব্যক্তি বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দনের দ্বারা নিত্য ( প্রকৃতির অবতারস্বরূপ ) স্ত্রীপূজা করে, তাহার প্রতি প্রকৃতি পরিতুষ্টা হয়েন ।

সকল স্ত্রী যে ঐ প্রকৃতির অবতার স্বরূপ ইহা জানাইবার নিমিত্তই প্রকৃতি দশমহাবিদ্যা রূপে প্রকাশমানা হন ।

এক্ষণে বঙ্গদেশে অসাধারণ রূপে প্রচারিত “দুর্গা” এই শক্তি-মূর্তির নাম ও রূপের ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে ।

প্রথমতঃ “ দুর্গা ” এই শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ এই শব্দ দ্বারা কিরূপ পদার্থের প্রতীতি উৎপাদন শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য, তাহা লিখিত হইতেছে ।

“ দুর্গ-নামকান্ অশ্বরান্ নাশয়তীতি দুর্গা ” দুর্গ-নামক অশ্বরদিগকে যিনি নাশ করিয়াছেন, তিনি দুর্গা ।

দুর্ শব্দের অর্থ দুঃখ, গ শব্দের অর্থ সাধনীয়, অতএব দুর্+গা অর্থাৎ দুর্গা শব্দে দুঃসাধ্যা । অর্থাৎ দুঃসাধ্য জ্ঞান-স্বরূপা শক্তিকে দুর্গা বলিয়া আখ্যাত করা যায় ।

দুঃ শব্দে দুঃখ-সাধ্য তপোযোগাদি, গ শব্দে জ্ঞাতব্য,

অতএব দুর্গা শব্দে, যাঁহাকে বহুতর তপোযোগাদি দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে বুঝায়।

দুর্গ শব্দে দুর্জয়, অব্যয় আকারের অর্থজ্ঞানাত্মা; এনিমিত্ত দুর্গা শব্দে দুর্জয়-জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাকে বলা যায়।

কিঞ্চ দুর্গ শব্দে সংসার, অব্যয়ার্থ আ শব্দে নিস্তার; সুতরাং যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার-দুঃখের নাশ হয়, তিনিই দুর্গা নামে উক্ত হইয়াছেন।

দু শব্দে উৎকট, গ শব্দে গমন, র শব্দে নরক, আ শব্দে সংসার; অতএব যাঁহা হইতে জীবাত্মার সংসার রূপ উৎকট নরকে গমন নিবারণ হয়, তাঁহারই নাম দু + র্ + গ + আ অর্থাৎ দুর্গা। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মা-স্বরূপা তাহাতে সংশয় নাই।

“দুর্গা” শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত হইল, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, দুর্গা নাম মহামন্ত্র-স্বরূপ, দুর্গা-নাম স্মরণে সমস্ত প্রকার দুর্গতি খণ্ডন হয়, দুর্গা নাম স্মরণ-ফলে ইহলোকেচিত সমস্ত প্রকার সুখভোগ করিয়া জীব পরলোকে পরমাত্মার পরম পদে অভিগমন করে। দুর্গাই পরমাত্মা-স্বরূপা, দুর্গা ভিন্ন অন্য এক পরমাত্মার অস্তিত্ব-বোধ ভাস্কি-বিলাস মাত্র। বেদ শাস্ত্র যাঁহাকে বিশ্ব-ব্যাপক বিষ্ণু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই বিষ্ণুই প্রকৃতি রূপে প্রকটিত হইয়া জীবের শ্রেয়োবিধান করিয়াছেন।

হয়, তথাপি তাহাকে সশস্ত্র জ্ঞানে নিষ্পীড়ন করিবার যত্ন করা আবশ্যিক। কেবল অশিক্ষিত একান্ত্র-যুদ্ধে প্রায় জয় লাভ হয় না; এজন্য নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা দেখাইয়া শত্রুকে হত-পরাক্রম করিতে হয়। যুদ্ধ কালে রাজাকে বহুদিকেই দৃষ্টি করিতে হয়। এরূপ আয়োজনের ন্যূনতা থাকিলে, রাজা কখনই সম্যক-জয় লাভের পাত্র হইতে পারেন না।

মানবগণকে এই উপদেশ দিবার নিমিত্ত ঐশ্বরী শক্তির মহিষ-মর্দনচ্ছলে দুর্গা মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। তথাহি,—

দশভূজা দেবী দশভূজে অস্ত্রধারণচ্ছলে বিবিধাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা গ্রহণ শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যা-বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে বামে রাখিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রভূত ব্যয় নির্বাহার্থ ধনসংগ্রহে কালাত্যয় না হয়, এজন্য রত্ন-পেটিকা সংস্থাপন স্বরূপে সর্ব-রত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে দক্ষিণভাগে সংস্থাপন করিয়াছেন। বাহনারোহী সৈন্য-নায়ক স্বরূপে কার্তিকেয়কে বাম পাশে এবং গজানন গণেশকে দক্ষিণ পাশে সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রু পক্ষকে সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ প্রদর্শনার্থ সিংহবাহন দেখাইয়াছেন। সর্ব সমুদ্যোগী রাজা কখন শত্রু কর্তৃক হত হইবেন না, একারণ মৃত্যুজয় খ্যাপনার্থ মৃত্যুরূপ মহিষকে পাশে বদ্ধ করিয়া অস্ত্র ক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরস্ত্র

জগতে আত্মা ভিন্ন বস্তু মাত্র নাই। স্মরণ্যং দুর্গা এই সৃষ্টির কারণভূতা এবং উৎপন্ন জগতের রক্ষাকর্ত্রী। দুর্গা মূর্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কল্পনার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের ইহাই প্রতীতি জন্মিবে যে, পরম হিতৈষী পরমাত্মা মানব-দিগের নিকট সংসারের সর্বপ্রকার রীতি নীতি-পদ্ধতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সকল কার্যের সম্পাদনো-পযোগী উপদেশ প্রদানার্থ স্বয়ং দুর্গারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দুর্গা মূর্তি কল্পনা দ্বারা শাস্ত্র কর্তারা প্রধানতঃ মানব-দিগকে রাজনীতি ও পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা ক্রমে এই দুই বিষয় যথাসাধ্য বর্ণিত হইতেছে।

সর্ব প্রকার নীতির মধ্যে রাজনীতিই প্রধান। সেই রাজনীতির স্থূল তাৎপর্য এই, পৃথিবী-জয়ার্থী রাজা মন্ত্রীকে বামে স্থাপন করিয়া যুদ্ধকালে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা পূর্বক পররাজ্য জয় করিয়া থাকেন। উপস্থিত শত্রু-বিগ্রহে প্রভূত ধনের প্রয়োজন বশতঃ রত্ন-পেটিকাকে দক্ষিণ হস্তের আয়ত্ত স্থানে রক্ষা করেন। হস্ত্যাদি-আরোহী সেনাপতি দুই পাশে সৈন্যগণকে রক্ষা করে। পর-সৈন্য বন্ধন হেতু পাশাদি বন্ধনরজ্জু প্রস্তুত থাকে। সিংহের বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া আত্ম-শত্রুকে জর্জরীভূত করিয়া বিশিষ্ট রূপ বন্ধনে রাখিতে হয়। পরন্তু ক্ষুদ্র শত্রুও যদি নিরস্ত্র

শত্রু হইতেও কালে সশস্ত্র শত্রুর উত্থান হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্ত মহিষমুখ হইতে অস্ত্রপাণি অস্ত্রের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। এরূপ সমুদ্যোগী রাজা দশদিক্কে অধিকার করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য লাভ করেন, ইহা প্রদর্শনার্থ দেবী দশভুজা হইয়া এক এক দিক্‌পতির অস্ত্র এক এক হস্তে ধারণ করিয়া সর্বলোককে উপদেশ দিয়াছেন, যে এই সমুদ্রমেখলা ধরণী-মণ্ডলের দিক্‌পতি সকল এবস্তৃত রাজার অস্ত্রতলে অধিবাস করে। রাজাদিগের উদ্ধাধঃ সর্ব দিকেই দৃষ্টি থাকিবে; ত্রিনয়নচ্ছলে দুর্গাদেবী তাহাই দেখাইয়াছেন। অর্দ্ধচন্দ্র ধারণচ্ছলে সর্বত্র সমান স্নেহের বিরাম অর্থাৎ সাধু পালন ও অসাধু পীড়ন করাই রাজ ধর্ম, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ-চ্ছলে, রাজা যে উদ্দীপ্ত তেজস্বী হইবেন, ইহাই জানাইয়াছেন।

উল্লিখিতরূপে রাজনীতি উপদেশের বিষয় লিখিত হইল। এক্ষণে মহিষাসুরাদি বধ প্রসঙ্গে কিরূপে মানবদিগকে অধ্যাত্ম তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

এস্থলে দেবাসুর-যুদ্ধ-পদে অধ্যাত্ম-ঘটিত বার্তা বুঝিতে হইবে। যত্নরূপ মহিষাসুর দেহাদিগের দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অসংপ্রতিরূপ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ইন্দ্রিয়রূপ দেব-গণের ও সংপ্রতিরূপ তদীয় সৈন্য সামন্তদিগের সহিত সম্পূর্ণ পরমায়া কাল বিরোধ করিয়া পরে জয়ী হইয়া আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়াছে। জীবরূপ আকাশকে পরাজয় ক-



রিয়া, মৃত্যু আকাশ-ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব-ব্যাপী হয়। ইন্দ্রিয়-বর্গরূপ দেবগণ নিস্তেজ ও নিপ্রভ হইয়াছিল; এই ভূত কাল উপলক্ষণমাত্র; বস্তুতঃ সর্বত্রিক ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যু কর্তৃক আদি-সর্গে পরাজিত হইয়াছিল; বর্তমানে পরাজিত হইতেছে, ভবিষ্যৎ কালেও পরাজিত হইবে, মহিষাসুরের প্রথমতঃ জয়বর্ণন দ্বারা ইহাই পরিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অনন্তর জীবের তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে যে প্রকারে জ্ঞান শক্তি প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিয়া সাধক মৃত্যুঞ্জয় হয়, ঐশ্বরী শক্তি দুর্গামূর্তি দ্বারা মহিষাসুরের বধ প্রস্তাবে তাহাই স্ফুটীকৃত হইয়াছে। অপ-রন্ত্র কর্মী ও বিকর্মী উভয়বিধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদিকে পরা-জয় করিয়া মৃত্যু সকলের উপর একাধিপত্য করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উহাদিগের মধ্যে কেহই মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরত্ব-ধর্ম প্রাপ্ত হয় না। দেবাসুর-যুদ্ধ-ব্যাজে ভগবান বেদব্যাস পুরাণাদিতে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

প্রধানতম দুর্গামূর্তির পূজা বা আরাধনা সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি রহতর দেব ও দেবী এবং তদীয় বাহনাদির অর্চনা বিষয়ক যৈ ব্যবস্থা আছে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ঐ ব্যব-স্থার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। মানবের জড়াত্মক শরীরের সমস্ত অবয়ব এবং তদীয় সর্বপ্রকার মনোবৃত্তি যে যে দ্রব্য-পদার্থে সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের যে সকল গুণপদার্থ আছে ও সেই সকল গুণ দ্বারা নিরন্তর যে সকল ক্রিয়া পদার্থ উৎপন্ন

হইয়াছে, মৃত্যুর নিকট এই সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইতেছে, একমাত্র ঐশ্বরী-শক্তি দুর্গার আরাধনা ব্যতিরেকে জীবদিগের ঐ দুর্দ্বৈত মৃত্যুকে পরাজয় করিবার উপায় নাই ;— শাস্ত্রীয় কল্পনার মধ্যে এই অতি নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান নিখাত রহিয়াছে। তথাহি—

আকাশ দেব পদার্থ ; তাহার গুণ শব্দ, তদীয় অধিষ্ঠাতা দেব ইন্দ্র। বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং অধিষ্ঠাতা পবন। অগ্নির গুণ রূপ এবং অধিষ্ঠাতা রুদ্র। জলের গুণ রস এবং অধি-  
দেবতা বরুণ। মৃত্তিকার গুণ গন্ধ এবং অধিষ্ঠাত্রী পৃথিবী ইত্যাদি।

মানবদিগের বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আছে। তন্মধ্যে আকাশের রজঃ অংশে বাক্য, ( অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় মুখ-মণ্ডল ) বায়ুর রজঃ অংশে হস্ত, অগ্নির রজঃ অংশে পাদদ্বয় ; জলের রজঃ অংশে অণ্ডকোষ ; পৃথিবীর রজঃ অংশে উপস্থ। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের মধ্যে আকাশের সত্ত্ব অংশে কর্ণ, বায়ুর সত্ত্ব অংশে চক্ষু, অগ্নির সত্ত্ব অংশে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্ত্ব অংশে প্রাণাদি উৎপন্ন হইয়াছে। ফলিতার্থে এ সমস্তই আকাশে আছেন এবং আকাশই সকলের কারণ ; এই আকাশের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রকে দেব সেনা মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

অন্তরিন্দ্রিয় চারি ভাগে বিভক্ত। যথা, বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত, ও অহঙ্কার। নিশ্চয়াত্মক . অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি,

সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মনঃ, অনু-  
সন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত, অভিমানাত্মিকা  
অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম অহঙ্কার। এই অন্তরিন্দ্রিয়ের অধি-  
ষ্ঠাতা স্বরূপে চন্দ্রদেব পরিগণিত হইয়াছেন।

মুখ মণ্ডলের কথন-শক্তি, হস্তের গ্রহণ-শক্তি, পদের  
গমন-শক্তি, অণ্ডের শুক্রাধান-শক্তি, উপস্থের আনন্দ-  
য়িতব্য প্রয়োজন-শক্তি; অপরন্তু কর্ণের শ্রবণ-শক্তি, চক্ষুর  
স্পর্শন-শক্তি, চক্ষুর দর্শন-শক্তি, জিহ্বার রস-গ্রহণ-শক্তি,  
নাসিকার গন্ধ-গ্রহণ-শক্তি আছে; এবং বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী  
বাণী, হস্তের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, পদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, হস্তের  
অধিষ্ঠাতা সোম, উপস্থের অধিষ্ঠাতা কামদেব, কর্ণের অধি-  
ষ্ঠাতা ইন্দ্রের অপরা মূর্তি দিক্, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা বায়ুর  
মূর্তি বিশেষ, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্যের অপরা মূর্তি অগ্নি;  
জিহ্বার অধিষ্ঠাতা বরুণের অপরা মূর্তি রস, নাসিকার অধি-  
ষ্ঠাতা পৃথিবীর অপরা মূর্তি গন্ধ ইত্যাদি পরিকল্পিত হইয়াছে।

এইরূপে সর্ব্বভিক ইন্দ্রিয় সকল দেববর্গ; এ সকলের  
ক্ষমতাকে জয় করিয়া মৃত্যু সর্ব্বোপরি স্থায় কর্তৃত্ব বিস্তার  
করিয়াছেন; বাহ্য উপদেশ দিবার নিমিত্ত মৃত্যুই মহিষরূপে  
আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্রত্ব  
করিয়াছিলেন। আবার সেই মহিষাসুর দুর্গা দেবীর নিকট  
পরাজিত ও নিহত হইতেছে;—এই অধ্যাত্ম তত্ত্ববাচ্য  
প্রস্তাবের বাগ্ননিক ভাগ উদ্ধার করিয়া নর শরীরস্থ তত্ত্বের

অন্বেষণ করিলে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির সহজেই তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে।

এ স্থলে এমন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পরমেশ্বরের রূপাদি যদি মিথ্যা অর্থাৎ কল্পিতই হইল, তবে তদ্রূপের উপাসনাদিতে কোন উপকার হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে বক্তব্য যে, যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ আন্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ভুজঙ্গ বলিয়া রজ্জুঃ ধারণ করিলে, ভুজঙ্গ আন্তির অপনয় ও সত্য রজ্জুঃ গ্রহণ করাই সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহামোহে আকৃষ্ট জীবের পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ জানিবার সাধ্য নাই, এ প্রযুক্ত নির্মল পরমাত্মাতে শ্রীকৃষ্ণ শিবদুর্গাদি রূপের সম্ভ্রা করিয়া উপাসনা করিতে করিতে পরিণামে নাম রূপের অন্তর হইলে, তন্মূলীভূত পরমাত্মার উপাসনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। প্রত্যুত, কোন সাধক ব্যক্তি প্রথমে নাম রূপাদি উপাসনা না করিয়া যদি একবারে নিগুণ পরমাত্মার উপাসনা করিতে যত্ন করেন, তবে কদাচই তাঁহার উপাসনার সিদ্ধি হইতে পারে না। তাদৃশ ব্যক্তি পরিণামে কস্মৎ ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইয়া বিলক্ষণ নাস্তিক হইয়া উঠিবেন। অতএব অগ্রে রূপ নাম বিশিষ্ট পরমেশ্বরের উপাসনা করা নিতান্ত কর্তব্য, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

---

## চতুর্থ অধ্যায় ।

কালীমূর্তি—বাহ্যরূপ ।

অবচ্ছেদ রহিত স্বতঃ নিত্য কালই এই জগতের নিয়ন্তা । ব্রহ্মাদি তৃণ-শূন্য পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সেই অখণ্ড অমোঘ-বীৰ্য্য কালের অধীন । কেহই সেই কালের অব্যর্থ নিয়মকে অতিক্রম করিয়া আত্ম পরাক্রমে কার্য্য করিতে পারে না । সেই কালকে শাস্ত্রকার ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানারূপ উপাধি দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন । সেই কালই অখণ্ড ও অপরিমিত ব্রহ্ম এবং শাস্ত্রে তাঁহার শক্তিকেই “ কালী ” রূপে বর্ণন করা যায় । কালরূপা কালকামিনী পরব্রহ্মের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি স্বরূপ । তিনিই কাল বশতঃ এই অপূৰ্ব্ব জগ-দ্ভূতের সৃষ্টি করিণী ও অখণ্ড দণ্ডায়মানা । অখিলার্থ সাধ-নাভিপ্রায়ে ক্রিয়া শক্তিরূপে পালন তৎপরা এবং অন্তকালে স্বকীয় লীলাভাস বিনাশ জন্য স্প্রথরা কাল-রূপিণী হয়েন ।

জন সমাজে পূজাদি উপলক্ষে যে বিশাল কালী মূর্তি দর্শন ও অর্চিত হইয়া থাকেন, তাহাই সেই মহাকাল-মোহিনী ও তাঁহার ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি রূপের আধারভূতা । উপাসক-গণের অভীষ্ট-সাধন-জন্য কালীরূপে কল্পিত হইয়াছেন । ইহার এই মূর্তি বিকারময় মনুষ্য মূর্তির ন্যায় নহে । তাঁহার

প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্রহ্ম-বিভূতি-প্রতিপাদক। অধ্যাত্ম কল্পে জ্ঞান-চক্ষে অবলোকন করিলে ভ্রান্তের ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়।- দৃষ্টান্ত স্বরূপে কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

প্রথমতঃ কালীমূর্তির যে সকল নাম দ্বারা সম্বোধন ও অর্চনা হইয়া থাকে, তাহাদের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ নিষ্কাশন করা যাইতেছে।

শাস্ত্রে কাল-কামিনী কালীকে “করাল বদনা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই, করাল শব্দে ভীষণ অর্থাৎ ভয়ানক, বদন শব্দে মুখ। “করাল বদনা” অর্থাৎ যাঁহার মুখ অতি ভীষণ। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত জন্তু অবস্থিতি করে, তন্মধ্যে কোন কোন জন্তু অতীব ভীষণা-কার ও হিংস্রক ; কিন্তু সকলকেই সেই জগদ্বক্ষক কালের দন্তে কবলিত হইতে হয়। কেহই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না ; জগদন্ত-কালে সেই কালই সকলকে গ্রাস করেন। এই নিমিত্তই কাল-শক্তি কালীকে “করাল বদনা” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তথাহি,

“ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।”

তিনি ভয়ের ভয় স্বরূপ, ভীষণের ভীষণ স্বরূপ।

কিন্তু স্মৃতিবান্ জ্ঞানীর পক্ষে সেই কালমূর্তি পরম রমণীয় প্রসন্ন-বদন ধারণ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত তাঁহারই নামা-স্তর “সুখ-প্রসন্নবদনা” ও “স্নেহাননা”। অর্থাৎ অসাধু পাপ-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে তিনি যাদৃশী করাল, তদ্রূপ সাধু

ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তির চক্ষে তিনিই পুনর্বার “সুখপ্রসন্ন বদনা  
স্নেহাননা” মূর্তি-ধারিণী হয়েন।

কাল মোহিনী কালীর রূপ বর্ণনচ্ছলে তাঁহাকে “ঘোরাং”  
অর্থাৎ ঘোর রূপা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পদের  
দুই প্রকার তাৎপর্যার্থ আছে। প্রথমতঃ, আদিতে যখন  
কিছুই ছিল না, তখন উৎপৎস্যমান জীবদিগের ও জগতের  
পক্ষে সেই কালরূপী ব্রহ্ম মহাতমসচ্ছন্ন ঘোরাকাররূপে  
পরিণত ছিলেন। সেই কালের প্রতিক্রম স্বরূপ অর্থাৎ  
আদি রূপ বর্ণনার্থ কালীর “ঘোরা” বিশেষণ প্রদত্ত হই-  
য়াছে।

দ্বিতীয়তঃ মহাকাল তমো-গুণ-রূপ সংহারাধার হয়েন।  
সেই সংহার-কর্তা মহাকালের শক্তি কালীর তমোগুণাত্মক  
নাম “ঘোরা” হইয়াছে।

কালী মূর্তির অপর নাম “মুক্তকেশী”। তাৎপর্য এই  
যে সংসারের মায়াজাল তদীয় কেশজাল স্বরূপ; এবং এই  
ব্রহ্মাণ্ড কালাবয়ব স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডময়ী কাল-শক্তির  
পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ দেহে ঐ কেশজাল দোলায়মান আছে;  
তাৎপর্য এই যে, মায়াই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থকে ঘূর্ণ্যমাণ  
ও দোলায়মান করিতেছে। অপরন্তু ঐ মায়া সঙ্কুচিতা বা  
বদ্ধা না হইয়া সতত বিস্তৃতই আছে এবং তাহাতে বিমোহিত  
ব্যক্তিগণের চিত্ত সদাই দোলায়মান হইতেছে। পক্ষান্তরে  
মুক্ত পুরুষেরা ঐ মায়াতে আকৃষ্ট না হইয়া সততই স্থির

ভাবে রহিয়াছেন ; সুতরাং স্বকৃতিবান্ জ্ঞানিগণের পক্ষেও তিনি ( মুক্ত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন কেশ যাহার—এবন্তুতা ) মুক্তকেশী হইয়াছেন । আহা কি আশ্চর্য্য অঘটন ঘটনা ! বদ্ধ ব্যক্তির চঞ্চলতা এবং মুক্ত ব্যক্তির স্থিরভাব অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে । ঐ মায়া রজ্জ্বতে যে ব্যক্তি বন্দী আছে, সেই দৌড়িয়া বেড়াইতেছে ; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই বন্ধন মুক্ত, সে অতি শান্ত ভাবে স্থির হইয়া চিরকালের জন্য বিশ্রাম স্থখ লাভ করিতেছে !!! .৪.

কালীমূর্তি চতুর্ভূজা বলিয়া নির্দিষ্ট । ঐ চতুর্হস্তই চতুর্বর্গস্বরূপ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধন বা প্রদানার্থ খড়্গ, মুণ্ড, বর ও অভয়রূপ অস্ত্র সকল পরিধৃত হইয়াছে । যে হস্তে খড়্গ সেই হস্তে ধর্ম্ম । কারণ অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন শাসন ও অস্ত্র দ্বারাই হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত কালীমূর্তি মহামোহাদিরূপ অধর্ম্মচয়ের মস্তকচ্ছেদন করণ-চ্ছলে বাম হস্তের উর্দ্ধ ভাগে ভয়ানক কুপাণ ধারণ করিয়াছেন । শত্রু বিনাশ ভিন্ন সম্পদ ও অর্থ লাভ হইতে পারে না ; ইহাই দেখাইবার ছলে একহস্তে বৈরি-মুণ্ডধারণ করিয়াছেন । যে হস্তে অভয়, তাহাতেই মোক্ষ । কারণ, মোক্ষ ভিন্ন ভয়ের শাস্তি হয় না ।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ।

এই হেতু মাঠেঃ রবের প্রতিক্রম স্বরূপ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিতেছেন । যে হস্তে বর, তাহাতেই



কাম। কারণ, বেদে ব্রহ্ম শক্তিকে সর্বকাম-পূর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সকল কামুনাই পূর্ণ হয়। সেই কামনা-পূরণচ্ছলে বর-হস্ত ধারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে কালীমূর্তিকে “ দক্ষিণা কালী ” নামেও নির্দেশ করিয়াছেন। মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য প্রকটিত আছে। যথা—

“ পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিষদ্যাতে।

বামা সা দক্ষিণং জিহ্বা মহামোক্ষ-প্রদায়িনী ॥ ”

অথবা—

“ দক্ষিণম্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সূতঃ।

কালীনাম্নো পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমস্ততঃ ॥ ”

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে পুরুষকে “ দক্ষিণ ” ও প্রকৃতিকে “ বামা ” বলা যায়। সেই বামা দক্ষিণকে জয় করিলেই ( দক্ষিণা নামে অভিহিত হইয়া ) মহামোক্ষ প্রদান করেন।

অথবা, রবির পুত্র যমরাজ দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। তিনি “ কালী ” এই নাম শ্রবণ করিলে ভীতিযুক্ত হইয়া সমস্তাৎ পলায়ন করেন।

ইহা দ্বারা দক্ষিণা শব্দের দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি লভ্য হইতেছে। যথা—দক্ষিণা অর্থাৎ পুরুষাবলম্বিনী প্রকৃতি। অথবা দক্ষিণা অর্থাৎ দক্ষিণদিকে অবস্থিত যমরাজের জয়-

কারিণী । তাৎপর্য্য এই যে, দক্ষিণদিক মৃত্যুর অধিকার স্থান, এই কাল শক্তির উপাসনা বলে সেই অধিকার খণ্ডন হয় ।

দক্ষিণা শব্দের অপর ব্যুৎপত্তি এই যে, কালী আরাধনা দ্বারা দেহ উৎপত্তির লয় হইয়া দেহীর দেহের দক্ষিণান্ত কার্য্য সমাধা হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ অবাস্তুর পাশ একবারে খণ্ডন হইয়া যায় । ইহাই জানাইবার নিমিত্ত কালী দক্ষিণা নাম ধারণ করিয়াছেন ।

কালীকে শাস্ত্রে “ মুণ্ডমালী ” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । ঐ মুণ্ডমালা প্রকৃত নরশিরোমালা বা তন্মধ্যে আর কিছু মন্ম আছে, ইহার মীমাংসা করা নিতান্ত সহজ নহে । কেহ কেহ বলেন, ঐ মালা বর্ণমালার প্রতিক্রম । অপরে কহেন, যে, জগদুৎসুক কালগ্রাসে সর্বদেশের সর্ব-প্রাণীই নিপতিত হয়, কেহই সেই করাল কাল মুখের অতিক্রম করিতে পারে না । অর্থাৎ কালে সকলেরই শিরোনিস্ত হয় । ইহাই দেখাইবার জন্য কাল শক্তির গলদেশে নরশিরোমালা বর্ণিত হইয়াছে । এই জন্যই কালী “ মুণ্ডমালী ” নামে অভিহিত ।

অপর নাম “ দিগম্বরী ” । তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বত্র সমানরূপে অবস্থিতা । স্ততরাং পূর্বাদি দশ দিক্ তাহার অম্বর অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র স্বরূপ ।

উল্লিখিতরূপে ভগবতী কালীমূর্ত্তির নাম সকলের ব্যুৎপত্তি যে পরমার্থ-তত্ত্বের প্রতিপাদক, তাহার কয়েকটি উদাহরণ

প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ঐরূপ কল্পিত মূর্তির প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সার্থকতা কি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

কালশক্তির কল্পিত মূর্তিতে নীলমাণ্ডলের আরোপ হইল কেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ত্রয়োদশোল্লাসে তাহার মৰ্ম্ম স্ফুটীকৃত হইয়াছে। তথাহি,—

“ উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।

গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যা প্রকল্পিতম্ ॥

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণো বিলীয়তে।

প্রবিশস্তি তথা কাল্যাং সৰ্ব্বভূতানি শৈলজে ॥

অথ তস্যাঃ কালশক্তেঃ নিগুণায়া নিরাকৃতেঃ।

হিতায়াঃ প্রাপ্তমূৰ্ত্তেচ বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ”

হে প্রিয়ে শৈলজে! তোমাকে পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্য সাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ার অনুসারেই দেবী কালীর রূপ কল্পিত হইয়াছে। যেরূপ শ্বেত পীতাদি সৰ্ব্বপ্রকার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ কালীতে সৰ্ব্বপ্রকার প্রাণীর জীবাত্মা প্রবেশ করে। এই নিমিত্তই সেই নিগুণা ও নিরাকার হিতকারিণী কালশক্তির কল্পিত মূর্তিতে কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে।

কালরূপ কালীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ কি না, কালী বীজার্থ অনুধাবন করিলে ঐ সন্দেহের নিশ্চয় নিরাকরণ হইতে পারে। যথা তন্ত্রে,

“ক কারোজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞানচিৎকলা

জ্ঞাননার্ণ সমাযোগাৎ সর্বতেজোময়ী শুভা ॥

দীর্ঘেকারেণ দেবেশী সাধকাভীষ্টদায়িনী ।

বিন্দুনাং নিষ্ফলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী ।

বীজত্রয়েণ দেবেশী সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণী ॥ ”

“ক” কারের উজ্জ্বল রূপতা বশতঃ দেবেশী ( মহাশক্তি ) সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী ; অগ্নিবীজ অর্থাৎ “র” বর্ণের সংযোগ প্রযুক্ত সর্ব-তেজোময়ী এবং শুভ দায়িনী ; দীর্ঘ “ঙ্গ” কার দ্বারা সাধক ব্যক্তির অভীষ্ট ফল দানে সমর্থ ; বিন্দু (ং) অর্থাৎ অনুস্মার বর্ণের নিষ্ফলতা অর্থাৎ নিষ্কামতা বশতঃ কৈবল্য দায়িনী হইলেন । এই বীজত্রয় দ্বারা ( ক+র + ঙ্গ+ং = ক্র+ঙ্গ+ং ) সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কারিণী হইয়া থাকেন ।

কাল কামিনীর শরীরকান্তিকে কোন কোন স্থলে, মহা-মেঘ-প্রভারূপে বর্ণন করেন ; তন্মধ্যে এই যে, মেঘ কান্তি অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, মহাপ্রলয়ে এই জগতীহ স্বৈত পীতাদি সমস্ত বর্ণ এই কৃষ্ণবর্ণ-রূপ মহাক্রকারে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এবং সেই তিমির-শ্রেণী সর্বভূতাদিকে গ্রাস করিয়া সর্ব পদার্থের আবরণরূপা সর্বব্যাপিনী হইলেন । এদিকে মেঘেরও সর্ব-ব্যাপকত্ব রহিয়াছে । তজ্জন্যই মহাকাল-কামিনীর শরীর-কান্তিকে মহামেঘ-প্রভা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ।

কালশক্তির অধর-কোণ-দ্বয়ে রুধির-ধারা বিগলিত,

এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জগন্নাশিনী অর্থাৎ সংহার কর্তৃক-সজ্জা ক্ষুণ্ণীকৃত হইয়াছে। যথা—

“ গ্রননাং সর্বসত্তানাং কালদন্তেন চৰ্ৰণাং । ”

সর্ব জন্তকে গ্রাস ও কালদন্ত দ্বারা চৰ্ৰণ হেতু, ( রুধির দ্বারা পতিত ইত্যাদি ) ।

কালীর কর্ণোপরি ভয়ানক শর অথবা শবযুগল ভূষণরূপে বর্ণিত আছে। ঐ শব অর্থাৎ ভূত পদে পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ ঐ ভূতনাথ-রমণীর অব-তংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ স্বরূপা হইয়াছে। এতদ্বারা পঞ্চভূতা-ল্লক নিখিলজন্যময়ীভাবই বুঝাইতেছে। যথা যোগবাশিষ্ঠে ;—

বিশ্ববীচিবিনাশোহয়ং চিং-স্বধাক্ষেরুদক্ষতি ।

বিলীয়তেচ তত্রৈব মধ্যে কিং মূল তন্ময়ং ॥”

কালীর ধ্যানে তাঁহাকে পীনোন্নত পয়োধর-ধারিণী রূপে বর্ণন করিয়াছেন। পীন শব্দে স্থূল, পয়োধর শব্দে স্তন ; এই স্থূল স্তন ঐ কালীর সম্পত্তি স্বরূপ হওয়াতে তিনি পীন-স্তনা-চ্যা বলিয়া পরিগণিত। ইহার মর্ম্ম এই যে, ঐ কাল-কামিনী ত্রিভুবনজননী হইলেন এবং সকলকেই পালন করিয়া থাকেন। এ কারণ, ঐদৃশ স্তন বর্ণন দ্বারা জগদ্ধাত্রী ও জগজ্জননী রূপের বর্ণনা হইয়াছে।

তাঁহাকে “শব-কর-কাঞ্চীভরণা” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। গতাস্ত্রজনগণের কর-সমূহে তাঁহার কর্ণভূষণ অর্থাৎ নিতম্ব ভাগ সর্বতোভাবে শোভাযিত হইয়াছে। এই

বাক্যে ঐ কাল শক্তির জগৎ-সংহার-কর্তৃত্ব ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেছে। ইহা দ্বারা অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, এই ভাব বুঝায়। যথা পঞ্চদশাং

“আবির্ভাবয়তি স্বস্বিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।

প্রাণি কৰ্ম্ম বসাদেন পটৌ যদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥

পুনস্তিরো ভাবয়তি স্বাস্বন্যোবাখিলং জগৎ। ”

প্রাণিগণ যেমন প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার্য বস্ত্রকে কখন প্রসারিত, কখনও বা সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ তিনি ( পরম শক্তি ) প্রলয়-কাল বিলীন সমস্ত জগৎকে আপনাতে আবির্ভূত করেন; এবং পুনঃ প্রলয় কালে, তাহা আপনাতেই তিরোভাবিত করেন।

কাল-কামিনী কালীকে “শ্মশান বাসিনী” বলিয়া উক্ত করিবার তাৎপর্য এই যে, লয় কালে সকলে পরমাত্মা কাল-রূপে শয়ন করে; আর পুনর্বার জাগরিত হয় না, অর্থাৎ সকলে শ্মশান শায়িত হয়। এই কারণে ঐ কাল শক্তিকে শ্মশান বাসিনী বলিয়া থাকেন। সর্বলোকের সংহারই যে তাঁহার শ্মশান বাসরূপে কল্পিত, তদ্ব্তে তাহা স্বুটীকৃত আছে। যথা,—

“আলীঢ়ং বামপাদস্ত প্রত্যালীঢ়স্ত দক্ষিণং।

সংহাররূপিণী কালী জপমোহনকারিণী ॥

বহ্নিকৃপা মহামায়া সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

অতএব মহেশানী শ্মশানালয়বাসিনী ॥ ”

শ্যামা ত্রিনয়নী হইবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি উদ্ধাধঃ  
সম্মুখ দর্শিনী এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিকালকে  
দৃষ্টি করিয়া থাকেন। তথাহি মুণ্ডালা তন্ত্ৰে—

“শশিসূর্য্যগ্নিভিনৈত্রৈ রথিলং কালিকা জগৎ।

সংপশ্যতি যত স্তম্ভাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ং।”

( ঈশ্বরশক্তিস্বরূপা ) কালিকা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি  
এই তিন নেত্র দ্বারা জগৎ অবলোকন করিতেছেন। এই  
নিমিত্তই তাঁহার তিনটি নেত্র কল্পিত হইয়াছে।

কল্পিত প্রতিমাতে কালীকে শবহৃদয়োপরিস্থিতা করিবার  
তাৎপর্য্য এই যে, শবের হৃদিতে অর্থাৎ শয্যাতে স্থিত  
হইয়া শব সাধনাদি করিলে ঐ কাল শক্তির কালরূপত্বের  
নিরাকরণ হয় অর্থাৎ তাঁহার আরাধনায় সাধক ব্যক্তি মৃত্যুকে  
জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে। এই নিমিত্তই শবরূপী  
মৃত্যুঞ্জয় তদীয় পদতলে সংস্থাপিত।

কালীকে শিবারব-বেষ্টিতা বলিয়া নির্দেশ আছে। ইহার  
তাৎপর্য্য এই যে, শিবা অর্থাৎ মঙ্গল দায়িকা আবরণ দেবতা-  
গণ, তাঁহাদিগের রব অর্থাৎ শব্দ দ্বারা বেষ্টিতা অর্থাৎ শম,  
দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,  
ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রভৃতি চতুর্বিংশতি  
তত্ত্ব সেই ব্রহ্ম রূপা কালীর আবরণ স্বরূপা হইয়া বেষ্টিত  
করিয়া আছেন। এই নিমিত্তই “শিবাভি ঘোররাবাভি  
শচতুর্দিশু সমন্বিতা” বলিয়া তাঁহাকে ধ্যানে বর্ণন করিয়াছেন।

কাল-শক্তি কালীকে মহাদেব অর্থাৎ মহাকাল সহ বিপ-  
রীত-রতাতুরা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার গুঢ় তাৎপর্য্য  
এই যে, পরমা প্রকৃতিরূপ যুবতীরূপা কালী নিগুণ অর্থাৎ  
নিশ্চেষ্ট পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মাকে সগুণ অর্থাৎ সচেষ্ট  
করিয়া থাকেন। তিনিই নিশ্চেষ্ট পরব্রহ্মে অধ্যাস-স্বরূপ  
হইয়া আপনি কৰ্ম্ম-কারিণী হয়েন এবং বিপরীত ভাব অর্থাৎ  
নিশ্চল নির্বিকার আত্মাতে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যোজনা  
পূর্ব্বক তাঁহাতে কৰ্ম্ম কর্তৃহ, অভিমানিত্ব ও অহংতত্ত্বের  
ভাবোৎপাদন করিয়া থাকেন। যথা,

“মহান্ ককার পুরুষো নিগুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

প্রকৃতিধাতিরূপাখ্যা তস্যা জাত মিদং জগৎ ॥”

মহান্ ককার পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা বস্তুতঃ নিগুণ।  
প্রকৃতি তাঁহাতে উপগমন করেন। সেই প্রকৃতি হইতেই  
এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

অপিচ অধ্যাত্ম-রামায়ণে

“রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নাহুশোচ-

ত্যা কাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।

আনন্দমূর্ত্তিরমণঃ পরিণামহীনো

মায়াগুণানহুগতো হি তথা বিভাতি ॥”

প্রকৃত রাম, গমন করেন না; অবস্থানও করেন না।  
অনুশোচনা করেন না। কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না,  
পরিত্যাগও করেন না। কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না।



তিনি আনন্দ-মূর্তি-স্বরূপ; তাঁহার পরিণাম নাই। তিনি কেবল মায়াগুণে অর্থাৎ প্রকৃতি-মিশ্রিত হওয়াতেই তাদৃশ মূর্তিমান পুরুষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।

এবম্প্রকার ভাবে সেই পরমাশক্তিকে আমাদিগের মূর্তির আধেয় পদার্থ জ্ঞান করিতে হইবে।

ধ্যান দুই প্রকার। যথা কুলার্গবে,

“ধ্যানস্ত্ব দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থলস্থল-বিভেদতঃ।

সাকারং স্থলমিত্যুক্তং নিরাকারস্ত্ব স্থলকং ॥

তৈশ্চৈব মনসঃ কেচিৎ স্থলধ্যানং প্রচক্ষতে।

স্থলেচ নিশ্চলং চেতো ভবেৎ স্থলস্থল-নিশ্চলং ॥”

স্থল ও সূক্ষ্ম ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। সাকার ধ্যানকে স্থল ও নিরাকার ধ্যানকে সূক্ষ্ম ধ্যান কহে। কতকগুলি ব্যক্তি মনের স্থিরতার নিমিত্ত স্থল-ধ্যান অবলম্বন করেন। কারণ, অন্তঃকরণ স্থল ধ্যানে নিশ্চল হইলে, সূক্ষ্ম ধ্যানেও নিশ্চল হইয়া উঠে।

অতএব স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে সংসার-বিষয়-বাসনাক্ষুণ্ণ-অস্থির-মানস ব্যক্তিগণের চিত্ত-তৈশ্চৈব নিমিত্ত স্থল ধ্যানের নিতান্ত আবশ্যিকতা আছে। ঐ ধ্যানের কল্পনা-ভেদে স্ত্রী পুরুষ মূর্তির আরাধনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। তথাহি তন্ত্রে—

“সাকারং নিরাকারং দ্বিবিধং ব্রহ্ম পার্শ্বতি।

তয়োরেকতরৈণৈব মুক্তিং যাস্যন্তি মানবাঃ ॥”

হে পার্শ্বতি । ব্রহ্ম দুই প্রকার । সাকার ও নিরাকার । তাহার একতরের উপাসনা দ্বারা মানবেরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।

এ সকল ব্যবস্থার সহিত একবাক্যতা করিবার নিমিত্ত সাকার উপাসনার মুক্তি-দাতৃত্ব-বর্ণনকে প্রবর্তনা বাক্য বলিতে হইবে । বস্তুতঃ সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপানস্বরূপ । নিরাকার উপাসনাই নির্বাক মুক্তির অব্যবহিত কারণ ।

নিরাকার ও নির্বাকার পরমাত্মাকেই অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনার নিমিত্ত স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ ইত্যাদি বিবিধমূর্ত্তি-বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । তথাহি কালিকা উপনিষদে—

“ত্বমানন্দময়ী মহামোহ দমনী কচিং পুংবিগ্রহা কচিং  
স্ত্রীবিগ্রহা কচিদম্বা কচিন্মধ্যা কচিংপূর্ণা কচিং কৃষ্ণা  
কচিং গৌরা কচিদ্রক্তা, কচিং ব্রহ্মরূপা কচিং বিষ্ণুরূপা  
কচিং শিবরূপা কচিং অরূপা কচিং সরূপা, সৰ্ব্বরূপা  
বিদ্যাস্তে । অস্যা অংশেন সৰ্ব্ববিদ্যা সৰ্ব্বদেবা স্ত্রৈলোক্যে  
নান্যোহস্তি সত্যং সত্যং সন্দেহো নাস্তীত্যভেদজ্ঞানাৎ ।” \*

এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, কালীমূর্ত্তি যে, সৰ্ব্বময়ী এবং সৰ্ব্বাধারা, তৎপক্ষে আর কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না । কালশক্তিরূপা কাল-দমনী কালীর উপাসনাতেই জীব পরিমুক্ত হইতে পারে ।

---

\* অতি সহজ সংস্কৃত বলিয়া অনুবাদ করা গেল না ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

### কালীমূর্তি—আন্তরিক উপাসনা ।

“অচিন্ত্য মিতাকারশক্তিস্বরূপা

প্রতিব্যক্তাধিষ্ঠান সৰ্বৈকমূর্তিঃ ।

গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা

স্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥”

হে মাতঃ ! তুমি চিন্তার অতীত, অপরিমিত-আকার  
বিশিষ্ট পরব্রহ্মের শক্তি স্বরূপা, মানব বুদ্ধিতে একমাত্র  
সহগুণময় মূর্তি বিশিষ্টা । তুমি গুণাতীতা, দ্বন্দ্ব-রহিতা, একমাত্র  
বোধের গম্যা এবং পরম ব্রহ্ম রূপে সাধনীয়। হইয়াছ ।

পূর্বাধ্যায়ের অথও-দণ্ডায়মানা কালমোহিনী কালীর  
নাম ও রূপের মৰ্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে । ঐ মৰ্ম্ম ব্যাখ্যা  
কালীর বাহ্য রূপের বর্ণন মাত্র । চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহা কিছু  
মনুষ্যাকৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃশ্য হইতেছে, তাহা কেবল কল্পনা-  
কৃত । ঐ স্থূলাকৃতি বস্তুতঃ মিথ্যা । কেবল ব্রহ্ম-বিভূতির  
পরিচায়ক মাত্র । সাধকের মনোভীষ্ট-সিদ্ধার্থ ভিন্ন ভিন্ন  
প্রবৃত্ত্যানুসারে অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ ত্রয়ের তারতম্য বশতঃ  
কেবল চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত রূপক ব্যাজে ঐ স্থূল মূর্তি বর্ণিত  
হইয়াছে । জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলে ঐ মূর্তির নিগূঢ়  
মৰ্ম্ম বিশিষ্ট যে ভাবোদয় হয়, তাহাই সেই ভাবময়ী পরমা

প্রকৃতির প্রকৃতরূপ। সেই রূপই এই অখিল জগজ্জপে পরিণতা, সকলের হৃদয়স্থিত, বুদ্ধিগতা এবং জ্ঞানগম্য। মাত্র হয়েন।

এইরূপ কালশক্তি একমাত্র হইয়াও জগৎ সংসার সম্বন্ধে ত্রিবিধ রূপা হইয়াছেন। প্রথম, আদিতে আদ্যরূপা পরমা প্রকৃতি। যাহাতে আদ্যন্ত-রহিত পরমাত্মা গর্ভাধান স্বরূপ বীজ বপন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির সূত্রপাত করেন। সুতরাং ঐ আদ্যাই ব্রহ্মশক্তি রূপে জগৎ-জননী হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, মধ্যরূপা সত্ত্বগুণময়ী। ঐ উৎপত্তির স্থিতির নিমিত্ত পালনাদি কার্যে প্রবৃত্ত থাকেন।

তৃতীয়, অন্তে তমোগুণাত্মিকা কালরূপা। এই সৃষ্টি-সংহারে অতি প্রথমা কালীরূপে আবির্ভূতা হয়েন।

এই মূর্তির উপাসনা কাণ্ড অতি মনোহর। ভক্তি বিশিষ্ট হৃদয়ে সেই ভক্তি-শ্রদ্ধাপাদ কাল-রমণীর আরাধনা করিলে অন্তঃকরণ ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায় এবং ব্রহ্মশক্তি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া নিগুণাত্মক পর-তত্ত্বের উৎপত্তি ও সংসার প্রবৃত্তির খণ্ডন হইতে থাকে। ঐ ভাব ময়ীর উপাসনা শুদ্ধ ভাব-ময় উপকরণে করিতে হয়, কারণ তিনি ভাবের বিময়; ভাবের অভাব হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন সাধক ভাবাত্মক উপচার সমূহ এবত্র করিয়া ভক্তিভাবে ঐ ভাব ময়ীর চরণে অর্পণ করেন, তখন নিশ্চয়ই সংসার ভাব পরিত্যক্ত হইয়া সত্ত্বময় পারমাত্মিক ভাবের উদয় হইতে

থাকে। এই নিমিত্তই জ্ঞানিবর রামপ্রসাদ আপন গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন,—“মন,কর কি তব্ব তাঁরে; ওরে উন্মত্ত ! আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্তে পারে।” হৃদয়াক্রকার-রূপ তিমিরালয়ে ভক্তি-ভাবাঘ্নি উদ্দাপন করিলে সেই তিমিরবর্ণা কালরমণীর রূপ দর্শন হয় এবং সেই মহান্ রূপের আলোক মালায় দেহস্থ লমস্ত অজ্ঞানাক্রকার লয় ও ধ্বংস হইতে থাকে।

পূর্বের নাম রূপের মৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ কাল-কামিনী কালীর উপাসনা অর্থাৎ আন্তরিক পূজা সাধনাদি যে ভাবে করিতে হয়, তন্মৰ্ম্ম কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

কালীর বাহ্য মূর্তিতে শবাসন কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু অন্তরে সাধকের হৃদয়কে আসন করিয়া তত্পরি হৃদয়া-ধিষ্ঠাত্রী কালীকে বসাইতে হয়। বাহিরে স্নানীয় জলে সেই শ্রীঅঙ্গের অভিষিক্তন করিবার ব্যবস্থা; কিন্তু হৃদয়ে সহ-স্রার-গলিত অমৃতধারা সিঞ্চে ঐ স্নান কার্য্য সমাধা করিতে হয়। বাহিরে সামান্য জলে পাদ ধৌত করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরে ঐ অমৃত বারিকে পাদ্য স্বরূপে কল্পনা করিয়া জগজ্জননী কালীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। বাহিরে দুর্ভাক্ত-পুষ্প-চন্দনাদি-মিলিত অর্ঘদানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্তরে দশেন্দ্রিয়রূপ পুষ্পের অধিষ্ঠাতা মনকে অদ-স্বরূপে প্রদান করিতে হয়। বাহিরে সামান্য জলে আচ-মনের কল্পনা হইয়াছে, কিন্তু অন্তরে ঐ অমৃত ধারা আচমনীয়

রূপে দান করিতে হয়। বাহিরে কার্পাসাদি সূত্র নিষ্প্রিত বস্ত্রাদি পরিধেয় রূপে দানের বিধি আছে, কিন্তু অন্তরে মায়াবৃত-পটাচ্ছন্ন সর্বব্যাপক আকাশ তত্ত্ব বস্ত্ররূপে সেই আকাশ রূপিণী দিগম্বরীর পরিধেয় কল্পনা করিতে হয়। বাহিরে শ্বেত রক্ত চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য স্বরূপে দানের বিধি আছে ; কিন্তু অন্তরে পার্থিব-অংশ-সম্মত গন্ধ-তত্ত্বকে ঐ গন্ধ চন্দন রূপে দান করিতে হয়। বাহিরে জবা মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প দানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্তরে অন্তঃ-করণ রূপ চিত্ত বৃত্তিকে পুষ্পরূপে সেই চিত্তস্বরূপিণী কাল-কামিনীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। বাহিরে কতিপয় গন্ধ-দ্রব্য-সংশ্লিষ্ট ধূপদানের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু অন্তরে প্রাণ-অপানাদি কতিপয় বায়ু তত্ত্বকে ধূপ স্বরূপে প্রদান করিতে হয়। বাহিরে তৈলাক্ত বর্তিকায় অগ্নি উদ্দীপন করিয়া দীপ দানের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু অন্তরে পঞ্চভূতাংশ তেজঃ পদার্থকে ঐ দীপরূপে কল্পনা ও দান করিতে হয়। বাহিরে স্বর্ণ রৌপ্যাদি অথবা বস্ত্র নিষ্প্রিত ছত্র ঐ কালশক্তি কালীর শিরোভাগে ধারণ করিবার বিধি আছে ; কিন্তু অন্তরে শিরোবস্থিত সহস্রপত্রস্বরূপ সহস্রার পদ্যুকে মৈস্ত্রকাবরণ ছত্ররূপে দান করিতে হয়। বাহিরে স্তম্ভধর তান মান মিলিত গীতবাদ্য দ্বারা দেবীর সন্তোষ সাধন করিবার বিধান আছে ; কিন্তু অন্তরে আকাশ তত্ত্বের তন্মাত্র শব্দ তত্ত্বকে ঐ গীতবাদ্য রূপে কল্পনা ও শ্রবণ করাইতে হয়। বাহিরে নট নর্তকীগণ

ঐ নটবররমণীর সম্মুখে পূজাবসানে নত্য করিয়া থাকে ; কিন্তু অত্রেদশেন্দ্রিয়ের কার্যাবলী ও মনের অশেষবিধ গননকে নর্তক নর্তকীরাপে করনা করিতে হয়। বাহিরে পদাদি নানাবিধ পুষ্পগ্রন্থিত মালাদান করিবার বিধি আছে ; কিন্তু অত্রে অশেষবিধ ভাব পুষ্প ভক্তিবৃত্তে গ্রন্থিত করিয়া ঐ ভাবনায়ের আপাদমস্তক পরিশোভিত করিতে হয়, অর্থাৎ অমাংসরূপ প্রথম পুষ্প, অনহঙ্কাররূপ দ্বিতীয় পুষ্প, অরাগ অর্থাৎ রাগ বিহানতারূপ তৃতীয় পুষ্প, মদ অর্থাৎ মদমত্ততা-ভাবরূপ চতুর্থ পুষ্প, অমোহরূপ পঞ্চম পুষ্প, অদ্বৈতরূপ ষষ্ঠ পুষ্প, অক্লেভরূপ সপ্তম পুষ্প, অমাংসরূপ অষ্টম পুষ্প, অলাভরূপ নবম পুষ্প, দয়ারূপ দশম পুষ্প, অহিংসারূপ একাদশ পুষ্প, ক্ষমারূপ দ্বাদশ পুষ্প, ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ ত্রয়োদশ পুষ্প, প্রীতিরূপ চতুর্দশ পুষ্প এবং সাত্ত্বিক জ্ঞানরূপ পঞ্চদশ পুষ্প ; এই সমস্ত ভাবরূপ পুষ্পেরদ্বারা সেই পঞ্চদশ শক্ত্যাঙ্গিকা পরমা প্রকৃতি ব্রহ্ম শক্তির পূজা করিতে হয়। বাহ্য মূর্তির নিকট ছাগাদি পশু বলিদান করিবার বিধি আছে, কিন্তু অন্তরে কাম ক্রোধাদি রূপ বৈরিনিচয়কে পশ্বাদি রূপে করনা করিয়া হনন করিতে হয়। বাহিরে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা নৈবেদ্য প্রদানের বিধি আছে, কিন্তু অন্তরে স্বধারানিরূপ স্বধামুখি ও ভক্তিরস প্লুত অতি কমনীয় চিত্ত বৃত্তিকে নৈবেদ্য রূপে উপহার দিতে হয়। বাহিরে সামান্য জলকে পানীয়রূপে প্রদান করিবার বিধি আছে,

কিন্তু অন্তরে প্রাণাপানাদি পঞ্চদশ বায়ুর পরিতৃপ্ত্যর্থ অর্থাৎ তৃষ্ণা নিবারণ জন্য পঞ্চভূতাত্মক জলীয়াংশকে পানীয়রূপে দান করিতে হয়। বাহিরে আহারান্তে খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করাইবার বিধি আছে ; কিন্তু অন্তরে বিশুদ্ধ হৃদয়রূপ মণি মন্দিরে রত্ন-সিংহাসনোপরি অনন্তরূপী মহাকাল পতির সহিত মিলিতা করিয়া শয়ন করাইতে হয়। বাহ্য পূজাতে করমালা বা পদ্মাদি-বীজ-মালাতে কালীর বীজাক্ষররূপ মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে ; কিন্তু অন্তরে পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মিকা মালিকা, যাহা শিব-শক্ত্যাভ্যুত সূত্রে গ্রথিত এবং ব্রহ্মায়া পরমা প্রকৃতি যাহার মেরু স্বরূপা সেই বর্ণ মালার দ্বারা বর্ণময়ী কালীর জপ কার্য্য সমাধান করিতে হয়।

কাল রমণীর মন্ত্রময় দেহ, ইহা নিগূঢ় তত্ত্বাস্থেয়ী স্মসাধকেরা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। যথা—

“ ককারোজ্জল-রূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞান-চিৎকণা ।

জলনার্থসমাযোগাৎ সর্ব্ব তেজোময়ী শুভা ॥

দীর্ঘেক্ষারেণ দেবেশী সাধকাতীষ্ট দায়িনী ।

বিন্দুনাং নিফলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী ॥

বীজত্রেয়েণ দেবেশী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥”

অর্থাৎ ককার পদে সর্ব্ব তেজোময়ী, দীর্ঘ ঙ্গকার পদে সাধকের অভীষ্টদায়িনী ; এবং অনুস্বার পদে সাংসারিক ফলাফল রহিত কৈবল্য ফলদায়িনী ।

এইরূপে বীজত্রেয় একত্র করিলে সৃষ্টি স্থিতি নাশকারিণী



এই অর্থ প্রতিপাদিত হয়। এই সকল মন্ত্রার্থের অনুধাবন করিলে কালীমূর্তি যে মনুষ্যাকৃতির ন্যায় বিকারাভিভূতা নহে, শুদ্ধ কেবল চিৎস্বরূপা ব্রহ্ম-বিভূতি প্রতিপাদক ও জ্ঞানোপ-করণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অনেক স্মৃতি ও মৌভাগ্য না থাকিলে এই কালী নামে ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে না। যে কালে সাধকের প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্মের অবসান হইবার উপক্রম হয় এবং যে কালে তাঁহার সংসারগ্রন্থিচ্ছেদ হইয়া জন্ম-মৃত্যু-রূপ অদীর্ঘব্রতের দক্ষিণান্ত হইবার সময় উপস্থিত হয়, সেই কালেই সাধক এই দক্ষিণাকালীর পদা-শ্রিত হয়েন। আহা! এই তত্ত্ব পরম রমণীয়! কাল কামিনী কালীর জ্যোতির্গ্নয় মূর্তি দর্শন করিলে আর কালের ভয় থাকে না; এবং সমস্ত ভূমণ্ডলকে কালীময় দর্শন করিয়া কালীভক্ত সাধক একবারে কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইয়া যান।

মাতঃ সর্বময়ি! প্রসীদ পরমে বিশ্বশি বিশ্বাশ্রয়ে,  
ত্বং সর্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তুত্বদন্যাং শিবে।  
ত্বং বিষ্ণু গিরিশত্বমেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃ পরা,  
কিং বর্গ্যং চরিতং হ্যচিস্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যাং ময়া ॥

হে মাতঃ! বিশ্বমধ্যে তুমিই সর্ব-পদার্থ স্বরূপ, তোমা ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। মা তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু ও তুমিই গিরিশ, তুমিই পরাশক্তি। হে অচিন্ত্য-চরিতে! আমি তোমার মহিমা কি বর্ণন করিব, তোমার অচিন্ত্য চরিত্র ব্রহ্মাদিরও গম্য নহে।

বর্থাধ্যায় ।

শ্রাদ্ধ মন্ত্রার্থের মৰ্ম্ম ।

অশ্বদ্দেশে পিতৃ পিতামহাদির শ্রাদ্ধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রের এক বিশেষ আজ্ঞা ; কিন্তু তাহাতে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিলে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয় । শ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত উৎসর্গ কার্যের পর শ্রাব্য পাঠের অর্থাৎ বেদমন্ত্র পাঠের বিধি আছে । কিন্তু সেই প্রচলিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে শ্রাব্যমন্ত্র মহাভারতাত্ম্য ইতিহাসাদির কয়েকটি শ্লোক মাত্র । প্রথমতঃ “যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-কব্য ” ইত্যাদি । অনন্তর “মম্বত্ৰী বিষ্ণুহারীত” ইত্যাদি । মধ্যে একটি শ্রুতি যথা—“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি । পরে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বীয় শ্লোক— “ভূর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ ” ইত্যাদি এবং “যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ ” ইত্যাদি । ইহাতে এই সন্দেহ হয়, যে যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপূর্ব-বংশীয় রাজারা যখন শ্রাদ্ধ করিতেন, তখন এই সকল শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ হইত কি না ? পাণ্ডবদিগের গুণকীর্তন পাণ্ডবীয় পূর্বপুরুষদিগের শ্রাব্য-পাঠে কোন মতেই সংগত হয় না । যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে তাঁহাদিগের শ্রাব্য পাঠ কি হইত ? বিশেষতঃ বেদ

পাঠের স্থলে ভারতাদি-শ্লোক পাঠেরই বা প্রয়োজন কি ? এই সংশয় জন্য ইদানীন্তন অনেকানেক ব্যক্তির মনোমধ্যে শ্রাদ্ধের প্রতি এক প্রকার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে । নব্য-দলের ত কথাই নাই ; তাঁহারা ত একবারে শ্রাদ্ধাদির শ্রাদ্ধ করিয়া শেষ করিয়াছেন ; ইদানীন্তন অনেক বিজ্ঞলোকেরও মনে শ্রাদ্ধের মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এ বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা বিশেষ মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়েন না । কেবল এই মাত্র উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকেন যে, পূর্ব পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত করা অন্যায় কার্য্য । আমার নিজের মনে এই মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে বহু দিবস হইতে নানামত সন্দেহ উপস্থিত ছিল ; পরে মহাত্মা জ্ঞানিবর পরমহংসের সাক্ষাৎকার লাভ করায় তাঁহার কৃপায় এই শ্রাদ্ধ বিষয়ক মন্ত্র যেরূপ অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল ।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই চারিবেদ শুদ্ধ “তত্ত্বমসি”, অর্থাৎ “তৎ সৎ” এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ হইয়াছে । “তৎ সৎ” পদে জীবেশ্বরের বিচার । অর্থাৎ যে জীব সেই আত্মা । যে আত্মা সেই জীব । এই উভয় বস্তুর বিচারই বেদ শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য । প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কালে যুধিষ্ঠিরাদির আখ্যান স্বরূপ যে শ্রাব্য মন্ত্র পাঠের প্রতি সন্দেহ হইতেছে, সেই আখ্যান বস্তুতঃ

নিগূঢ় অর্থে জীবেশ্বর বিচার। একারণেই শ্রাদ্ধ কাণ্ডে বেদার্থ জনক মন্ত্র স্বরূপ পাঠিত হইয়া থাকে।

সগুণ ও নিগূর্ণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্য সকলের তাৎপর্য্য এই যে, নিগূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা গুণ ও মায়া অবলম্বন করিলেই সগুণ ও জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন। গুণ ও মায়া রহিত চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা নিগূর্ণ হইবেন। ফলিতার্থে এই উভয়ের স্বরূপের ভেদনাই কেবল সোপাধিক জীব ও নিরূপাধিক পরমাত্মা, এই মাত্র। নীচতম কীট জন্তু হইতে উচ্চতম দেবমূর্ত্তি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রই মায়ার কার্য্য। যখন ভগবান সৃষ্টিলীলা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় মায়াতে উপগত হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইবেন। সেই মায়ার কার্য্যভেদে তাঁহাকে বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি কহে। ভুরিভুরি শাস্ত্র উল্লিখিত বৈদিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে।

“জড়রূপা মহামায়া রজঃস্বত্বতমোময়ী ।  
স্যা চাবরণয়া শক্ত্যা বৃত্তা বিজ্ঞানরূপিণী ॥ .  
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপস্বত্বাবতঃ ।  
তমোগুণাধিকা বিদ্যা লক্ষ্মী স্যা বিদ্যারূপিণী ।  
চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নানাথা ।  
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী ।  
যচ্চৈৎস্বরূপা ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা ॥”

শিব সংহিতা ।

ভগবানের মহামায়া জড়রূপা এবং ত্রিগুণময়ী বিজ্ঞান-  
রূপিণী। মায়া আবরণ শক্তিতে আবৃত হইয়া বিক্ষেপ স্বভাব  
বশতঃ পরমাত্মাকে জগদাকারে পরিণত করেন। আবরণ  
শক্তিতে আবৃত মায়া তমোধিকা হইয়া লক্ষ্মীরূপা হন।  
তাহাতে উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণু বলিয়া আখ্যাত করা যায়।  
সেইরূপ রজোধিকা মায়াকে সরস্বতী ও তদুপহিত চিৎস্বরূপ  
চৈতন্যকে ব্রহ্মা বলা যায়। ফলিতার্থে ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতির  
সংজ্ঞামাত্র ভেদ।

পাণ্ডবীয় আখ্যানকে উল্লিখিত বেদার্থ বিচার বলিয়া গ্রহণ  
করা যায়। বেদ শাস্ত্রে রূপক ব্যাজে একরূপ বর্ণিত আছে  
যে, ভগবান একমাত্র যোগমায়া দ্বারা পৃথিবী, জল, অগ্নি,  
বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূত সমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষ  
উৎপাদন করত আপনিই জীবেশ্বর রূপে সখাভাবে তাহাতে  
অধিবাস করেন। শরীরজ কৰ্ম্ম রূপ যে ফল উৎপন্ন হয়,  
তাহা আত্মারূপে ভোগ না করিয়া জীব রূপে ভোক্তা হইয়েন।  
যথা—

‘দ্বা স্পর্শমযুজা সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্লবং স্বাদ্যতি অনন্নমন্যো অভিচাক্ষীতি ॥”

ইতি তৃতীয় মন্ত্রকম্।

দুই পক্ষী একত্র যুক্ত হইয়া সখাভাবে এক বৃক্ষে বাস  
করেন। তাহাদিগের একজন সেই বৃক্ষের ফলভোগ করেন,  
অন্যে ফলভোগ করেন না। কেবল স্বাক্ষী স্বরূপ দর্শন করেন।

এস্থলে উচ্ছেদন বিষয়ে সমানতা প্রযুক্ত প্রাণিশরীরকে বৃক্ষ ও তাহাতে লিঙ্গোপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা ও তদ্বিহীন ঈশ্বর এই উভয়ের সমাধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। এক ক্ষেত্রজ লিঙ্গোপাধিক জীবাত্মা দেহাশ্রিত-কর্ম-নিষ্পন্ন স্বাদুফল ভোজন করেন; অন্য নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর তাহা ভোজন করেন না। নিত্য স্বাক্ষিত্বরূপে প্রেরয়িতা মাত্র।

মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

“যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাধ্রুমাঃ স্বকোজ্জুনো ভীমসেনোস্য শাখা।  
মাদ্রৌস্থতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।”

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ। ভীমসেন ও অর্জুন তাহার স্কন্ধ ও শাখা। নকুল ও সহদেব তাহার উৎকৃষ্ট পুষ্প এবং ফল। এই বৃক্ষের মূল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও বেদ আর ব্রাহ্মণ এই তিন।

উল্লিখিতরূপ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য সকলই সনাতন-বেদ-ভক্ত হিন্দুগণ পুরাকালে শ্রাদ্ধ সময়ে শ্রাব্য মন্ত্র স্বরূপে পাঠ করিতেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদির জন্মগ্রহণের পর ভগবান্ বেদব্যাস যখন যুগানুসারে মনুষ্য-গণের ক্ষমতা হ্রাস হেতু স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের পক্ষে বেদপাঠের অধিকার বিলুপ্ত করিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন, তৎকালে বেদ তাৎপর্যের সহিত একতা রাখিয়া ভারতীয় শ্লোক রচনা করেন। যুধিষ্ঠিরাদির অনন্তর-জাত লোকেরা ঐ বেদার্থ প্রতিপাদক ভারতীয়

শ্লোক সেই শ্রাব্য মন্ত্রস্থলে পরিগণিত করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, অনুধ্যানশীল হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে কাল অসীম পদার্থ। উহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে বিভক্ত। যথাক্রমে এই চারিযুগ চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে। স্ততরাং কত শত বা কত সহস্রবার সত্যাদি যুগ জগতে গতাগতি করিয়াছে, তাহার সীমা নাই। অতএব আমরা যে সময়ে বর্তমান রহিয়াছি, ইহার অব্যবহিত পূর্বে যে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের পূর্ব পুরুষেরা যে,

“ যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাক্রমঃ ”

ইত্যাদি শ্লোক শ্রাব্য মন্ত্র স্থলে পাঠ করিবেন, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পাণ্ডবদিগের আখ্যানের সহিত বৈদিক জীবত্রয়ের ঐক্য প্রতিপাদক তত্ত্বের এক-বাক্যতা আছে। এক্ষণে তাহা স্ফুটীকৃত হইতেছে।

পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চভূত ; দ্রোণদী যোগমায়া, স্বাক্ষীরূপে সখাভায়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্যাদিষ্ঠিত আছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নরনারায়ণ বলে। নরপদে লিঙ্গোপাধিক জীব, নারায়ণ পদে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা ও সমানরূপ। কেবল অর্জুন ভোক্তা, কৃষ্ণ ভোক্তা নহেন। সারথ্যাঙ্গীক্রিয়ার ছলে প্রেরকত্ব ধর্ম দেখাইতেছেন। তিনি পাণ্ডব সখা, পাণ্ডবদিগকে দেখেন এইমাত্র। সৃষ্টি সেতু ভেদক

যে শত দোষ, সেই শত দোষ নিবারণ হেতু ছুর্য্যোধনাদি শত কুরুর বিনাশ করিয়াছেন। ছুর্য্যোধনাদি শত ভাতৃরূপ শত দোষকে একমাত্র ভীম দ্বারা নিপাত করিয়াছেন ; কেননা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি যে কামাদি শত দোষ, তাহা এক বায়ু সাধন প্রাণায়ামেতেই বিনষ্ট হয়।

পঞ্চ পাণ্ডবাদি যে পঞ্চ ভূতাদি স্বরূপ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যাখ্যাত হইতেছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চ পদার্থ পঞ্চভূত নামে অভিহিত। এস্থলে পার্থিবংশ রাজা যুধিষ্ঠির—ঋমাণ্ড-বিশিষ্ট। পবন-পুত্র ভীম বায়ু-স্বরূপ। অর্জুন আকাশ স্বরূপ; একারণ তাঁহাকে ইন্দ্র-পুত্র বলিয়া খ্যাত করা হইয়াছে। আকাশ পদে ইন্দ্র; হুতরাং ইন্দ্রপুত্র অর্জুনও আকাশ পদের বাচ্য। আকাশ যেমন নীলাভ, অর্জুনও তদ্রূপ নীলবর্ণ। আকাশ স্বচ্ছ পদার্থ, ব্যবধান-শূন্য হেতু তাহাতে সারল্য আছে; অর্জুনও নির্মল চিত্ত এবং অবক্র ভাবাপন্ন। আত্মা যেমন সর্বব্যাপী, আকাশও সেইরূপ সর্বব্যাপক। তজ্জন্য আত্মাকে আকাশ শরীরী বলা যায়। এস্থলেও কৃষ্ণাৰ্জ্জুনকে সমরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে অভেদাত্মা কহিয়াছেন। অর্থাৎ যে কৃষ্ণ সেই অর্জুন, যে অর্জুন সেই কৃষ্ণ। সর্বভূতাপেক্ষা আকাশই ব্রহ্ম-সান্নিধ্য কহা যায়। তন্নিদর্শনার্থ অর্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং সন্নিধান প্রযুক্ত সারথ্যারূপ হইয়া এক-রথে সহবাস করিয়াছেন। কৃষ্ণকে সারথি বলাতে কৃষ্ণেচ্ছানুসারে



গতি, এবং পঞ্চভূত জড়পদার্থমাত্র, ইহা স্পর্শ করিয়া বলা হইয়াছে। নকুল ও সহদেব, জল ও অগ্নি স্বরূপ। একারণ, অশ্বিনী কুমারের পুত্র বলিয়া খ্যাত। অশ্বিনী কুমার সূর্যের তনুজ ; তাঁহাদিগের হইতেই নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি। সূর্য হইতে জলের এবং অগ্নিরও উৎপত্তি হয়। জলের শীতলতা ও আর্দ্রতা গুণ নকুলে বিদ্যমান রহিয়াছে। অগ্নির গুণ রূপ, তাহা সহদেবে বিদ্যমান আছে। সহদেব জ্যোতির্বিদ ছিলেন ; এজন্য তাঁহাকে অগ্নিরূপ কহা যায়। শরীর ধারণার্থ পঞ্চীকরণ প্রস্তাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশাদির অংশানুসারে ঐশ্বরী শক্তি দ্রোপদীরূপা যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণরূপ আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী হইয়াছেন। দ্রোপদীকে শ্রীকৃষ্ণ সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত না থাকিয়া তৎসম্বন্ধানস্বা হইয়া চেতনবৎ বিশ্বকার্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ দ্রোপদীও শ্রীকৃষ্ণ-লিপ্তা নহেন। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধানে থাকিয়া পঞ্চ পাণ্ডবাখ্য পঞ্চ ভূতকে পঞ্চীকরণরূপে অংশানুসারে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ ভগবদ্দিচ্ছানুসারে মহামায়া প্রকৃতিরূপে পঞ্চ ভূতাত্মক বিশ্বকার্য সম্পাদিকা হইয়াছেন। ইহাই দ্রোপদীর পঞ্চপতি যোজনার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। নচেৎ ইহা অজ্ঞেও বুঝিতে পারে, যে এক স্ত্রীর বিদ্যমান পঞ্চ পতি লোকতঃ শাস্ত্রতঃ উভয় বিরুদ্ধ হয়। একারণ দ্রোপদীর বিবাহকালে দ্রুপদ রাজাকে বেদব্যাস কহিয়াছিলেন, যে তুমি পঞ্চ

পাণ্ডবকে দ্রৌপদী প্রদান কর, ইহা বেদবিরুদ্ধ কৰ্ম্ম হইবে না । সৰ্ব্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস বেদার্থ বিচার করিয়া এ বিষয়ে স্বরূপোপদেশই করিয়া ছিলেন । আত্মা যেমন নিষ্ক্রিয় ও মুক্ত-স্বভাব, তিনি কোন কৰ্ম্মই করেন না, এবং প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত ; কেবল মায়া সন্নিধানস্থা হওয়াতে তাঁহাকে তদ-গুণে গুণবান দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্ক্রিয় স্বরূপ । কেবল দ্রৌপদী সন্নিহিত থাকায় তিনি পাণ্ডবার্থ বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন । ফলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বোপকরণ সামর্থ্য রহিত । কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন ।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে । কেন না, বৃক্ষবৎ দেহেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে ; তজ্জন্যই “দ্বা স্থপর্ণা” ইত্যাদি উপরি উক্ত শ্রুতিবাক্যে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে ধৰ্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । ভীম তাহার স্কন্ধ ও অৰ্জ্জুন তাহার শাখা স্বরূপ । অর্থাৎ স্কন্ধ যেমন বৃক্ষাবয়বের ধারক, ভীম শব্দের লক্ষ্য অর্থ বায়ু সেইরূপ সমস্ত দেহের ধারক । শাখা পদে বিস্তার, বিস্তার আকাশ ভিন্ন অন্য নহে । একারণ অৰ্জ্জুন শব্দের লক্ষ্য অর্থ আকাশ দেহের বিস্তৃতি স্বরূপ । পুষ্প ও ফল পদে রূপ ও রস । পুষ্পের সুদৃশ্যতা প্রযুক্ত সহদেবের মৌকুমার্য্য কল্পিত হইয়াছে । ফলের রস জলীয়াংশ তৃপ্তিকারক, একারণ তৃপ্তিকারক নকুলকে ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন । যেমন শরী-

রের সমস্ত অবয়ব জলপ্রিয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুল প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবসখা রূপ মন্ত্রণা দান দ্বারা যুধিষ্ঠিররূপ বৃষ্ণের মূল স্বরূপ ; তৎ সত্তাতেই পাণ্ডব-গণ সচেতন হইয়া আপন আপন সাধনীয় কৰ্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। আবার ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণরূপে তিনিই ধৰ্ম্মরূপে মহাবৃষ্ণের মূল হইয়াছেন। যেমন জ্ঞান প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী পরমাত্মা শরীররূপে বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজ-কৰ্ম নিষ্পন্ন স্বাচ্ছন্দ্য ফল আপনি ভোগ না করিয়া জীবাত্মাকে ভোগ করান, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ভারতের যুদ্ধাদিরূপ কৰ্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন যে রাজ্যরূপ স্বাচ্ছন্দ্য ফল, তাহা আপনি ভোগ না করিয়া অর্জুনাদিকেই ভোগ করিতে দিয়া ছিলেন। এই তাৎপর্য্যই যুক্তিসিদ্ধ, এবং শাস্ত্র-সিদ্ধ; “যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো” ইত্যাদি শ্রাব্য মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত অর্থ। শ্রাদ্ধকালে এই বেদার্থযুক্ত মন্ত্র সকল পাঠদ্বারা বেদমন্ত্র পাঠেরই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় ; তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

---

সপ্তমাধ্যায় ।

কাশীক্ষেত্রের মৰ্ম্ম ।

—oo—

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ মধ্যে কাশী অতি পবিত্র স্থান। এই স্থান প্রাপণজন্য ভারত-ভূমির সকল ভাগের বাবতীয় হিন্দুবর্গই ঐকান্তিক কামনা করিয়া থাকেন, এবং সচরাচর

নকল লোকেই চরমকালে ঐ কাশীধামে বাস এবং অনন্য-মনাঃ হইয়া ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন। শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে যে, মুক্তিধাম কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়। অর্থাৎ মনুষ্য সংসার-ক্ষেত্রে যে কোন দুষ্কৃতি ও পাপাচরণ করুক না কেন, এক কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ হইলে সে ব্যক্তি নির্দ্ব্যতকল্মষ হইয়া পরিমুক্ত হইতে পারে। মৃত্যুকালে কাশীর অধীশ্বর বিশ্বেশ্বর সকলের কর্ণে নিস্তার-বীজ-স্বরূপ তারক-ত্রক্ষ-মন্ত্র প্রদান করিয়া কীট, পতঙ্গ, মনুষ্যাদি কাশীস্থ জীবনিকরকে নিস্তার করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই সর্ব দিগ্দিগন্তরস্থ হিন্দুবর্গ ঐ স্থানে গমন, বাস ও পরিশেষে দেহত্যাগ করণের আকাঙ্ক্ষা করেন। এই কাশীক্ষেত্র কি ও তথাকার যে সমস্ত কার্য্য ও প্রণালী তৎসমস্তের নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বিশ্বেশ্বর কে এবং মণিকর্ণিকাই বা কি? যে অন্নপূর্ণা দেবী কাশীক্ষেত্রে বিরাজমানা, ঘাঁহার অনুকম্পায় এই স্থানের কোন জীবকে অনাহারে দিনযাপন করিতে হয় না, তিনিই বা কে? এই সমস্ত বৃত্তান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিবৃত করা আবশ্যিক। কারণ তাহাতে অনেকের মনে জ্ঞানের স্ফূর্তি ও আনন্দোৎপত্তি এবং পরিণামে ৩কাশীধামের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিবর পরমহংসের ব্যাখ্যা অনুসারে বারাণসীক্ষেত্রের মর্ম্ম পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হইতেছে।

দেবতাদিগের যাগ ভবনকে “ দেব-যজন ” বলে । এই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্র দেবযজন, প্রয়াগও দেবযজন, কাশীও দেবযজন বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । দেবযজন স্থান সকলই মুক্তিলাভের পরম্পরা কারণ । বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানই নির্বাণ মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ । কাশী প্রভৃতি মহা-তীর্থের বর্ণনা হইতে তত্ত্বজ্ঞান পক্ষে মানব শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ স্থান সকলকে তীর্থরূপে গণ্য করিতে হইবে । এরূপ জ্ঞানের নামই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান । যোগ নানাবিধ । বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরস্থ বস্তুর একযোগ করাকেই “ রাজযোগ ” বলে । সেই রাজযোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী । প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের দেহই ইন্দ্রিয়গণের আরাধনীয় স্থান, দেহেই আত্মার অবস্থান জন্য ইহার নাম ব্রহ্ম সদন । কিন্তু কাশীধামের ব্যাপার সকল রাজযোগ সাধনের অকৌশল সম্পন্ন সূচারু ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে ।

জ্ঞান ভূমির নাম অবিমুক্ত । অবিমুক্ত শব্দে যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই । বারাণসী-ক্ষেত্র প্রকৃত জ্ঞান ভূমি, তজ্জন্যই অবিমুক্ত শব্দের বাচ্য । ইহা ব্রহ্ম সদন ও ব্রহ্ম-ধাম । শাস্ত্রে সকলের দেহের শিরোভাগকে ব্রহ্ম সদন অর্থাৎ পরমাত্মার স্থান বলিয়াছেন । যখন জীবের প্রাণ সকল উৎক্রমমাণ হয়, অর্থাৎ প্রাণ অপান, সমান, উদান, বান, নাগ, কূর্ম্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ উর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্ম স্থান শিরোবস্থিত-অধোমুখ-সহস্র-দল-

কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মাভিমুখে গত হয়, তখন পরমাত্মা শিব তারক মন্ত্র প্রদান করেন। তাঁহারই প্রভাবে জীব সকল মুক্তিরূপ পরম পদকে লাভ করে। যদ্রূপ পরমাত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানী যোগী পরম হংসেরা জ্ঞান প্রভাবে প্রাণ সকলকে উর্দ্ধগামী করিয়া সমাধি যোগে তদ্বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাহিরে কাশীক্ষেত্রও যোগ-স্থান ব্রহ্ম সদন রূপে পরিগণিত। ইহাতে জ্ঞানীর কথা কি—শশক মশকাদি জন্তু মাত্রেও প্রাণত্যাগ করিয়া যোগী জনের অভিলষিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ কারণ যোগী পরমহংসেরা প্রাণান্তেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন না। চির কালই তারক মন্ত্রাভিনায়ে কাশীমূর্ত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে। তারক ব্রহ্মপদে “প্রণব” (তারয়তীতি, তারঃ। স্বার্থে কঃ) যেমন যোগী অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী জনগণ সর্বসাধনাবসানে প্রণবাবলম্বন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ কাশীধামে অগ্নায়াসে মৃত্যু মাত্রেই প্রণবাবলম্বন যোগ সম্পূর্ণ হয়। ফলিতার্থে প্রণবাবলম্বনই মোক্ষোপদেশ ; কাশীতে তাহাই লাভ হয় ; সুতরাং অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ঘটিত যে সকল কর্তব্যোপদেশ, তাহাই বাহ্যে কাশী-ক্ষেত্রে লভ্য হইয়াছে। অতএব কাশীবাস করিয়া কাশীর স্বরূপার্থ অবগত হইয়া অবিমুক্তোপাসনা করিলে জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মই হয়।

যেমন ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মা উপাস্য, সেইরূপ অবিমুক্তে

অবিমুক্তেশ্বর বিশ্বেশ্বর উপাস্য হয়েন। যেমন জীবের মস্তক ব্রহ্মধাম, সেইরূপ পুণ্যধাম ভারত ভূমির মস্তক স্বরূপ বারাণসীও ব্রহ্মধাম। স্বরূপার্থ তত্ত্বলক্ষণ-লক্ষিত কাশীক্ষেত্র সর্বশেষ ও নির্বিশেষ হয়। অপরন্তু নির্বিকার, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পরম ব্রহ্মেব স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞান হওয়া অতি কঠিন। বিশেষতঃ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কষ্টাতিশয় প্রযুক্ত অনেকেই তাহা করিতে সক্ষম নহেন। ফলতঃ গুণবদ্বেহে নিগুণতার স্বরূপ জ্ঞানে চিত্তের অভিনিবেশ অনেকেরই অসাধ্য। একারণ জীবানুকম্পী ভগবান সাধকদিগের হিত-সাধনায় উপাসনা সিদ্ধার্থ প্রকৃত যোগ সাধনার উপকরণ স্বরূপ নাশী, বরুণা, গঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থে পরিবেষ্টিত সর্ব তত্ত্বময় অবিমুক্তক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বেশ্বররূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। এই বারাণসী মধ্যে যে স্থান কাশী তাহা তত্ত্বজ্ঞান পক্ষে জীবের নাসার উর্দ্ধ জ্রদল মধ্যে যে স্থানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি নাদশক্তি পরিবেষ্টিত পরমাত্মা বিন্দুতীর্থরূপে বিখ্যাত রহিয়াছেন, তাহার প্রতি-নিধি স্বরূপ। যেমন বিশ্বেশ্বরাদিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র, অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সুরসরিৎ ও তদ্বিপরীতভাগে বরুণা ও নাশী আদি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেইরূপ জ্রদল মধ্য স্থান দিক্‌ত্রয়ে ত্রিগুণা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ে বেষ্টিত। বারাণসীর মধ্যস্থিত ক্ষেত্র পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত; জ্রমধ্যে বিন্দু স্থানও পঞ্চ কোষাত্মক ভূত তন্মাত্র। কাশীপুরের অধিষ্ঠাতা

কালরাজ, ক্ষুদ্রলেও স্বাস প্রস্থাস রূপ সময় পরীক্ষক কাল-  
রাজ বিদ্যমান রহিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে বিঘ্নরাজ চুণ্ডি  
বিনায়কের স্থিতি, ক্ষুদ্রল মধ্যেও বিনায়ক রূপী বিঘ্নরাজ  
মনের স্থিতি হয়। কাশীতে যেমন তৃত্বার্থ চতুঃষষ্টি যোগি-  
নীর ঘাট আছে, সেইরূপ ক্ষুদ্রলের অধীনে জীবের তৃত্বার্থ  
চতুঃষষ্টি বৃষ্টি ঘাটরূপে পরিসংস্থিত হইয়াছে। অবিমুক্তে  
যেমন লোলারে কঁস্থান, ক্ষুদ্রল মধ্যেও শূন্যাবলম্বিত লোলরূপ  
নাদরূপী সূর্য্যের অবস্থিতি হয়। যথা,—

“নাদ চক্রে স্থিতঃ স্বর্ঘ্যো

বিন্দু চক্রে চ চক্ৰমা।”

কাশীতে যেমন ব্রহ্মনাল মণিকর্ণিকার স্থিতি, এখানেও  
চক্রস্থ পদ্মনাল-রূপা সুষুম্না ব্রহ্মপুর গামিনী হইয়াছেন।  
এজন্য তাঁহাকে ব্রহ্মনাল বলিয়া উক্ত করেন। পরাশক্তি  
যেমন ~~চক্র~~ গুলাকার মহামণি স্বরূপ বিন্দু সরোবররূপে ক্ষুদ্রলে  
সংস্থাপিত আছেন, কাশী ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভবানী অন্নপূর্ণা  
রূপে অধিবাস করিতেছেন।

ক্ষুদ্রল মধ্যে ভবশক্তি অর্থাৎ জীবের উৎপাদিকা ও ভোগ  
প্রদায়িনী শক্তি অবস্থিতা আছেন, ( ভূ ধাতু সত্বাতে বর্তে।  
অতএব ভব শব্দে উৎপত্তি,—আনী শব্দে প্রত্যয়  
জনিকা শক্তি, ইহাতেই অন্নপূর্ণার নাম ভবানী হইয়াছে )  
সকল দেবতাই কাশীতে অধিবাস করিয়াছেন, ক্ষুদ্রলেও  
প্রাণ বায়ুর সত্বাকে আশ্রয় করিয়া সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব অধি-



কারে অবস্থিতি করিয়া থাকে। অতএব অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের পরিজ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ কি।

কাশী ক্ষেত্রে যেমন বরণা ও নাশী নদীদ্বয় রূপে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ আদল মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় বরণা ও নাশী এই নদীদ্বয় রূপে অবস্থিতা আছেন। তথাহি, “বারয়তীতি বরণা”, “নাশয়তীতি নাশী”; ইড়াতে প্রাণ বায়ুর পূরক রূপ অবগাহনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত মলের বারণ হয়, পিঙ্গলাতে প্রাণ বায়ুর রেচনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, হস্ত, পদ, উপস্থ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, শ্রবক, নাসিকাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত জন্মান্তরীয় পাতকের নাশ হয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রেও বরণাতে অবগাহন মাত্রেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-কৃত পাপের অপহরণ হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্ম ইন্দ্রিয় সংযম করিলে যে ফল লাভ হয়, বরণার বারি-স্পর্শ মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই ফলের সম্যক লাভ হইয়া থাকে। নাশীতে অবগাহন মাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

এতন্নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্তিনী কাশীকে পতিত পাবনী গঙ্গা দেবী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং পরমপদ প্রদায়িনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়া উত্তরায়ণ দেবায়ানকে প্রদর্শন করিতেছেন; অর্থাৎ যোগী জনেরা পিঙ্গলা দ্বারে আদিত্যে প্রবেশ করিয়া যোগ প্রভাবে যে পরম পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কাশীতেও ব্যক্তি মাত্রেই

বিশ্বেশ্বরের অনুকম্পায় সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। যেমন তত্ত্ব জ্ঞানাবলম্বীর যাগ-যজ্ঞ-সম্ভ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্ম করা ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ না করিলেও হয়, করিলে মঙ্গল ব্যতীত ক্ষতি নাই; কাশীধাম বাসেও সেই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রে অসী-বরণাতে গঙ্গাস্তম্ভঃ-সংমিলন রূপ তৎসম্বন্ধে সম্ভ্যা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে অবগাহন, তাহার নাম ব্রহ্ম সম্ভ্যা। ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসম্ভোপাসনা কালীন আপো মার্জ্জুন মন্ত্রার্থে এবং আচমন মন্ত্রার্থের সহিত ঐক্য করিলেই বারাণসীর এই মহিমা প্রকৃত রূপে উপলব্ধি হইতে পারে। অধ্যাত্ম যোগে যোগিগণ স্বশরীরে যে সকল তীর্থের কল্পনাতে ত্রিবিধ পাপক্ষালন করিয়া থাকেন, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রত্যক্ষীভূত অর্থাৎ ভগবৎ কর্তৃক চির প্রকল্পিত রহিয়াছে। এখানে বারাণসী গঙ্গায় স্নান করিলে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম সকল সম্যক সম্পাদন করা যায়। আয়াস সাধ্য বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করিবার অপেক্ষা থাকে না। এবিধায় চণ্ডাল, শ্বেচ্ছ, পুষ্কল, যবন, কিরাতি নীচ জাতি এবং স্ত্রী শূদ্রাদি—যাহাদিগের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই, তাহাদিগের একমাত্র কাশী বাসেই বেদাধ্যয়ন, বেদানুষ্ঠান ও তদর্থ-ধারণার সম্যক ফল লাভ প্রকল্পিত হইয়াছে। যেমন পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান সর্ব জীবের মোক্ষের কারণ, তদ্রূপ কাশীবাসও সর্ব জাতির মোক্ষের কারণ হয়। বেদোদিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারীর ভেদ

ও বিচার আছে, স্থলভোপায়ীভূত বারাণসী ক্ষেত্রে মোক্ষ-পদ প্রাপ্তি বিষয়ে কোন জাতির ইতরবিশেষ নাই; স্ত্রী পুরুষাদি কোন অধিকারীর বিচার নাই। কোন মন্ত্র পাঠের বা কোন কন্ঠের বিধি নাই, ধার্মিক বা অধার্মিকের এবং পণ্ডিত ও মূর্খের মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ে প্রভেদ নাই। যে কেহ যে কোন রূপে কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করেন; একারণ সৰ্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন—

“যেষাং ঋপি গতির্নাস্তি

তেষাং বারাণসী গতিঃ ।”

যে সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচার-ভ্রষ্ট, অধম ব্যক্তির এক কাশীই পরমা গতি হয়েন।

“কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন-জননী ব্যাপিনী জ্ঞান-গঙ্গা,

ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজ গুরুচরণং ধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগঃ

বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ স্বাক্ষীভূতাত্তরায়া,

দেহং সৰ্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যং কিমস্তি ॥”

বিশ্বেশ্বর অবিমুক্তেশ্বর। বিশ্বপদে ব্রহ্মাণ্ড; পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য বিধানে নরদেহকে ব্রহ্মাণ্ড বলে; সেই মনুষ্য-দেহের ঈশ্বর আত্মা; স্তূতরাং আত্মাই সকলের নিয়ন্তা হয়েন। পরমাত্মা সৰ্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রযুক্ত বিশ্বেশ্বর রূপে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইহাই কাশীক্ষেত্রের মন্ত্র; ইহাই বারাণসী ধামের নিগূঢ় তাৎপর্য। ইহার সহিত

মনুষ্য শরীরের তত্ত্বাবলীর কিছু মাত্র বিভিন্নতা বা অনৈক্য নাই এবং এই নিমিত্তই সর্ব দেশীয় সর্ব প্রকার মনুষ্য ও মুনি, ঋষি, যোগী, সন্ন্যাসী ও পরমহংসগণ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে একে এত প্রেম ও এত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং তথায় দেহোপরতি করিয়া অমরণ-ধর্ম-রূপ মুক্তিপদ লাভের বাসনা করেন। ইহাতে সন্দেহ করা অজ্ঞের কার্য্য।

যে বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রজ্ঞা-চক্ষু-হীন মূর্খ ব্যতীত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সংশয় কোন ক্রমেই হইতে পারে না; কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে বর্তমান সময়ে পবিত্র ভারতবর্ষের যেরূপ দুর্বস্থা এবং মায়া মোহা-কুষ্ট জন সকলের চিত্ত দিন দিন যেরূপ ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইতেছে, শত শত শাস্ত্র সত্ত্বেও ঐ সকল ব্যক্তি আপন আপন কুযুক্তি দ্বারা যেরূপ ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অনুধ্যান শীল ব্যক্তির হৃদয় একান্ত ব্যথিত হয়। যদিও হিতোপদেশ জনক অনেক শাস্ত্র বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে অন্ধবৎ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন উপকার দর্শিতে পারে না।

“যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা,  
শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।  
লোচনাভ্যাং বিহীনানাং  
দর্পণে কিং প্রয়োজনম্॥”

যাহার স্বয়ং প্রজ্ঞা অর্থাৎ ধর্মোৎপাদিনী শোভনা বুদ্ধি

না থাকে, তাহার শুদ্ধ শাস্ত্রে কি করিতে পারে? যে হেতু চক্ষুহীন ব্যক্তির দর্পণে কি প্রয়োজন?

অপরন্তু লোক-চক্ষু বলিয়া সূর্যের যে নাম, সেই নাম-  
গুণে, তিনি জগৎকে প্রকাশ করেন; কিন্তু গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন  
অন্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই জগৎ-প্রকাশক সূর্যের গৌরব কি?  
অবুদ্ধি সত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যাহার  
বুদ্ধি শাস্ত্রানুগামিনী, শাস্ত্রও তাহার বুদ্ধির অনুগত হয়।  
যাহাদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কেবল লৌকিক যুক্তির  
প্রতি নিতান্ত নির্ভর, তাহাদিগের দ্বারা পরিশুদ্ধ শাস্ত্রের  
মর্ম্ম কদাপি উদ্ভাবিত হইতে পারে না। যাহারা শাস্ত্র-  
সিদ্ধ পরমেশ্বরের পরম তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ্য না করে, শুদ্ধ  
যথেষ্টাচার ও কদর্য ব্যবহারাদির কর্তব্যতা প্রতিপন্ন করিতে  
প্রয়াস পায়, সেই সকল বাচাল পুরুষেরাই পূর্বতন শাস্ত্র-  
বক্তা মহর্ষিগণের বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করিয়া  
থাকে।

অষ্টমাধ্যায়।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মর্ম্ম।

প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে অনেকেই রথ যাত্রার উপলক্ষে  
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।

তথায় দারুণময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্বতা লাভ স্বীকার করেন এবং শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে “জগন্নাথ-মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” ।

ইহাতে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, কাষ্ঠাদি নির্মিতা কুৎসিতাকারা প্রতিমা দর্শনে মুক্তিলাভ কি রূপে সম্ভব হয় ? এই সংশয় নিবারণ জন্য পূর্বোল্লিখিত পরমারাধ্য পরম হংসের কৃত জগন্নাথ মূর্তির ও জগন্নাথ ক্ষেত্রের মন্ম ব্যাখ্যা করা হইতেছে ।

এরূপ ইতিহাস আছে যে, পূর্বকালে ইন্দ্রহ্যম্ন নামা ভূপতি অতি ধার্মিক, ও পরমাত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-বিশিষ্ট ছিলেন । তিনি বশিষ্ঠোপদেশে সর্বজন-হিতার্থ তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণে লক্ষিত দারু নির্মিত জগন্নাথ মূর্তি অর্থাৎ কল্পিত ব্রহ্ম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন । ঐ মূর্তি দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ চিত্তে স্বরূপলক্ষণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে যে ব্যক্তি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করে, অসংশয়ে তাহার মোক্ষলাভ হয় । রাজাধিরাজ ইন্দ্রহ্যম্ন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতিতে উৎপন্ন । অবন্তী নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল । মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ দেওয়াতে, সেই জ্ঞান প্রভাবে, সংসারাসক্ত জনগণের প্রতি তাঁহার কারুণ্য উপস্থিত হয় ; অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানভাবে অহরহঃ জাম্যমাণ জীবগণ সংসারে যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তাহাদিগের নিষ্কৃতি জন্য তিনি

সমুদ্র কূলে এই স্থানা দারুময় ব্রহ্ম মূর্তির সংস্থাপনা করেন।  
 শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে সকলেই কৃতার্থ  
 হইয়া থাকেন। ঐ পুরুষোত্তম মূর্তি স্থাপন দ্বারা মহারাজ ইন্দ্র-  
 চান্দ্র শুদ্ধ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপোপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণভাবে অনিপুণ অদান্ত ভ্রান্ত পুরু-  
 ষেরা এই ব্যাপারকে সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ  
 সমুদায় বৈদিক ধর্ম্মী লোকে চিরকালই জগৎস্রুর দর্শন লাল-  
 সায় শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, জাতি বিচারের প্রতি দৃষ্টি  
 পাত না করিয়া, সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও সকলেই সকলের  
 সহিত একত্র মিলিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন।  
 অন্ততঃ ইহাতেও বোধ করিতে হইবে, যে পূর্ব্বজাত মহর্ষি-  
 গণ যখন এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই  
 ইহার কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে।

আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনগণ হইতে তাঁহারা যে উচ্চতর  
 জ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষি বেদব্যাস  
 হইতে কেহই অধিক তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। অচিন্ত্যকল্প চারিবেদ  
 যাঁহার লেখনী হইতে সমুদ্ভূত, অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানাত্মক  
 বেদান্ত শাস্ত্র যাঁহার সৃষ্ট পদার্থ, ভারতাদি ইতিহাস এবং  
 পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থ সকল যাঁহার সহজ বস্তুত্ব, উপনিষৎ  
 প্রণেতা ঋষিগণ যাঁহার শিষ্য, সেই বেদব্যাস যখন  
 স্কন্ধ পুরাণে উৎকল খণ্ডে ও ব্রহ্ম পুরাণে জগন্নাথ দেবের  
 মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ মূর্তি যে পরমাত্মার

স্বরূপ তত্ত্বোপদেশক তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।

মহারাজ ইন্দ্রহ্যন্ম শ্রীমূর্তি প্রকাশের পূর্বে তথায় একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাহাতেই উপদেশ করা হইয়াছে যে, যিনি যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যথা “কষায়ৈকমর্থো পক্ষে ততোজ্ঞানমিতি স্মৃতিঃ”। কষায় কৰ্ম্মবারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বুদ্ধির পরিপাক জন্মে; সেই পরিপক বুদ্ধিতে তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়।

কিন্তু অপক বুদ্ধিতে প্রণবরূপী জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলেও জীব পরিমুক্ত হইবে; “সংসার বিষয়ে ঘোর পুনর্ঘটনা লিপ্যতে”—ঘোর সংসার বিষয়ে জীব যদি পুনর্ব্বার লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ জগন্নাথ মূর্তি দর্শনানন্তর যদি আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তবে দর্শন মাত্রেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। প্রকৃতার্থে শ্রীমজ্জগন্নাথ দেব স্নানোৎসব প্রণবমূর্তি। যিনি প্রণব, তিনিই পরব্রহ্ম হয়েন।

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট জীব সর্বদা পবিত্র হয়। শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন যে “পরমাত্ম তত্ত্বে জ্ঞাতে সর্ব্বৈ পবিত্রা ভবন্তীতি। তত্র ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র-সঙ্কর-চণ্ডালান্ত্যজাদিবিচারণা কার্য্যা”।

পরমাত্মত্ব জ্ঞাত হইলে জীব সর্বদা পবিত্র হয়। সেখানে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর ~~এবং চণ্ডাল~~ অন্ত্যজাদি জাতির কিছু মাত্র বিচার নাই। এই সমস্ত তত্ত্বের পরিজ্ঞানার্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রসাদ ভোজনে



কোন জাতির বিচার নাই; অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে কেহই অপবিত্র থাকে না। শুদ্ধ আত্মাই পরম পবিত্রতার কারণ, ইহা শ্রুতি শাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন। যথা মৈত্রেয় উপনিষৎ।

”অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোতিযো ভবতি। অনুপনীত উপনীতো ভবতি। সোহগ্নিপূতো ভবতি। স বায়ুপূতো ভবতি। স সূর্য্যপূতো ভবতি। স সোমপূতো ভবতি। স সত্যপূতো ভবতি। স সর্কৈর্কৈদৈ বর্হধ্যাতো ভবতি। সর্কেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি। তেন সর্কৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি। গায়ত্রী ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তাণি ভবন্তি। ইত্যাহ ভগবান্ হিরণ্যগর্ত্তো জাপ্যোনামৃততত্ত্বং গচ্ছতীতি।

প্রণবাবলম্বী ব্যক্তি অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয়, অনুপনীত হইলেও উপনীত হয়; সে সর্বদা পবিত্র, অগ্নিপূত, বায়ুপূত, সূর্য্যপূত, চন্দ্রপূত এবং সত্যপূত হয়। তাহাকে সকল দেবতাই জানেন, অথবা সে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি জ্ঞাত হয়। সে সমস্ত বেদাধ্যয়নের এবং সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্ব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ষষ্টি সহস্র গায়ত্রী জপের ফল পায়। ইহা ভগবান্ বেদাচার্য্য হিরণ্যগর্ত্ত কহেন। এতৎ শ্রুতি পাঠে অমৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

প্রণবাবলম্বনের যে ফল, তদনুরূপ শ্রীক্ষেত্র গমনের ও জগন্নাথ দর্শনেরও ফল দৃষ্টি গোচর হইতেছে। তথায় কোন জাতির বিচার নাই, কোন নিয়মের অনুষ্ঠান নাই, একাদশ্যাদি কোন ব্রতের আবশ্যিকতা নাই অথচ তথায় সকলেই সম্যক্

প্রকারে পবিত্র বলিয়া বিচরণ করেন ; সকলেই দেববৎ আচারী । তথায় বিধি-মন্ত্র-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান নাই, অথচ সেই স্থান পবিত্ররূপে সকলের গ্রাহ্য । স্ততরাং প্রণবাবলম্বন জন্য যে ফল, শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও সেইরূপ ফল ; অতএব জগন্নাথ দেব যে প্রণবরূপী পরমাত্মা, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এক্ষণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইতেছে । শাস্ত্রে জীবের দেহকে পুরী শব্দে উক্ত করেন ; তাহাতে অধিষ্ঠান জন্য জীবাত্মাকে পুরুষ, আর পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা যায় । ( পুরীষু শেতে যঃ সঃ পুরুষ ইতি ) \* পুরীতে যিনি শয়ন করেন, তাঁহার নাম পুরুষ । বৃহদারণ্যকে শ্রুতিতেও আত্মাকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । সর্ব জীবের শরীরে অধিষ্ঠান জন্য পুরুষ পরমাত্মা । শরীর মধ্যস্থ সমস্ত-স্থান-ব্যাপী আত্মা যদিও প্রণবাকার, তথাপি শরীরোপান্তে ক্রমধ্যে দ্বিদল পদ্মের উপরিভাগে নাদ-বিন্দুরূপে প্রণবাকারে তাঁহার বিশেষ স্থিতি হয় । জন্ম-রূপ অনুভূতি সমুদ্র পার্শ্বে সাদৃশ্যে সাধকগণ সমস্ত উপসর্গ শেষে প্রণবাবলম্বন করেন । কেননা, জীব-নিস্তারণ জন্য প্রণবরূপ আত্মা জন্ম-জলধি-কূলেই নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন । প্রণবাকার ব্যক্তির ভব-মাগরের তরঙ্গ সর্বদাই দৃষ্টিগোচর হয় ।

---

\* ব্যাকরণ বিশেষ দ্বারা এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে ।

পুরুষদিগকে এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাপনার্থ জলধি বুলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রণবাকার মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই হেতুই ক্ষেত্রের নাম পুরী ও তথায় অধিষ্ঠান জন্য জগন্নাথ দেবকে পুরুষোত্তম বলে। স্ততরাং অধ্যাত্ম তত্ত্বের সহিত পুরী ও পুরুষোত্তমে ভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ত্রিলোক মণ্ডিত-ব্রহ্মাণ্ডকে পুরী বলে। তন্মধ্যে সর্ব-কারণ পরমাত্মা প্রসুপ্তবৎ থাকেন। একারণ, তাঁহার নাম পুরুষ। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ প্রযুক্ত জীবের অন্তরাত্মা পুরুষরূপে ব্যাখ্যাত হন। বাহ্য লক্ষণে এই উপদেশের নিমিত্তই সমুদ্র-কূলে পুরী ও পুরুষোত্তম জগন্নাথ মূর্তির অবস্থান হইয়াছে। স্ততরাং এরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু দর্শন। জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পরিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রণবাবলম্বনের ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। পুরাণে এই তত্ত্বই উক্ত হইয়াছে; যথা—“জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।” জগন্নাথ দেবের শ্রীমুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

যেমন প্রণবাবলম্বী ব্যক্তি যদি পুনর্ব্বার দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত না হয়, তবে তাহার পুনর্জন্ম নাই; সেইরূপ পুরুষোত্তম দর্শনেও সাক্ষাৎ মুক্তি। কিন্তু “সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে,” যদি সংসার ধর্ম্মে পুনর্লিপ্ত না হয়, তবেই জগন্নাথ দর্শনে পরিমুক্ত হইতে পারে।

যেমন প্রণবাবলম্বন জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন প্রযুক্ত প্রাণায়াম দ্বারা মূলস্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে

হয়, অর্থাৎ অগ্রেই কুণ্ডলিনী শক্তির উপাসনাদি করিতে হয়, যে হেতু তিনি প্রসন্না হইয়া জাগৃত হইলে, তবে প্রণবাধারে জীবের আজ্ঞাপুরে গতি হইতে পারে, নচেৎ হয় না ; সেই রূপ পুরী মধ্যে কুণ্ডলিনী-রূপা বিমলা-দেবী বিরাজমানা । তৎপ্রসন্নতা ব্যতীত পুরুষোত্তম দর্শন হয় না । এ কারণ জগন্নাথ মূর্তি দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্র যাত্রাকারী মনুজগণ অগ্রেই বিমলা দেবীর পূজোপকরণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায় । জগন্নাথ ক্ষেত্রে সমুদ্র-কল্লোল ধ্বনি শ্রবণ নিবারণার্থ পুরী মধ্যে পবনাত্মজ আপন “ শ্রুতি ” উচ্চ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেই প্রাণায়াম যোগের বল প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ শ্রুতি শিরোভাগ প্রণবাত্মা-প্রাপণেচ্ছায় বেদ ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা প্রাণ বায়ুকে সংযম করিলে আর মহোন্নি-মালী সংসার-সাগরের তরঙ্গ-কল্লোল-ধ্বনি সাধকের শ্রুতি-কুইরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না । সর্বত্রই লক্ষ্মী নারায়ণ একত্রাবস্থান করেন । কিন্তু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লক্ষ্মী দেবীর সহিত জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে অবস্থান নাই । তাহারও এই অভিপ্রায় যে প্রণবাবলম্বী সাধকের ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না । যে হেতু পরমাত্মা ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মে কদাপি লিপ্ত নহেন । শ্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয় বট বৃক্ষের অবস্থিতি, তাহাতে ইহাই জানাইয়াছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ড বটরূপী ; ইহার নিত্যত্ব সিদ্ধি আছে । অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড কখন প্রকটিত, কখন বা অপ্রকটিত হইয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডাখ্য-বট-শাখা-

বলস্বী আত্মা নিরন্তর কারণ স্বরূপ জলে প্রসুপ্ত থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়-সলিলে ভাসমান মার্কেণ্ডেয় কর্তৃক আত্মাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়া-মোহিত মহর্ষি ভগবান্ মার্কেণ্ডেয় প্রলয়ে একাৰ্গবে ভাসমান হইয়া বটদলে পরমাত্মাকে শয়িত দেখিয়া তম্বিকটে অভিগমন করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় জন্য তথায় স্থান না পাইয়া ভগবৎ-শরীরে প্রবিষ্ট ঋষি কর্তৃক তদভ্যন্তরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকিত হয়। পুনর্বারো নিক্রান্ত হইয়া মহর্ষি সমস্ত বিশ্বকে জলময় দেখেন। ভূয়ঃ প্রবেশে তাঁহার উদর মধ্যে বিভাসমান বিশ্ব অবলোকন করেন। অতএব বিশ্বের ও বিশ্বকর্তার নিত্যত্বই সিদ্ধ আছে; অর্থাৎ আত্মাই সকল ও আত্মাতেই সকল। শুদ্ধ মায়া-বিলসিত বিশ্বরাজ্য পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কেণ্ডেয় সরোবর এবং শ্বেত গঙ্গাদি যে ষট্ তীর্থ পুরী-সন্নিহিত আছে, তাহাতে নানা প্রকার বৈদিক কৰ্ম্ম করিতে হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণবাবলম্বন হেতু ঞ্জ্যোত্তম ষড়ঙ্গযোগে সিদ্ধ হইতে না পারিলে পরতত্ত্ব দর্শন হয় না। - সেই উপদেশ দিবার নিমিত্ত এই স্থলে আঠার নালা পার হইবার বিধি হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ আঠার নালা পুরুষোত্তম দর্শন পথে প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্ম-তত্ত্বের মহা বিঘ্ন বোধে

পুত্রাদিকে ঐ অষ্টাদশ স্থলে যুক্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন। অতএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু হইবেন, তাঁহারা অসংশয়ে অপত্যদিগের মোহ পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা তাৎপথে অবস্থিতি করিবার যোগ্য হইবেন না।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, জগন্নাথ দেবকে প্রণবাকার গ্রহণ করিতে পূর্বোক্ত তত্ত্বোপদেশ-সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু আষাঢ় মাসে যে রথযাত্রা হয়, তাহার বিশেষ তাৎপর্য কি? পুরাণে বর্ণিত আছে যে, “রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।” রথস্থ বামন অর্থাৎ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ইহা অতু্যক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ পুরাণ বচনে “বামন” শব্দের উল্লেখ আছে, ইহারই বা তাৎপর্য কি? রথস্থ জগন্নাথের দর্শনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কি?

এই সকল সংশয়ের মীমাংসা এই যে, মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনার অভাবে ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপাবলোকন হয় না। প্রথমতঃ ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, যে বিষয় অল্প-বুদ্ধি জনের বুদ্ধিতে অলীক বোধ হয়, তাহা যে বিশিষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন জনের চিত্তে অলীক বোধ হইবে না, এরূপ হইতে পারে না। জগন্নাথ দেব দারুণময় বিগ্রহ, তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিলে যে মোক্ষ হয়, একথা সহজেই অলীক বাদ বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব এরূপ ব্যবস্থার অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। যে পর্য্যন্ত সেই স্বরূপ কারণ বোধ বুদ্ধিতে স্ফূর্তি না হইবে, সে

পর্যাস্ত ইহাতে সর্বদাই সশয় থাকিবে। বলতঃ শাস্ত্র  
বচনে কেবল “রথস্থং বামনঃ দৃষ্টা।” এই কথাই কেন নাই,  
বচনে আরও বিশেষ আছে। যথা—

“দোলারাং দোলগোবিন্দং মধুস্থং মধুসূদনং ।

রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥”

দোলাতে গোবিন্দকে, মঞ্চোপরি মধুসূদনকে, আর রথোপরি  
বামনকে দর্শন করিলে, ইহ সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না।

ইহা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।  
বিস্তৃতরূপে তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

উল্লিখিত বচনের অর্থে জগদ্বন্ধু বা জগন্নাথ শব্দের উল্লেখ  
নাই; কেবল গোবিন্দ, মধুসূদন ও বামন, এই নামত্রয় উক্ত  
হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এক শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-  
ত্রয় উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য  
নাম বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে বিশেষ করিয়া এই তিন নামেরই  
উল্লেখ হইল কেন? অতএব অবশ্যই এতদ্বিষয়ের কোন  
গূঢ় কারণ আছে। বস্তুতঃ গোবিন্দ, মধুসূদন ও বামন  
এই তিন নামই ব্রহ্ম-বিশেষণ, ইহার একমাত্র বিশেষ্য সেই  
পরমাত্মাই হন। যথা তৈত্তিরিয় শ্রুতিঃ ।

ও তৎসং ইতি মহাবাক্য বিবেকঃ ।

সত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্মেত্যাদি ॥

আত্মা, জীব ও মনঃ এই তিনই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,  
জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ও অপরিমিত। এস্থলে বামন বিশেষণে এক

অনন্ত বিশেষ্য, মধুসূদন বিশেষণে এক সত্য বিশেষ্য, গোবিন্দ বিশেষণে এক জ্ঞান বিশেষ্য উপলব্ধি করিতে হইবে। “গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ” এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা গোবিন্দ নামার্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালাদি ভুবনত্রয়কে বুঝায়। গোবিন্দ ত্রিলোক-ব্যাপী ; সুতরাং গোবিন্দ শব্দে সর্ব ব্যাপক জ্ঞান-লক্ষ্য পদার্থ হইতেছে। কিন্তু সংশয় রঙ্ঘুতে আবদ্ধবৎ জ্ঞান জীবহৃদয়ে আন্দোলায়মান হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণজ ব্যক্তি দোহুল্যমান সংসারের নাটকরূপে তাঁহাকে অনুদর্শন করিয়া অপুনর্ভব ধর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

এই উপদেশার্থে “দোলায়াং দোল গোবিন্দ মতি” বচন প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ প্রকৃত অধ্যাত্ম বোধ সকলের সাধ্য নহে; কিন্তু দোলস্থ গোবিন্দ সকলেরই দর্শন-সুভভ।

মধুসূদন বিশেষণে এক সত্যই বিশেষ্য হয়। যিনি অক্ষয় পুরুষ ও সকলের আদি, প্রাণী শাস্ত্র তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। “যঃ সদাস্তীতি কেবলমিতি” প্রলয়ে সকলই যায়, কেবল একমাত্র সত্য থাকেন, সেই সত্যই পরমাত্মা “মধুসূদনের” এক বিশেষ্য। “মধুং সূদয়তীতি” এই ব্যুৎপত্তিতে লৌকিকে মধু নামে অস্বরকে যিনি নষ্ট করিয়াছেন, তিনি মধুসূদন, এই অর্থ প্রতিপন্ন হয়। এ দিকে অধ্যাত্ম পক্ষে মধু নামে বিদ্যা বিশেষ্য। যিনি জীব-



রূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, যৎ প্রভাবে সম্ভূতির  
বিলয় হয়, সেই কার্য্য-ক্রমকে মধুসূদন বলিয়া উক্ত করা  
যায়। যথা বাজসনেয়ঃ—

“অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে।

ততোভূয়ঃ ইব ত তমো উ সম্ভূত্যাঃ রতাঃ ॥”

যে সকল ব্যক্তি সম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অসূর্য্য-  
রূপ অন্ধতমঃ প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ পরমালোক প্রাপ্ত হয় না ;  
পুনঃ পুনঃ জন্মমরণানুভব করে। এবং পুনঃ পুনঃ সম্ভূতি-  
তেই রত থাকে।

অধ্যাকৃত কায়-কর্ম্মাদির বীজাগ্নিকা প্রকৃতির নাম সম্ভূতি ,  
সুতরাং প্রকৃতি যুক্ত উপাসনাকে মধুর উপাসনা বলা যায় ;  
ইহাই মধু বিদ্যা। যাঁহার দর্শনে ইহার শান্তি হয়, তিনিই  
মত্য়। হৃদয় মধ্যে তাঁহার অবস্থান ; তিনি নিয়ত যোগাযুতে  
অভিষিক্ত হন, তাঁহাকেই মধুসূদন বলিয়া উক্ত করিয়া-  
ছেন। সেই হেতু এখানে মঞ্চোপরি পরমাত্মা জগন্নাথকে  
মধুসূদন বলিয়া স্নানিদ্ধ চন্দন বাসি দ্বারা জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসীতে  
স্নান করাইয়া সকলকে উপদেশ দিয়াছেন যে এই স্নান-যাত্রা  
দেখিয়া হৃদয় মঞ্চোপরি পরমাত্মা জগন্নাথকে অনুদর্শন করিলে  
অপুনর্ভব যে মোক্ষ, তাহা লাভ হয়।

যিনি বামন তিনি অনন্ত-বাচক! অর্থাৎ বামন বিশেষণে  
একমাত্র অনন্ত বিশেষ্য হয়েন। যিনি সর্ব্ব প্রবেশক, ত্রি-  
লোক-ব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহাকেই বামন বলা যায়। যিনি

কালরূপী—ত্রিপাদ-বিক্রমণস্থলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিবিধা কালের গতি দেখাইয়াছেন, আর ভূভুবঃ স্বঃ, অধাঃ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ও পৃথিবী এতৎ লোকত্রয় যে কালরূপীর পদদ্বারা আক্রান্ত, শাস্ত্রে সেই বামন পুরুষকে আত্মা বর্ণিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মপুরাণঃ ।

“এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে ।

তস্মাৎ সর্গৈঃ স্মৃতো বিষ্ণুবিষধাতুঃ প্রবেশনে ॥”

বিষ্ণু ধাতুর অর্থ প্রবেশন ; যিনি সর্বত্র প্রবেশ এবং যিনি স্থূল-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মাত্মক, তাহার নাম বিষ্ণু । বিষ্ণুপদে পরমাত্মা ; সেই পরমাত্মা বামন ; যে হেতু এই জগৎত্রয় বামন কর্তৃক আক্রান্ত দেখা যায় । আত্মাই জগৎ-ব্যাপ্ত ; এই নিমিত্ত বামনই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অনন্তবাচক হয়েন । কিঞ্চ

“বামনো ভূদবামনঃ ।”

অবামন অর্থাৎ অনন্তস্বরূপ ।

পরমাত্মা বামন হইয়াছিলেন । যে ব্যক্তি সেই বামনকে আত্মা শরীরস্থ দর্শন করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । এজন্য “রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।” এই বচন প্রয়োগ করিয়াছেন ।

অধ্যাত্ম তত্ত্ব কেবল জ্ঞান গম্য ; এই নিমিত্ত ভাবনা দ্বারা রথাত্ম শরীরস্থ আত্মাকে দর্শন করিতে হয় । তাহা সামান্য জীবে ঘটিতে পারে না ; এই হেতু রথস্থ জগন্নাথ দর্শনের বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ বাহ্য চক্ষুদ্বারা

( আনাত্ মাসে দ্বিতীয়াতে ) রথাক্রুত জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলে যোগীদিগের জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শনীয় পরমাত্মার দর্শন ক্রিয়ার অনুকরণ করা হইবে ।

মানব শরীর যে রথস্বরূপ, তাহার প্রমাণার্থ কঠোপনিষ-  
দের তৃতীয়া বল্লী, তৃতীয় শ্রুতি যথা—

আত্মানং রশ্মিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেব চ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হ্যানাহবিতাদি ।

( মনুষ্য দিগের ) এই শরীর রথ, আত্মাই এরথের রথী, বুদ্ধিই সারথি, মনই অশ্ব রজ্জ্ব হয় ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার অশ্ব । ইহারা শরীররূপ রথাকর্ষণে কুশল । রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয় রথের গতি । ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মা ভোক্তা পুরুষ । ইহাকে দর্শন করিলে গনীষিগণ মোক্ষপথে অধি-  
গমন করেন । স্ততরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দেহরূপ পুরীতে অবস্থিত আত্মারূপ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জন্ম হয় না ; পুরাণে গূঢ়রূপে ইহাই উক্ত হইয়াছে । পূর্বের পুরীশব্দে শরীর ব্যাখ্যা করা গিয়াছে ; এস্থলে বিশেষ-  
রূপে সেই শরীরকেই রথরূপে কল্পনা করিয়া পুনরুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

এক্ষণে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, যদি শরীররূপ রথই হয়, তবে সর্বদাই দর্শনের ব্যবস্থা না করিয়া আমাত্ মাসের দ্বিতীয়াতে রথবাত্রা কল্পনা করিবার তাৎপর্য কি ?

তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ় মাস মিথুন রাশি, একারণ আষাঢ়কে মিথুন বলে। মানব-শরীর প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিথুন দ্বারা উৎপন্ন হয় ; সুতরাং আষাঢ় মাসের উল্লেখ দ্বারা সঙ্কেতে শরীররূপ রথের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখে ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে মানব জীব পিতৃ-দেহে জাত হইয়া পশ্চাৎ মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়। এতাবত মিথুনক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন দেহে দ্বিতীয়বার সমুৎপন্ন আত্মাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহাই ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্কেতে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রার বিধি আছে।

জগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা মণ্ডপে অষ্টাহ গমন এবং তথা হইতে অষ্টাহানন্তর পুনরারম্ভ কেন হয়, তাহার মীমাংসা এই—

এই অষ্টাহ পদে অষ্টাঙ্গ যোগ। সাধক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষে গুণ্ডিচাখ্য অর্থাৎ পরমাণু-ভূত ব্রহ্মপথে অধিগমন করে। তাহাতেই জগন্নাথের রথ অষ্টাহ গুণ্ডিচা ভবনে থাকে। ইহা অধ্যাত্ম বিষয়ের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। পুনরারম্ভের তাৎপর্য অতি উপাদেয়। এই শরীরাত্ম্য রথে ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মনঃ রজ্জ্ব, বুদ্ধি সারথি, আত্মা রথী ; ঐ রথী বিদ্যা ও অবিদ্যা কল্লিত শরীর রূপ রথারোহণে মোক্ষপথে গমন করিয়া কারণ বিশেষে পুনরায় সংসার-পথেও পুনরারম্ভ হইতে

পারে ; ইহাই পরিজ্ঞাপিত হইয়াছে । যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম তত্ত্ব সংযোগে নিকাম যোগাভ্যাস করে, তাহার অষ্ট সংখ্যা যোগ পূর্ণ হইলেই অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সকাম যোগাকৃষ্ট-চেতাঃ হইয়া সাধনা করে, সে ব্যক্তি ভোগার্থ স্বর্গস্থানে গমন-পূর্বক অষ্ট বিভূতির অনুভব করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় । এই দৃষ্টান্তের জন্যই জগন্নাথ দেবের অষ্টাংগে গমন ও পুনঃ প্রত্যাগমন পরিদর্শিত হইয়াছে ।

পথিমধ্যে “খুদীমাসীর” ভবনে জগন্নাথ দেবের যে পৃথকাম ভোজনের বিধি আছে, তাহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এই ;—

অবিদ্যা প্রভব শরীরে জীব নানা বিষয় উপভোগ করিয়া পরম সুখে কালতিপাত করে, তখন মহামায়াকেই মাতা বলিয়া জানে । মোক্ষ-দায়িনী বিদ্যাকে তদ্ভগিনীরূপে বোধ হয় । বিদ্যা ও অবিদ্যা স্বভাবতঃ সহোদরা হন । জীবগণ যখন মোক্ষ-পাথের পান্থ হইয়া যোগ-পদবী অবলম্বন করে, তখন সহজেই অহংকারের সঙ্কোচ করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ববৎ বিশেষ ভোগ থাকে না । পরে যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদচক্র গমনকালে অবিদ্যার ভগিনী স্বরূপা “পরী বিদ্যা” দ্বাধকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্বক সহস্রাংগলিত রসমিশ্রিত সহস্রায়ুতরূপ পায়স ভোজন করান, তাহাতেই দেবের অমরণ-ধর্ম লাভ হয় । সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ

জগন্নাথ দেব পথপর্যটনে অক্টোবর মাসে খুদী মাসীর ভবনে পৃথক রস ভোজন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্ষেত্রমধ্যে মহামায়া বিমলা দেবীর নিকট ভোজন-পারিপাট্যের সীমা নাই; কিন্তু রথারূঢ় হইয়া পথগমনকালে শুদ্ধ চিপাঁটক মাত্র ভোগ্য হইয়া থাকে। গুণ্ডিচালয়ের বে পরম সুখকর ভোগ, তাহা নিরুত্তি-মার্গ-গামীরাই পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ যাহারা তথায় থাকে, তাহারা পায়। যাহারা প্রবৃত্তি-মার্গে সংসার-ভিষ্মুখে অভিগমন করে, তাহারা পায় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষ-সুখভোগ মুমুকুরই হইয়া থাকে, সংসার-রাগীর সে সুখলাভ হয় না।

পঞ্চকোষ-বিবেক-তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে যে সংবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এখানে হোরা পঞ্চমীতেই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, তাহার পর আর অধিকার নাই। অনন্তর জীবের আর কোন ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ থাকে না। ইহাই পঞ্চমীপূর্বে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। ঐ ত্রিতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথকে আনিবার নিমিত্ত লক্ষ্মীদেবী পুরুষোত্তমে যত্ন করিয়া বেড়ান; যৎকালে তাঁহাকে উত্তরগামী দেখেন, তখন কমলা দেবী বিমলার দ্বারে অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা মাগিয়া থাকেন; অর্থাৎ আমার আর কিছুই নাই, যাঁহার সদ্ভায় এই ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এতা-

বতা এই তত্ত্বোপদেশ হইতেছে যে, মোক্ষাভিলাষীর ঐশ্বর্যের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে প্রকারান্তরে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদানই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রথ যাত্রাদির তাৎপর্য্য। এই অভিপ্রায়েই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নতুবা পৃথিবীস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি একবাক্য হইয়া ইহাকে একরূপ মান্য করিবেন কেন? এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে, জগন্নাথ ক্ষেত্রের পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষ দাতৃত্ব বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। এবং জগন্নাথ, বলরাম, স্বদর্শন ও স্বভদ্রা, ইতি চতুষ্টয় প্রণবমাত্রা, আকার, উকার, মকার ও নাদ; ইহাতে কোন অনৈক্য নাই; সুতরাং প্রণব স্বরূপ পর ব্রহ্মের মূর্তি জগন্নাথকে সমুদ্র তীরে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি প্রণবরূপী মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া জগন্মোকে কৃতার্থ হইতেছে। অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন করাই ভব সমুদ্রের উপায়, প্রণবই শেষ মূর্তি, সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুই পরিণামে প্রণবে লয় পায়, কিন্তু প্রণব পর্য্যন্তই বিজ্ঞান বিষয় হয়। যথা গুণকশ্রুতিঃ।

“অত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো ঋগ্বেদঃ

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্ত ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

অথ পরা ময়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥’

সমুদ্র চতুর্বেদ, এ সমস্তই অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা-প্রভব; ইত্যর্থঃ শ্রুতি শিরঃ প্রণব পর্য্যন্ত ব্রহ্মমূর্তি কল্পিতা

হয় ; পরা বিদ্যা অনির্দেশ্যা, যদ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং প্রণবাবলম্বনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যৰ্থে শেষ উপাসনা, সেই প্রণবই সত্ত্ব ব্রহ্ম, তদুপাসনায় চীর্ণব্রত ব্যক্তি নিষ্ঠ-  
গতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয় । যথা মাণ্ডুক্য  
শ্রুতিঃ ।

“জাগরিতাবস্থা বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথম মাত্রা ।

সৰ্গান্ কামানাদিশি ভবতি ষ এবং বেদ ।”

জাগরিতাবস্থায় বৈশ্বানরাত্ম্য অনিরুদ্ধ অহংকার স্বরূপ  
অকার প্রণবের প্রথম মাত্রা, যদ্বারা সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় ।  
যিনি সৰ্ব্বাভিলাষ পূরণের আদি, যদবলম্বনে সকল কর্মে জীব  
প্রবৃত্ত হয়, যিনি এরূপ জানেন, তিনিই বেদবির ।

জাগরিতস্থানে বহিঃ পুঞ্জসপ্তাকএকোনবিংশতি সুখ ।

ব্রহ্মভূক্ত বৈশ্বানরঃ পৃথকঃ পাদঃ ॥ ১ ॥

জাগরিত স্থান বহিঃ প্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বীয় আত্মা ব্যতিরেকে  
অন্য বিষয়ে বুদ্ধির অভিনিবেশ, যাহাতে অবিদ্যাকৃত বিষয়ে  
বুদ্ধির আপ্রভাস ; সুতরাং তাহাকে বৈশ্বানর উক্ত করা যায় ;  
যে হেতু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহির্দৃষ্টি পৃথক্ পৃথক্ পথে পতিত  
হয় । প্রণবের প্রথম পাদ সেই আকার, আত্মবাহ প্রথম  
মাত্রা, অগ্নি সত্ত্ব বিহ্বা আহবনীয় গার্হপত্যাদিগণি সপ্তাক  
বিশিষ্ট বৈশ্বানর ; অকারণ অকারকে সপ্তাক কহেন, এবং  
একোনবিংশতি সুখ, যথা — পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,  
পঞ্চ প্রাণবায়ু, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, এই উনবিংশতি



মুখ, ইহাতে স্থূল দেহস্থ শব্দাদি বিষয় পরিগ্রহ হয়, স্ততরাং অকার প্রথমঃ পাদঃ। ইহাতে ভদ্রা দেবীই অকার স্বরূপা, স্থূল দেহাদির বিষয়েন্দ্রিয়-বোধ-স্বরূপা ; ইহার সপ্তাঙ্গ যথা— হস্ত পাদাদি শূন্য কেবল মুখ, নাসিকাঘ্রয়, শ্রোত্রঘ্রয় ও কর্ণঘ্রয় এই সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট, সংপ্রতি স্থখ স্বরূপ ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিয়ন্ত্রী, তন্নিমিত্ত স্তভদ্রার সহযোগে জাগরিতাবস্থায় জগন্মাধ মূর্তি লোকের দর্শন-যোগ্য হইয়াছেন।

“ স্বপ্নাবস্থায়ঃ মন তৈজস উকার দ্বিতীয়া মাত্রা

জ্ঞানসত্ত্বতিং সমানাশ্চ ভবতি। ”

স্বপ্নাবস্থায় মন উকার বর্ণ তেজঃস্বরূপ দ্বিতীয়া মাত্রা, জ্ঞান সংকুলাতিশয় সংকীর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট স্থূল দৃষ্টির অভাব হেতু অন্তদৃষ্টি বিশিষ্ট।

স্বপ্নস্থান তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাত্মকম্।

বোৎকর্ষতি বৈবজ্ঞান সত্ত্বতিং সমানাশ্চ ভবতি

নাস্যা বুদ্ধবিৎকূলে ভবতি বুদ্ধ ব এবশ্বেদ ॥

স্বপ্নাবস্থায় মন তৈজস অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ উকার মূর্তি দ্বিতীয়া মাত্রা, অন্তদৃষ্টি, তাহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোন কার্য নাই, স্ততরাং বাহ্য বিষয় অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কস্মই অন্তরে সম্পাদিত হয়, আহবনীয় অগ্নির অধিষ্ঠান হেতু শ্বাস প্রশ্বাসাদির পরিগ্রহণ আছে, গার্হপত্য অগ্নির সম্বন্ধ রহিত, কিন্তু অকারে তাহা আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি সকল অন্তরে কার্য্য করে, বাহ্যে প্রকাশ নাই ; অগ্নি সপ্তাঙ্গ ও ঊনবিংশতি

মুখ বাহিরে নাই ; অন্তরে উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থিত, বাহ্যে ভোগ বিলাসাদির অভাব, অন্তরে বাসনা মাত্র, এই প্রবিভক্ত বাহ্য ভোগ্য বস্তুর রসবোধক বলিয়া ভোক্তা বলা যায় ; বিষয় বোধ শূন্য কেবল প্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ মন আছে এই মাত্র উপলব্ধি জন্য বৈষয়িত্বে কল্পিত হন। ইহাতে উকার-রূপী স্তূদর্শন শ্রীক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন। ইনি তৈজস, যেহেতু সূর্য্যরূপে স্তূদর্শনের বর্ণনা নানা শাস্ত্রে আছে ; স্তূদর্শন যে মনোরূপ, তাহা ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুরূপ বর্ণনে কহিয়াছেন।

“ চলস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রেং স্তূদর্শন মিতি । ”

অত্যন্ত বেগবান্ মনোরূপ স্তূদর্শন চক্রে হয়।

অতএব শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে স্তূদর্শন মূর্ত্তি দারুভূত আছেন এইমাত্র ; তাহার মূর্ত্তি অপ্ৰকাশ শুদ্ধ লগুড়বৎ সংস্থিত, মনঃসংযোগ ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন হয় না। একারণ উকারাখ্যা তৈজস মনোদ্বারা শোভন মূর্ত্তির দর্শন হয়, অর্থাৎ যদ্বারা স্থখে দর্শন হয়, তাহার নাম স্তূদর্শন।

যত্র স্থপ্তো ন কখন কামঃ কাম্যতে ন কখন স্বপ্নঃ নশ্যতি ।

তৎ স্থবৃপ্তং স্থবৃপ্ত স্থানঃ পূজ্যে মকার তৃতীয়া মাত্রা ॥

স্থবৃপ্তাবস্থাতাহাকে বলি, যাহাতে কোন অভিলাষের অবস্থান নাই এবং কোন স্বপ্নাদিও দর্শন হয় না। স্থবৃপ্ত স্থান অতি সুখদ কেবল বুদ্ধির স্থিরতা মাত্র, মকাররূপ তৃতীয়া মাত্রা হয়।

স্থবৃপ্ত স্থান একীভূত পূজ্যান ঘন এবানন্দ যোগোহা।

নন্দভূক্চেতোমুখঃ পূজ্য তৃতীয়পাদঃ ॥

স্বৰূপে স্থান মকার তৃতীয়া মাত্রা, যে হেতু প্রণবের সমাপ্তি মাত্রা, তাহাতে সন্ধিযোগে আত্মাতে সমস্ত একীভূত হয়, অর্থাৎ অকার, উকার, মকার, এতদ্বর্ণত্রয় সন্ধিযোগে লয় প্রাপ্ত হইয়া এক বর্ণ মাত্র দৃষ্ট হয়। তাহাতে ভাব্য ভাবনার অভাবে আনন্দ মাত্রোদয় হয়, তন্নিম্ন অন্য কিছু মাত্র স্মরণ থাকে না। কেবল স্তম্ভ স্বরূপ চিত্ত মাত্র, তাহাতে আনন্দ মাত্রই ভোগ করা হয়, স্ততরাং জীবাত্মাও পরমাত্মার একীভূত অবস্থার নাম প্রণব, অর্থাৎ (ওঁ) তাহার উচ্চারণে যে যে পরমাত্মাতে একীভূত হওয়া যায়, তাহাতেই স্বযুগ্মাবস্থা বলে। তদবস্থায় নিয়তমনোরমণ করিতে থাকে, এজন্য তাঁহার নাম রামঃ। এবিষয়ে বলরামকেই মকাররূপী স্বযুগ্মাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল আনন্দময় মূর্তি, শুদ্ধ আনন্দ মাত্র ভোক্তা, তদদর্শনে আনন্দা-প্লুতচিত্তে প্রথমে মনুষ্যমাত্র আত্মবিস্মৃত হয়। যাহারা জগন্নাথ ক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমূর্তি দর্শন মাত্রেই বিশ্বয় সাগরে নিমগ্নচেতাঃ হন, অর্থাৎ তৎকালে আর আত্মগৃহ, ধন জনাদি কিছু মাত্রকে স্মরণ বা মনে থাকে না, সে কেবল সেই মকারাত্মক শ্রীবলরামের মহিমা।

অমাত্রোচত্বর্ধোদব্যবহার্য্যঃ প্রণবোদয়ঃ।

সিদ্ধোদ্যোতঃ। এব মোক্ষার আদ্যৈব সঃ বিশত্যাশ্রনা।

আনং য এবং বেদ ॥

তুরীয়াবস্থা অমাত্রা! অব্যবহার্য্যা, যাহাতে সমস্ত মায়ী

কার্যের উপশম, সেই মঙ্গল স্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ধন্যাত্মক প্রণবস্বরূপ আত্মা, আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন, যে এরূপ জানে সেই বেদবিৎ । এই অমাত্র তুরীয়াবস্থায় আত্মা জগন্নাথ, তাঁহাতে কোন মায়াই কার্য্য নাই, তিনি অজিত, অমৃত, পরম মঙ্গলরূপ অদ্বিতীয়, সৰ্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বাপুৰুষ রহিয়াছেন, এই জন্য প্রণবাকারে জগন্নাথের স্বরূপ রূপ দারুণত প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্বরূপ তত্ত্ব আত্মাতে অনুদর্শন করিলে জীবের অমরণ ধর্ম লাভ হয়, তাহার আর পুনরাবৃতি থাকে না ।

নবম অধ্যায় ।

তান্ত্রিক উপাসনার মর্ম

মানব জাতির প্রকৃতিগত স্বতঃসিদ্ধ বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ধর্ম্মা নুষ্ঠান-বিষয়ে অস্বদেশে অধিকারিতোদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনার প্রণালী ব্যবস্থিত ও প্রচলিত আছে । বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও

সমাধি এই পঞ্চবিধ যোগাঙ্গ দ্বারা, বৈষ্ণবগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ সাধনা দ্বারা, এবং শক্তি উপাসকগণ মধ্য, মাংস, মৎস্য, মূত্রা ও মৈথুন এই পঞ্চবিধ উপাসনা দ্বারা আপনাপন ইচ্ছা দেবতার আরাধনা ও স্বীয় অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বেদে অষ্টাঙ্গ যোগ, পুরাণে শাস্ত্রাদি ভাব, এবং তন্মধ্যে মদ্যাদি পঞ্চ তত্ত্বকে পরমার্থ জ্ঞানের একমাত্র উপায় রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞাতে ঐ ঐ উপায় অবলম্বন না করিলে ইচ্ছা সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এতদ্দেশে এই ভিন্ন ভিন্ন পান্থগণ আপনাদিগকে এক মতাবলম্বী জ্ঞান না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিপরীতাচারী বোধ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত, সে ব্যক্তি শক্তি দেবতার নাম গ্রহণেও পরাঙ্মুখ, এবং যে ব্যক্তি শান্ত, সে বৈষ্ণবগণকে বিধর্মী বোধে মনে মনে ঘৃণা ও তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিলে কেহই কাহারও বিপক্ষ বা বিধর্মীচােরী নহেন। প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন দ্বারা সাধক ব্যক্তি স্বাধাকে লাভ করিবার চেষ্টা করেন, শাস্ত্রাদি পঞ্চভাবে বিষ্ণুভক্তগণ কাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং মদ্যাদি-সাধক ব্যক্তিও তাঁহাকেই লাভ করা পরম পরমার্থ জ্ঞান করেন। কেবল পরস্পরে অজ্ঞানান্ধতা প্রযুক্ত বর্ষাক মর্ষ শির করিতে না পারিয়া অনর্থক বাগবিতণ্ডা ও দ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়েন। আহা! একথা কেহই অনুধাবন

করেন না যে, যাহাকে “প্রাণায়াম” যোগ বলে, তাহাকেই “শান্তভাব” এবং পুনর্বীর তাহাকেই “মদ্য সাধন” বলা যায়। যাহাকে বৈদ্য মাগে “সম্বোধি” কহে, তাহাকেই পুরাণে “মধুরভাব” এবং তাহাকেই তন্ত্রে “মেধুন যোগ” বলিয়া উক্তি করেন। কেবল অজ্ঞানতা প্রযুক্ত লোকে জগদীশ্বরের রূপক বর্ণনা বিবয়ক কৌশল বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্যগত ঐক্য সম্পাদন করিতে অপারগ হওয়াতেই বিষম বিশৃঙ্খলা অনুভব করেন। ফলতঃ কোন উপাসনাই পরস্পর বিরোধী নহে। সকলেরই সম্যকরূপে মিলন ও ঐক্য নির্দিষ্ট আছে। যথা—

“ত্রয়ী সাংখ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,

প্রতিয়ে প্রস্থানে পরম্বিদপদং পথ্যমিতি চ ।

কল্পীনাঃ বৈচিত্র্যাদুজ্জ্বল-কুটিল-নানা-পথজ্ঞায়াঃ-

নুণামেকো গম্য শুভমসিপয়সা মগ্নব ইব ॥ ”

মহিম্ন স্তোত্রম্ ।

হে শিব ! তুমি ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয়াবলম্বিগণের ও সাংখ্যযোগাবলম্বিগণের এবং পশুপতমতধারিগণের ও বৈষ্ণব-গণের উপাস্য দেবতা স্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন পন্থাগণের তুমিই পরম পদ ও পন্থা। কেবল কুটির বৈচিত্র্যতা প্রযুক্ত কেহ ঋজু ও কেহ কুটিল ইত্যাদি বিবিধ পন্থ অবলম্বন করিয়া চলেন। ফলতঃ যেমন নানা নদ মদীর জল নানা দিক্ হইতে ঋজু ও বক্রভাবে বাহিত হইয়া অবশেষে একমাত্র সমুদ্রে

পতিত হয়, তদ্রূপ যে, যে ভাবে ও যে পন্থানুসারে তোমার উপাসনা করুক, অবশেষে সে সকলেরই তোমাতে সমাধান হইয়া থাকে।

এক্ষণে তন্ত্রমতের উপাসনা সম্বন্ধীয় প্রকৃত প্রস্তাবের বিবরণ করা যাইতেছে। তান্ত্রিক উপাসনার প্রধান উপচার পঞ্চ মকার। যথা,—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মূত্র ও মৈথুন। ইহাদের অভাব হইলে পূজা বা উপাসনা আদৌ সিদ্ধি হইতে পারে না।

“পঞ্চ তত্ত্বং বিনা দেবি নার্কয়েৎ জগদাধিকাং।”

পঞ্চতত্ত্বরূপ যে পঞ্চ মকার তদভাবে জগদম্বার অর্চনা করিবে না। কিন্তু ইদানীন্তন ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ যুবক-দল এই পঞ্চ মকারের কথা শ্রবণ করিলেই মনে মনে স্থগার উদয় করেন এবং তান্ত্রিক উপাসকগণকে কদাচারী ও অসৎ-কর্মাবলম্বী বিবেচনা করিয়া থাকেন। ঐহাদিগের সহজেই সংশয় উপস্থিত হয় যে, শুণ্ডিকালয়ের অন্ন-বিকারাত্মক মাদক দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য ও মাংসাদি এবং স্ত্রী সহযোগাদি কৰ্ম্ম কখনই চিত্ত শুদ্ধির বা ঈশ্বর সাধনার উপকরণ হইতে পারে না, বরং তাহা সেবনে মনের ও দেহের স্নানি, ক্ষোভনিদ্রা ও অধর্মোৎপাদন হইয়া থাকে। মদ্যাদি সেবনকে শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ পাপ জনক কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছাগাদি হনন ও তন্মাংস ভক্ষণ এবং পরস্রী আশ্রয়ন করিলে ধর্মোপার্জন করা দূরে থাকুক বরং পুঞ্জ পুঞ্জ অধর্ম সংশয় হইতে থাকে।

হুতরাং এতাদৃশ পাপজনক কার্য সকল কি প্রকারে ইষ্ট দেবতার সাধনা ও উপাসনার অঙ্গ হইতে পারে ? এতাদৃশ কার্য দ্বারা ঈশ্বরের সন্তোষোৎপত্তি না হইয়া বরং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন রূপ পাপোৎপত্তি হয় এবং তাহা হইলেই কন্মী ব্যক্তি ঘোরতর দুর্ভেদ্য নরকাগ্নিতে পতিত ও দগ্ধীভূত হইতে থাকে । ফলতঃ তান্ত্রিক উপাসকগণ একালে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন । তাঁহাদিগকে মহাশয় কেহ বিশ্বাস করেন না । তাঁহাদের দ্বারা যে কোন কুকন্মই বাধে না, অর্থাৎ তাঁহারা সকলই করিতে পারেন, অনেকের মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছে । পঞ্চমকার যে কি পদার্থ এবং তাহার ব্যবহারই বা কি প্রকারে ও কি কারণে করিতে হয়, ইষ্ট আরাধনার সহিত তাহার সংশ্রবই বা কি, তাহা যদি বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারেন তাহা হইলে ঐ পরম তত্ত্বের উপর আর কাহারই অশ্রদ্ধা থাকে না ; প্রত্যুত অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইয়া ঐ পঞ্চমকারের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে, সন্দেহ নাই । এই নিমিত্ত মন্দির ব্যক্তিগণের মনের ভ্রম নিরাকরণ জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত পঞ্চমকারের মর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে ।

অনাচারীর সিদ্ধি কোন কালেই নাই ; কি তন্ত্র, কি বেদ, কি স্মৃতি কোন শাস্ত্রই কদাচার করিতে উপদেশ দেন নাই ; আচার-হীন ব্যক্তির কোন কার্যই সফল হয় না । বেদাভিপ্রায়কে খণ্ডন করিয়া তন্ত্রাভিপ্রায় প্রকাশ পায় নাই ;



বেদেও যেরূপ সাধনার উপদেশ আছে, তন্মতেও প্রকারান্তরে বা ভাষান্তরে সেইরূপ সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। লোকে কেবল অনভিজ্ঞতা দোষেই অত্যাচার করিতে থাকে। ঈশ্বরোপাসক ব্যক্তি কি কখন অনাচার-শীল হয়? তন্ত্র শাস্ত্রে ভগবান্ ভূতনাথ রূপক-ব্যাজে উপাসনা ঘটিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মেধাবী সাধক তন্মর্শ্ব গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কামাচার-শীল যথেষ্টাচারী ব্যক্তিরাই যথেষ্টাচার করিবার নিমিত্ত তন্ত্র-বাক্যের অর্থান্তরকে সোপান-ভূত করিয়া লইয়াছে। ফলে তাহারা ঐ পঞ্চ মকারের প্রকৃতাৰ্থ পরিগ্রহ করে নাই। যে যে তন্ত্রে পঞ্চ মকারের বিধি আছে, সেই তন্ত্রেই তাহার প্রকৃত অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,

মদ্য সাধক।

“সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরক্ষাং বরাননে।

পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ ॥”

আগম-সারং।

( পার্বতীকে মহাদেব কহিতেছেন ) হে বরাননে! ব্রহ্ম-রক্ষ-সরসীরূহ হইতে ক্ষরিত যে অমৃত ধারা, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, তাহাকেই মদ্য সাধক বলা যায়।

মাংস সাধক।

“মাংসদ্বাদশনা জ্জেষ্য তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।

সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি সএব মাংসসাধকঃ ॥”

হে দেবি রসনপ্রিয়ে! ( পার্বতি ) রসনার নাগ মা;

তদংশ বাক্য ; যে ব্যক্তি সর্বদা তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাক্য সংযমকারী মৌনাবলম্বী যোগী, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায় ।

কোন ব্যক্তি ছাগ-মেঘাদি-মাংস নিবেদন ও ভক্ষণ-পূর্বক জগদীশ্বরীর আরাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, তন্ত্র শাস্ত্রের কদাচ এরূপ অভিপ্রায় নহে ।

মৎস্য সাধক ।

“গঙ্গা যমুনয়োর্দ্ধো মৎস্যো হৌ চবতঃ সদা ।

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যন্ত স ভবেন্ন্যাসসাধকঃ ॥ ”

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুই মৎস্য নিরন্তর চরিতেছে, সেই মৎস্যকে যে ব্যক্তি আহার করে তাহার নাম মৎস্য-সাধক । স্পষ্টার্থ এই যে, এ স্থলে গঙ্গা শব্দে ইড়ানাড়ী, যমুনা শব্দে পিঙ্গলা ; এই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস নিয়ত গতয়াত করিতেছে তাহারাই মৎস্যদ্বয় ; সেই মৎস্যদ্বয়ের ভক্ষক যোগী অর্থাৎ যে প্রাণায়ামসাধক শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুন্ডলের পুষ্টি করিতেছেন তাহাকেই মৎস্য-সাধক বলে । নতুবা সামান্য জলচর মৎস্যাদিভক্ষণপটু ব্যক্তিকে আমিষ-আহারী ব্যতীত মৎস্য সাধক বলা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে ।

মুদ্রা সাধক ।

“সহস্রারে মহাপঞ্চে কণিকা মুদ্রিতা চয়েৎ ।

শায়া তঠৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ॥

সূর্য্যাকোটপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটীশুশীতলং ।

অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং ।

বস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র মুদ্রা-সাধক উচ্যতে ॥ ”

হে দেবেশি ! শিরসিস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ আত্মার অবস্থিতি । কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় শুশীতল হয়েন । তিনি অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনী-শক্তি-সংযুক্ত ; যাহার সেই পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম মুদ্রা-সাধক ।

মৈথুন সাধক ।

এই মৈথুনতত্ত্বের অর্থ বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে । প্রথমতঃ বায়ুরূপ লিঙ্গ, শূন্যরূপ যোনিতে প্রবেশ অর্থাৎ পূরণ করিয়া যে রমণ করা যায়, অর্থাৎ কুস্তকরূপ যোগ করা যায়, ঐ যোগপরায়ণ ব্যক্তিকে মৈথুন-সাধক বলিয়া যোগশাস্ত্রে উল্লেখ করেন । দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রে উক্তি আছে যে,

“মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারণং ।

মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সূক্ষ্মভং ॥

রেফস্ত কুস্তুমাতাস-কুণ্ড-मध्ये ব্যবস্থিতং ।

মকারশ্চ বিন্দুরূপ-মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥

আকারো হংসমাক্রম্য একতাচ যদা ভবেৎ ।

তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সূক্ষ্মভং ॥

আত্মনি রমতে বশ্যাদাত্মারাম স্তুচ্যতে ।  
 অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং ॥  
 মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং ।  
 সৰ্বকৰ্ম্মাদি সংতাজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ ॥  
 ইদম্ভু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং ।  
 মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্ত কারণং ॥  
 সৰ্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং ।  
 ষড়ঙ্গং পূজয়েদেবি সৰ্বমস্ত্বং প্রসীদতি ॥”

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণস্বরূপ মৈথুন পরমতত্ত্ব ।  
 মৈথুনে সিদ্ধ ব্যক্তির স্তূলভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আনন্দ উদয়  
 হয় । রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে ; মকার বিন্দুরূপ  
 মহা যোনিতে স্থিত । হে প্রিয়ে ! আকাররূপ হংসকে  
 আরোহণ করিয়া যখন ঐ উভয়ের ( র ও ম এই অক্ষর দ্বয়ের )  
 একতা হয় তখন স্তূলভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে । ঐ পদার্থ  
 ( অর্থাৎ রাম এই শব্দের বিষয়ীভূত পরমাত্মা ) আত্মাতে  
 রমণ করেন, এই জন্য তাঁহাকে আত্মারাম বলে । অতএব  
 “রাম” এই নাম নিশ্চয়ই তারকব্রহ্মস্বরূপ । হে মহেশানি !  
 যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে “রাম” এই অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ শব্দ স্মরণ  
 করে, সে ব্যক্তি সৰ্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক ( অর্থাৎ পাপ  
 পুণ্যাদি সকল কার্যের ফলভোগরহিত হইয়া ব্রহ্মময় হয় ।  
 তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ এই মৈথুন-তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম ।  
 মৈথুন পরম তত্ত্ব, ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ স্বরূপ, সৰ্ব পূজাময়

এবং জপাদির ফলপ্রদ । হে দেবি ! ষড়ঙ্গ দ্বারা পূজা করিলে সকল মন্ত্রই প্রসন্ন হয় ।

এস্থলে প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ নিবিষ্টচিত্তে অনু-ধাবন করুন যে, আপাততঃ একান্ত অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান মৈথুন শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রে কেমন গূঢ় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

যেমন পুংজাতির কোষ মধ্যে সন্তানোৎপাদক ডিম্বাকৃতি পদার্থ থাকে, এস্থলে সেইরূপ কুণ্ডবিশেষ অর্থাৎ “ব” এই অক্ষরের মধ্যে “ব=র” এই বর্ণ অবস্থিত । যেমন স্ত্রীজাতির উদরমধ্যস্থ কোষ বিশেষে সন্তান জীবের পুষ্টিসাধক ডিম্ব পদার্থ বিশেষ অবস্থিত, সেইরূপ বিন্দু অর্থাৎ ( ০ ) অনু-স্বররূপ মহাযোনিতে “ম” এই অক্ষররূপ ডিম্ব বিশেষ অবস্থিত । যেমন পুংজাতির ডিম্ব পদার্থ পুংযন্ত্র বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ত্রীযন্ত্র বিশেষ গাগী না হইলে, পারি-ভাষিক মৈথুন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ “ র ” এই বর্ণ “ আ ” সাহায্যে পরিচালিত হইয়া “ম” এই বর্ণে মিলিত না হইলে, রাম নাম উচ্চারণরূপ তন্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক মৈথুন সিদ্ধ হয় না ।

মৈথুনের ষড়ঙ্গ ।

আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসঃ চুস্বনং ধ্যানমীরিতং ।

আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্য মস্থলেপনং ॥

জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণাং ।

সর্কলৈব ত্রয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥

মৈথুন ক্রিয়াতে আলিঙ্গন, চুম্বন, শীতকার, অনুলেপন, রমণ ও রেতো বিবর্জ্জন এই যে ছয় অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে মৈথুন যোগে তত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীতকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ, দক্ষিণান্তের নাম বীৰ্য্যপাতন। হে প্রিয়ে (পার্বতি) তুমি সর্বদা আমার এই প্রাণাধিক প্রিয়তত্ত্ব গোপন করিবে।

এই ষড়ঙ্গ যোগে মৈথুন ষড়ঙ্গ সাধন করিলে মৈথুন-সাধক বল্লভ। নতুবা যুবতী-কলেবরালিঙ্গনকে ন্যাস, যুবতীমুখ চুম্বনকে ধ্যান, কামিনী-স্পর্শ শীতকারকে আবাহন, ঘোষিত-অঙ্গ-বিলেপনকে নৈবেদ্য ও রমণী রমণকে জপ এবং রেতো-বিসর্জ্জনকে দক্ষিণা বলিয়া অসদাচার করিতে শাস্ত্রে উপদেশ নাই। এই পঞ্চ মকার দ্বারা কলিকালের মনুষ্যেরা সাধনা করিতে পট্ট নহে। একারণ কলিকালে পঞ্চ মকার সাধনা বিষয়ে শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। নতুবা শৌণ্ডিকালয়ের মদ্যপান ও কিঞ্চিৎ মুদ্রা ব্যয় দ্বারা মৎস্য মাংসাদি আহার করিয়া পরম-সুন্দরী-রমণী-মৈথুন-রূপ-সাধন করা কঠিন কি? অতএব তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে শাস্ত্রে মদ্যাদির যে অর্থ করিয়াছেন, তদনুযায়ী সাধন অতি কঠিন ব্যাপার, তজ্জন্যই তাহা কলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দিব্য ও বীর ভাবেই এই পঞ্চ মকার সাধনা হয়, কিন্তু কলিযুগে সাধকের ক্ষীণতা প্রযুক্ত তত্ত্ব শাস্ত্রে কেবল পশু-ভাব সাধনাকেই প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

“ মংস্যং মাংসং তথা মূদ্রাং মদ্যং মৈথুনং মেঘচ ।

এতে পঞ্চ মকারাঃ শ্ম্যাঃ কলিকালে নচেষ্টদং ॥ ”

কালীবিলাসং ।

মংস্য, মাংস, মূদ্রা, মদ্য ও মৈথুন এই পাঁচটীকে পঞ্চ মকার कहा যায় । ইহা কলিকালে ইষ্টদ নহে । অর্থাৎ এই কালে মনুষ্যের চিত্ত স্থির নহে, একারণ এ সাধনায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয় ।

“ দিব্য-বীরমতং দেবি কলিকালে নচেষ্টদং ।

কলৌ পশুমতং শাস্ত্রমতঃ দিকীকরো ভবেৎ ॥ ”

হে দেবি ! দিব্য মত ও বীরমত কলিকালে সাধকের ইষ্টদ নহে । অতএব কলিযুগে সাধনার পক্ষে কেবল পশু মতই প্রশস্ত হয় । একালে পশু-মত সাধনাতেই সকল সিদ্ধি লাভ হইবে ।

তন্ত্ৰোক্ত পঞ্চ মকার উপাসনার গূঢ় তাৎপর্য্য এই । এ কালের লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা অতি অসম্ভব । যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে বেদান্তী বলিয়া জানান, অথচ অসদাচরণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখেন অথবা মদ্য, মাংস ভক্ষণ পরায়ণ, পরস্পরী-লোলুপ ব্যক্তিরূপে যদি তান্ত্রিক বলিয়া জানায় তবে তন্নিমিত্ত বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি কোন দোষ স্পর্শ হইতে পারে না ।

এস্থলে এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি

মদ্য, মাংস বা মৈথুন ইত্যাদি শব্দে এরূপ উৎকৃষ্ট পদার্থ বুঝাইল, তবে যে তন্ত্র শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য, তাহাতে এরূপ জটিলার্থ শব্দ প্রয়োগে তাৎপর্য কি ? ইহাতে অনেক লোক অবাস্তবিক অর্থ অনুসারে চলিয়া উচ্ছিন্ন হইতে পারে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তিগত বৈলক্ষণ্যই ইহার কারণ। যে সকল ব্যক্তির এরূপ জঘন্য প্রকৃতি যে, তাহারা কোন মতেই ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ ও ধর্মানুষ্ঠানের নাম প্রসঙ্গ করিতে চাহেন না, তাহাদিগের নিমিত্ত একবারে কঠোর শাসনাত্মক ধর্মশাস্ত্র রচনা করিলে, তাহারা তাহা স্পর্শও করিবেন না ; কিন্তু যদি এরূপ ব্যবস্থা করা যায় যে, তাদৃশ ব্যক্তির আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিকৃষ্ট কার্য্য-ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ৎপরিমাণে ধর্মানুষ্ঠান থাকে, তবে তাহারা ক্রমশঃ মনের পবিত্রতা ও জ্ঞান লাভ দ্বারা উন্নতি সোপানে উত্থিত হইয়া পরিণামে পরিশুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান-প্রণালী অবলম্বন ও যুক্তিপথের অনুসন্ধান করিবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে এরূপ জটিলার্থ শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আদৌ মানসিক গুণানুসারে লোকের সদসৎ-প্রবৃত্তি জন্মে। যে বিষয়ে বাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে সে বিষয়ে প্রবৃত্ত করা যতি কঠিন এবং করিলেও তাহা বিফল হয়। অনিচ্ছায় কোন কন্মেই কাহারও মন নিবদ্ধ হয় না এবং উৎসাহও জন্মে না। সত্ত্ব গুণাবলম্বীদিগকে বৈরাগ্যোপদেশ



দান করিলে তাহারা সম্পূর্ণ যত্ন সহকারে তাহা গ্রহণ করে। রজোগুণাধিক পুরুষকে রাজস কর্মের উপদেশ দিলে সে তাহাতে সন্মত হয়। তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তির তামস কর্মের উপদেশ গ্রহণে যেরূপ যত্নবান হয়, সাত্বিকোপদেশ প্রদান করিলে তাহারা তাহা কখনই সেইরূপে গ্রহণ করে না। তাহারা তামসকর্মা; মদ্যমাংসভোজনেই নিয়ত হর্ষের আহারণ করিয়া থাকে। স্ততরাং তামসী উপাসনাই তাহাদিগের পক্ষে বিধেয়; নতুবা সাত্বিকী উপাসনায় আনিতে চাহিলেই তাহারা নাস্তিক হইয়া উঠে। একারণ মহাকারুণিক শিব দেবতা তামসদিগকে ভগবদ্ভজনার পথে আনিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অবস্থানরূপ উপাসনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত পঞ্চ মকারের প্রকৃতার্থকে গোপন করিয়া দ্ব্যর্থ বা কূটার্থ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রকারান্তরে বাহ্য পঞ্চ মকার সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন না, যাহারা নিয়ত মদ্যপান<sup>৭</sup> ও অবৈধ মাংসাদি ভোজন এবং পরস্ত্রী ভজনেই রত থাকে, তাহারা সাত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ শ্রুতি পথে স্থান দান করিতে পারে না। স্ততরাং তাহাদিগের উদ্ধারার্থ ঐ ব্যবহারের সহিত পরমার্থোপদেশের জন্য বীরাচার মতের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এই আচারকে গোপনকল্পে মুক্তির পথ বলিতে হইবে; নতুবা তামসিক ব্যক্তিগণ এক কালেই নাস্তিক হইয়া যায়। যে রোগী ব্যক্তির সর্বদা মিস্ট্রসমুক্ত সামগ্রী ভক্ষণে প্রবৃত্তি, সেই রোগী অবশ্যই

কটু তিক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত ঔষধ মাত্রাই সেবন করিতে চাহে না ; অতএব তাদৃশস্থলে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য যেমন রোগবর্ধক মিষ্টান্ন মধ্যেও দিব্যৌষধি মিশ্রিত করিয়া আহার করাইয়া তাহাকে রোগ হইতে পরিস্কৃত করেন, তদ্রূপ তামসিক ব্যক্তি-গণের সত্ত্বগুণ বিরোধী মদ্য মাংস ও স্ত্রী সেবনাদি অনিষ্টোৎপাদক কৰ্ম্মের মধ্যে ভগবদারাধনারূপ ঔষধ মিশ্রিত থাকাতে ভবরোগের শান্তি হইতে পারিবে। যাহারা কোন উপাসনা করে না, তাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশ উত্তম কল্প বলিতে হয়। কেন না (অকরণং মন্দকরণং শ্রেয়ঃ) না করার অপেক্ষা এরূপ উপাসনা করাও শ্রেয়স্কর। কালে ঐ সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুচিন্তন-বলে ক্রমে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে—ইহাই পঞ্চ মকারের নিগূঢ় মৰ্ম্ম ও তাৎপর্য।

মদ্যপানাদি নিকৃষ্ট কৰ্ম্ম বটে, তথাপি তন্মধ্যে মদ্যের একটি গুণ এই যে, লোকে পূর্বে যাহা চিন্তা করিয়া মদ্যপান করে, পানানন্তর মত্ততা জন্মিলেও পূর্ব-চিন্তিত সেই বিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। সুতরাং মদ্যপায়ী সাধকদিগের কিঞ্চিৎকাল ভগবানের প্রতি তামসী নিষ্ঠা উপস্থিত হয়। সেই নিষ্ঠার বশবর্তী হইয়া যদি সে ব্যক্তি কোন নারীকে স্বীয় উপাস্য দেবী ভগবতী জ্ঞানে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার জন্য, তাঁহাকে সুরাপান করাইয়া প্রসাদ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ আপনি পান করে এবং আত্ম-সুখার্থ

কাগাখী না হইয়া রতিক্রীড়া করে, অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা দেবী রতিপ্রিয়া এই তামসিক বোধে তৎতুপ্যর্থ শৃঙ্গারাদি করে, তবে ঐ সকল কন্মে ঈশ্বরানুচিন্তন দ্বারা তাহাদিগের ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের প্রভাব ও কালে ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ তাদৃশ লোকের পক্ষে ঈশ্বর ভজনা না করার অপেক্ষা এইরূপে উপাসনা করাও শ্রেয়ঃ হয়।

যাহারা কামুক পুরুষ, নিজ সুখার্থ মদ্যাদি পান, মৎস্য মাংসাহার, এবং পরস্ত্রী সম্ভোগাদি করে, তাহাদিগের শাস্ত্র-সিদ্ধ অপকৃষ্ট গতিই হইয়া থাকে এবং ইহলোকে মাতাল ও লম্পট পুরুষদিগের যেরূপ সম্মান, লোক সমাজে তাহাদিগেরও সেইরূপ সম্মান লাভ হয়। অনাদি-নিধন ভূতেশ্বর মহাদেব বিশিষ্ট উপদেশ ব্যতীত অশিষ্ট-সম্মত উপদেশ কোন তত্ত্বেই দান করেন নাই। তবে অনেকানেক লোকে অনেক প্রকার তত্ত্ব রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া শাসন দিলে অবহুজ্জ মুখ লোকেরা যাদৃশ বিশ্বাস করে, মানব-বচনে তাদৃশ বিশ্বাস কখনই করে না। এই জন্য অনেকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া অনেক তত্ত্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলিতার্থ, সে সকল শাস্ত্রও ঈশ্বরোপাসনা-প্ররত্তি-জনক। স্ততরাং তাহা মনুষ্য-কৃত হইলেও নিন্দনীয় নহে।

যাহারা পঞ্চ মকারের সাধারণ অর্থ পরিগ্রহ করিয়া

বাহ্যে ঐ সকল ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধি-  
বিক্রিয়ার এবং ব্যবহারাদির উপর কেবল কদর্যা কার্যের  
জন্য নিতান্ত নির্ভর। সেই সকল অনার্য্যশীল ব্যক্তির  
অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত আপন আপন অভীষ্ট দেবতার তুষ্টি-  
জনক হয় বলিয়া বথেক্টাচারীর ন্যায় পারিভাষিক মদ্য, মাংস,  
মৎস্য, মূদ্রা ও মৈথুনাदিতে মহা আমোদ করিয়া থাকে।  
তাহাতে মুক্তিপদ লাভ দূরে থাকুক, বরং তাদৃশ ব্যক্তিকে  
দেহাবসানে মহানরক-জ্বালাতেই আপতিত হইতে হইবে।

একান্ত নিকৃষ্ট পথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তত্ত্ব শাস্ত্রে  
নিম্ন লিখিত রূপ নিকৃষ্ট গতি লাভের শাসনবাক্য রহিয়াছে।

কলৌ প্রিয়ে মহেশানি রাজসান্তামসান্তথা।

নিষিক্কাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্তঃ পরান্ বহ্ন।

আবাত্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঈব সুরেশ্বরি।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্য মবিচার্য্যার্পয়ন্তি তে।

ভূতপ্রেতপিশাচান্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥

( তত্ত্বম্ )

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিয়াছেন, হে মহেশানি ! কলিযুগে  
মানবমাত্র প্রায় রজোগুণ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট হইবে ; ইহারা  
বেদ-শাস্ত্রাদি-উক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল  
যে নিষিক্কাচার-পরায়ণ হইবে, এমত নহে ; অপর বহু লোক-  
কেও ভুলাইয়া ঐ মত গ্রহণ করাইবে। হে সুরেশ্বরি !  
তোমাকে ও আমাকে মদ্য, মাংস ও রক্ত প্রিয় বলিয়া ঐ সকল

কদর্য্য দ্রব্য নিবেদন করিবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিচার না করিয়া সকল জাতি একত্র মিলিত হইয়া মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যাদি পান করিবে ; সেই সকল যথেষ্টাচারিগণ, ইহ জন্মকৃত ঐ নিষিদ্ধাচরণ করণ জন্য অন্তে ভূত, প্রেত, পিশাচ ও ব্রহ্মরাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইবে ।

ফলিতার্থ, বর্তমান কালে আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানিগণ লোক ভুলাইয়া দল-পুষ্টি করিয়া বেদ-বিরুদ্ধ মতকে প্রসিদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে । তদ্রূপ ঐ সকল ভ্রষ্ট লোকেরাও তত্ত্ব মন্ত্র বলিয়া ঐ কদর্য্য মত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে । প্রকৃত পক্ষ মকারের অসাধ্যতা প্রযুক্ত বাহ্য পক্ষ মকার গ্রহণ করিয়া সাধকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া আপন আপন সংসারযাত্রা নির্বাহার্থ উপায় স্থির করিয়া লইয়াছে ।

---

দশম অধ্যায় ।

দশ মহাবিদ্যার বিবরণ ।

পরাংপর পরমাত্মার সাধনোদ্দেশে যে সমস্ত স্থূল মূর্তির কল্পনা করা যায়, তন্মধ্যে দশ মহাবিদ্যার মূর্তি অতি প্রধান । এই দশ মহাবিদ্যার সহিত দশাবতারের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; কেবল স্ত্রী পুরুষ উপাধি ভেদ মাত্র । এই স্ত্রী পুরুষ

উভয় সংজ্ঞাই সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে আরোপিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক। ভ্রান্ত লোকে ভ্রান্তিবশতঃ সেই একমাত্র পদার্থে দ্বিধা কল্পনা করিয়া থাকে। পরম ব্রহ্মের বিশেষণে স্ত্রী আর পুরুষের পৃথক্ ভাবের সম্বন্ধ নাই। কারণ, সর্ববশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে সর্বরূপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং যোগতত্ত্বে এই জগৎকে “হরগৌর্যাত্মকং জগৎ” বলিয়াও নির্দেশ করেন। অতএব এই দশ মহাবিদ্যার সগুণ ও নিগুণ ভাব ব্যক্ত করা যাইতেছে।

এতৎপ্রসঙ্গে দশটি রাত্রির বিবরণ ব্যক্ত করা কর্তব্য অর্থাৎ এই দশ মহাবিদ্যার এক একটি পৃথক পৃথক রাত্রি নির্দিষ্ট আছে। যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা হইলেন; তদ্রূপ, কালরাত্রি, দিব্যরাত্রি, তাররাত্রি, সিদ্ধরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণরাত্রি, জ্যেষ্ঠরাত্রি, বীররাত্রি ও ঘোররাত্রি, এই দশটি রাত্রি নামে নির্দিষ্ট আছে। ঐ সকল মহাবিদ্যার সাধন ভজনাদিক্রমে যে কোন কার্য্য ঐ ঐ রাত্রিতে সমাধা হইয়া থাকে, তাহা বিবরণ বিস্তারিতরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে গ্রন্থ-বাহুল্য হইয়া পড়ে। ফলতঃ মহাবিদ্যার উপাসকগণ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ঐ দশরাত্রির বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণন করা হইল না।

দশ মহাবিদ্যার সহিত ভগবানের দশাবতারের অধ্যাত্ম কল্পে ও ব্রহ্মোপকরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। কে-

বল অজ্ঞান-বিকার প্রযুক্ত প্রকৃতিপুরুষ-উপাসকগণ নিব্বন্ধ ঐশ্বরিক ভাবের সংমিলনে অক্ষম হইয়া নানাবিধ কুতর্ক উপস্থিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্বোক্ত পরমহংস মহাশয়ের ব্যাখ্যানুযায়ী এই দশ মহাবিদ্যা বিষয়ক স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

এই দশ মহাবিদ্যা বিদ্যামধ্যে প্রধানা; এতদ্বিন্ন অষ্টাদশ মহাবিদ্যা এবং শত কোটি উপবিদ্যা আছেন। সে সকলের সম্যক্ ব্রহ্মান্ত কহিতে কাহারই সাধ্য নাই; ফলে ইহারা সকলেই ব্রহ্ম-স্বরূপা হইবেন। ইহাদিগের বেশ, ভূষা, ভূজ, পাদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই ব্রহ্মোপকরণ হয়। ইহারা এক এক দেবীরূপে বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তাহাকে অলৌকিক বোধ করিয়া কেহ কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচক্ষণ সুধীগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেননা, ঈশ্বরের কার্য্য নিরঙ্কুশ, তন্মধ্যে কোন কার্য্য লৌকিক যন্ত্রির অনুকূল, কোন কার্য্য সম্যক্‌রূপে অলৌকিক হয়; তাহাতে লোকের বিশ্বাস হউক বা না হউক, পরমেশ্বর সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সদসদাঙ্গ, তাহাতে যুক্ত ও অযুক্ত উভয়ই সম্ভব হয়। এপ্রযুক্ত যুক্ত পুরুষেরা যুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরকে প্রকৃতি পুরুষ যুক্ত ভাবে ভাবনা দ্বারা উচ্চ-শূন্য হইয়া বিচার করিয়া থাকেন। কালীতারা দি মহাবিদ্যাগণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ইহারা এক

ব্রহ্ম বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহেন। এক্ষণে দশ মহাবিদ্যা  
ঘটিত শাস্ত্রীয় ইতিহাস রিবৃত হইতেছে।

[ কালী । ]

দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোক বিপ্রতা ।

কুপিতা। দক্ষ রাজর্ষিঃ সতীতাক্রা কলেবরাং ॥

অনুগ্রহাচ্চ মেনারাং জাতা তস্মাস্তু সা তদা ।

কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥

[ নারদ পঞ্চরাত্র, তৃতীয় অধ্যায় ]

লোক বিপ্রতা যে সতী মহারাজ দক্ষের গৃহে জন্ম গ্রহণ  
করিয়াছিলেন, সেই সতী ( দক্ষ যজ্ঞে শিব নিন্দা শ্রবণে )  
দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া দক্ষজাত কলেবর পরিত্যাগ করত  
অনুগ্রহ প্রকাশে তুহিনাচল পত্নী মেনকাগর্ভে আবির্ভূতা  
হয়েন। সর্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই পার্বতী তথায় কালী  
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সেই কালীই যে কালে একরূপে অনেক রূপা হয়েন  
তাহা “স্বতন্ত্র তন্ত্র” গ্রন্থে ব্যক্ত আছে। যথা—

”মহারাত্রি দিনেহবজ্রাং নগর্যাং জাতমেব তৎ।

কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কম্ ॥”

হে মহেশানি ! মহারাত্রি দিনে অবন্তী নগরীতে কালী-  
রূপ প্রকাশিত হয়েন। সেই কালীরূপ সাক্ষাৎ কৈবল্য  
অর্থাৎ মোক্ষ প্রদায়ক।

মহারাত্রি পদে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা একাদশী ; তাহাতে যে



মূর্তির আবির্ভাব হয়, তাহারও নাম কালী ; কেবল কিঞ্চিৎ মাত্র রূপভেদ আছে। এই কালী মূর্তির বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে অপর অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে ; স্ততরাং এস্থলে আর তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই । এক্ষণে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারার মাহাত্ম্য ও বিবরণ বর্ণিত হইতেছে ।

[ তারা ]

শাস্ত্রে এই তারা মূর্তিকেই নীল সরস্বতী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । ইনি কাল রাত্রিতে সাধকের উগ্র আপৎ-তারণার্থ আবির্ভূতা হন ; এই কারণে লোকে ইহাকে “উগ্র-তারা” বলিয়া অর্জনা করে । এই তারা সাক্ষাৎ তারক ব্রহ্ম-রূপ প্রণব স্বরূপা হয়েন ; এই জন্য ইহার নাম তারা । ইহার দেহ সামান্য পদার্থ নহে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপকরণ মাত্র ; ইহার ক্ষয়োদয় নাই । ইনি গগন-সদৃশ অতি-স্বচ্ছ-নির্মল নীলবর্ণা এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ভূজ-বিশিষ্টা । ইহার উদর ব্রহ্মাণ্ডবৎ লম্বমানা ; ( তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোদরে সকলেরই অবস্থিতি ; একারণ ইনি লম্বোদরী হইয়াছেন । ) মহাকালের অপরা মূর্তি অক্ষোভ্য ইহার ভৈরব । ( তাৎপর্য্য এই যে ) সকলেই ক্ষোভিত হয়, অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়, কেবল ক্ষোভশূন্য কালেরই নাশ নাই ; কাল নিত্যই দণ্ডায়মান আছেন । তারা পঞ্চেন্দ্র-ভূষণা । ফলতঃ তারারূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । ইহার উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা । পরব্রহ্ম আত্মস্বরূপ প্রদর্শনার্থ কালে কালে এক এক

রূপ ধারণ করেন ; নতুবা তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি জীবের বিশ্বাস থাকে না । কেবল “একজন পরব্রহ্ম আছেন” এই কথা বলিয়া নিশ্চিত হইলে, কালে লোকে নাস্তিক হইয়া উঠে । এই মহাবিদ্যা তারা কালীরূপা ; ইহাঁর আবির্ভাব দিবসকেই শান্ত্রে কালরাত্রি বলিয়া থাকে । যথা—

“কালরাত্রিদিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে ।

উগ্রাপত্তারণার্থস্ত উগ্রতারা স্বয়ং কলা ।

মেরোঃ পশ্চিমকূলেতু চোলাখ্যোহস্তি হ্রদো মহান ।

তত্রযজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলসরস্বতী ॥”

( স্বতন্ত্র তন্ত্র )

কালরাত্রি দিবসে অর্থাৎ কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে মধ্য রাত্রিকালে স্বয়ং লক্ষ্মী-মূর্তি মাতা নীলসরস্বতী বা উগ্রতারা সাধকদিগের উগ্রাপৎ তারণের নিমিত্ত, স্মেরুর পশ্চিমস্থ চোলাখ্য মহাহ্রদের কূলে আবির্ভূতা হন ।

উগ্রাপত্তারণ নিমিত্ত অর্থাৎ শুভ, নিশুভ অম্বরদ্বয় হইতে দেবতাদিগের যে অত্যাগ্র আপৎ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে দেবতাগণের উদ্ধরণার্থ স্বয়ং ব্রহ্ম চোলাখ্য হ্রদ-কূলে দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন । ঐ আপদে আক্রান্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃষ্ণা চতুর্দশীতে গঙ্গাবতরণ দেশে হিমালয়ে কালীপূজা করিবার উদ্যোগ করাতো, শুভ নিশু-স্তের দূত “চণ্ডমুণ্ড” তাহা দেখিয়া তদুপকরণ সকল নষ্ট করে এবং প্রতিমাকেও ভগ্ন করিয়া ফেলে । পরে রাজাকে

সংবাদ দিয়া তথায় অনুসন্ধান করিতে সেনা সংস্থাপিত করিয়া রাখে এবং দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ; কোন মতেই স্বস্ত্যয়নাদি করিতে দেয় না। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি গুপ্ত ভাবে অমাবস্যার নিশীথ কালে স্রমেরুর পশ্চিমস্থ চোলন হ্রদের তীরে রাত্রি মধ্যেই কালী প্রতিমা করিয়া রাত্রিতেই পূজা করত বিসর্জন করিলেন। প্রভাতে তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকিল না এবং অস্রদলেও ইহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে পারিল না। তদবধি কার্তিকের অমাবস্যার নাম কাল-রাত্রি। শাস্ত্রে তাহাকে কালিকা পূজার রাত্রি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানে মাতা কালিকা গৌরীদেহ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের উগ্র আপৎ নিস্তারণ জন্য সরস্বতী রূপে প্রকাশিত হন।\* তথা হইতে যেখানে পূর্বে দেবতার পূজার্থ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সেই জাহ্নবী-তীরে স্নানার্থ গমন করেন, যথা—

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথা পুরা।

বধায় হৃষ্টদৈত্যানাং তথা গুপ্তনিগুপ্তয়োঃ ॥

মহিষাসুর বধানস্তর, পুনর্ব্বার তিনি গৌরীরূপা হইয়া দুর্গ দৈত্যদিগের বিনাশার্থ এবং শুভ নিশুস্তের বধের নিমিত্ত সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন।

---

\* সপ্তশতী গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ আছে।

উৎপত্তি কালে দেবী হিমকুন্দেশু-বধলা ছিলেন, পরে তৎ-  
কালে শিবের উর্দ্ধবদন-গলিত তেজঃপ্রভাবে নীলবর্ণা হন; যথা

তপস্যাং চরত তস্মিন্ ত্রিযুগং সমবর্তত ॥

মমোর্ধ্ব বক্ত্রান্নিসৃত্য তেজোরশিবিবর্জিতঃ ।

হ্রদে চোলে নিপত্যেব নীলবর্ণা ভবত্তদা ॥

( হে পার্শ্বতি ! ) আমি সেই স্থানে ত্রিযুগ পর্য্যন্ত  
তপস্যা করি। সেই তপোবিরামে আমার উর্দ্ধ বদন হইতে  
তেজোরশি বিনির্গত ও বিবর্জিত হইয়া ঐ চোল হ্রদে নিপ-  
তিত হয়, তাহাতে ঐ হ্রদ নীলবর্ণ হইল ; মাতা সরস্বতীও  
তাহাতে নীলবর্ণা হয়েন।

চণ্ডীতে ইহাকেই কৌশিকী বলিয়াছেন ; তন্মুখে তাঁহাকে  
নীল সরস্বতী বলিয়া উক্ত করেন। ঐ চোলাখ্য হ্রদ তদবধি  
নীল সাগর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজেরা এই  
নদীকে এক্ষণে “নাইল” বলিয়া উল্লেখ করেন।

হ্রদস্য চোতরে ভাগে ঋষি রেকা মহত্তমঃ ।

মদংশোহক্ষোভ্য নামাসৌ তদারাধনতৎপরঃ ।

কূর্চ্চবীজস্বরূপা সা প্রত্যালীড়পদাভবৎ ।

ঐ হ্রদের উত্তর তীরে অক্ষোভ্য নামে এক মহত্তম ঋষি  
তাঁহার আরাধনা করেন। হে পার্শ্বতি ! সেই ঋষি আমার  
অংশ অর্থাৎ আমি মহাকাল রূপ ; তিনি আমার অপর মূর্তি-  
বিশেষ। কূর্চ্চবীজস্বরূপা তারাও তাহাতে প্রত্যালীড়পদা  
অর্থাৎ সংযুক্তা আছেন।

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমং ।

রহস্যং তারিণী দেব্যা ন সমর্থোহস্মি বিস্তরাৎ ॥

তোমার নিকট এই কিঞ্চিৎ অতি পবিত্র দেবী মাহাত্ম্য  
কথিত হইল । আমি তারা দেবীর এই রহস্য অর্থাৎ গোপ-  
নীয় তত্ত্ব বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ নহি ।

উল্লিখিত তারাও কালী মূর্তির রূপমাত্র ভেদ, স্বরূপের  
ভেদ নাই । কালে এই কালীই স্নন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন ।  
অতঃপর তাহা বর্ণিত হইতেছে ।

[ ষোড়শী ]

শৃণু ভূয়ো মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাত্মতং ।

যেন কালী মহাবিদ্যা স্নন্দরীত্বমুপাগতা ॥

নারদ পঞ্চরাত্রং ।

ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ! . তুমি পুনরায়  
পরম অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর, যাহাতে আদ্যা মহাবিদ্যা  
কালী স্নন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছেন ।

কৈলাসশিখরে রম্যে বসমানে চংশকরে ।

ইন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্কশ্চাপ্সরসো মুদা ॥

আগতান্ত মহাদেবং তুষ্টবুস্তং মহেশ্বরং ।

একদা মহাদেব কৈলাস পর্বতের রম্য শিখরে উপবিষ্ট  
আছেন, এমত কালে ইন্দ্রদেব শিবের সন্তোষার্থ আনন্দের  
সহিত সমস্ত অপ্সরাকে প্রেরণ করেন । অপ্সরাগণ শিবা-  
ন্তেকে আগত হইয়া যথাবিহিত রূপে মহাদেবকে স্তব  
করিয়াছিলেন ।

## ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যোং বচনং শ্রদ্ধা তাসাং স বৃষভধ্বজঃ ।

আভাষ্য শ্রদ্ধয়া বাচা করুণামৃতয়া ততঃ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ ! বৃষভধ্বজ শঙ্কর সেই অপ্সরো-  
গণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রেমভাবে করুণামৃতপূরিত  
বাক্যে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন ।

পুরুষস্যাতিথি জ্যেষ্ঠঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ।

স্ত্রীণাং স্ত্রী চাতিথিজ্যেষ্ঠা তস্মাদগচ্ছত কালিকাং ।

ইতুক্তা তং পুরং রম্যং বিবেশ পরমেশ্বরঃ ॥

পুরুষের আতিথ্য পুরুষের কর্তব্য ; স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রী  
করিবে । অতএব তোমরা কালিকার নিকট গমন কর,  
তিনিই তোমাদিগের আতিথ্য করিবেন । এই বলিয়া পর-  
মেশ্বর শঙ্কর সেই রম্যপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

উবাচ কালীং ভবানীমীশ্বরঃ পরমেশ্বর ।

তা অপ্যাবাপুঃ পরমাং প্রীতিং পরমদুর্লভাং ॥

অনন্তর ভগবান মহাদেব, পরমেশ্বরী কালীকে সেই  
সংবাদ কহিলেন । তাহারও পুরপ্রবিষ্ট হইয়া কালিকাকৃত  
সংকারে অতি দুর্লভ প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন ।

পরম-প্রিয়-পতি মহাদেব পুনঃ পুনঃ কালী, কালী, বলিয়া  
অপ্সরাদিগের অগ্রে সম্বোধন করাতে কালিকা কিঞ্চিৎ অভি-  
মানিনী হইলেন । যথা—

ভতো দেবী মহাকালী চিস্তয়িত্বা মুহমূর্ছঃ ।

এতদ্রূপমপাকৃত্য শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং ।

\* বস্মাং কালীতি কালীতি মহাদেবঃ মমাহ্ময়েৎ ॥

অনন্তর মহাদেবী কালী বারম্বার চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন, যে আমি এই কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ গৌরীরূপা হইব। যে হেতু, মহাদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কালী, কালী বলিয়া আহ্বান করেন।

অনন্তর মহাদেব তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহাদেবোহপি কালেন গতোহাস্তঃ পুরং শিবঃ ।

নাপশ্যত তদা কালীং তস্মৌ তস্মিন্ পুরে হরঃ ॥

মহাদেবও কিছুকাল পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন ; কিন্তু অন্তঃপুরে কালীকে না দেখিয়া তখন তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

অথ কালে কদাচিত্তু আগতস্তত্র নারদঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং ।

কৃতাজ্জলিপুট স্তস্মৌ ততো দেবাগ্রতো মুনিঃ ॥

অনন্তর হঠাৎ মহামুনি নারদ শিবদর্শনার্থ কৈলাসে নম্রাগত হইয়া ভূমিনত-মস্তকে দেব-দেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

মহাদেবোহপি বামেন পাণিনা মুনিসত্তমং ।

উপস্পৃশ্য লম্বাশাস্য চক্রে পুণ্যবতীং কথাং ॥

মহাদেবও বাম হস্তে মুনিসত্তম নারদকে স্পর্শ করিয়া এবং

কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদির দ্বারা আশ্বাস করতঃ পুণ্যজনক নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাদেবী কালীও পরম সুন্দরী রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন মহাদেব নারদসমক্ষে দেবীকে কহিলেন ;—

যস্মাৎ ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে ।

তস্মাৎ স্বর্গেচ মর্ত্যেচ পাতালে হ্যত্র পার্শ্বতি ॥

সুন্দরী পঞ্চমী ত্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী ।

সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ ॥

যৎ ছায়াং হৃদয়ে মেহদ্য দৃষ্ট্বা ভীতাং তুরিষরী ।

তস্মাৎ ত্বং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুর ভৈরবী ॥

হে শিবে পার্শ্বতি ! যে হেতু এই ত্রিভুবন মধ্যে তুমি আপনার রূপকে অতিশ্রেষ্ঠ করিলে, একারণ স্বর্গ লোকে ও মর্ত্য লোকে এবং পাতালাদি অন্য লোকে, তুমি সুন্দরী, পঞ্চমী, ত্রীবিদ্যা এবং ত্রিপুর-সুন্দরী নামে খ্যাতা হইবে ; এজন্য তোমাকে সকলে “ষোড়শী” বলিয়াও বিখ্যাতা করিবে। হে সুরেশ্বরী, তুমি অদ্য আমাতে তোমার যে আপন ছায়া দেখিয়া ভীতা হইলে, একারণ, ত্রিলোক মধ্যে তুমি ত্রিপুর ভৈরবী নামে বিখ্যাত হইবে।

[ ভুবনেশ্বরী ]

যাহবস্থা ভগবত্যাশ্চ স্নহচিত্তা রূপাময়ী ।

ততস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিহঃ ॥



ভগবতীর যে অবস্থা অতি স্নহচিত্তা, এবং সর্বজীবে  
কৃপা প্রদান করেন, তাহাকেই “ভুবনেশ্বরী” বলা যায়। ঐ  
ভুবনেশ্বরী মূর্তিভেদেই রাজরাজেশ্বরী নামে বিখ্যাত।

যাচোগ্রস্তারিণী প্রোক্তা যাচ দিক্রবাসিনী।

ঐষা ললিতকান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গলচণ্ডিকা।

কৌশিকী দেবদূতীচ বাশ্চান্যা মূর্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ইত্যাদি।

যিনি উগ্রতার নামে উক্তা হইয়াছেন, যাহাকে দিক্র-  
বাসিনী বলা যায়, যিনি ললিতকান্তাখ্যা, যিনি মঙ্গলচণ্ডী  
নামে বিখ্যাতা, যাঁহাকে কৌশিকী ও দেবদূতী বলা যায়,  
তাঁহাদিগকে এবং আর আর এইরূপ মূর্তি সকলকে তারারূপ-  
বিভূতি জানিবে।

যা খ্যাতা ভুবনেশানী তস্যা ভেদা হ্যনেকধা।

ত্রিপুটা জয়ভূগাচ বনভূগা ত্রিকণ্টকী ॥

কাত্যায়নী মহিষঘ্নী ভূগাচ বনদেবতা।

শ্রীরামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণীচ শূলিনী ॥

গৃহদেবী গৃহাক্রুড়া মেধা রাধাচ কালিকা।

কথিতাশ্চ সমাসেন তাসাং ভেদাশ্চ নারদ ॥

হে নারদ! যাঁহাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া খ্যাত করা যায়,  
তাঁহার ভেদ অর্থাৎ বিভূতিরূপ অনেক প্রকার। যথা, ত্রিপুটা,  
ভূগা, ( বীজত্রয়বিশিষ্ট ) জয়ভূগা, বনভূগা, ত্রিকণ্টকী, মহিষ-  
ঘাতিনী ভূগা—যাহাকে কাত্যায়নী বলেন, আর বনদেবতা,  
শ্রীরামদেবতা, বজ্র-প্রস্তারিণী ভূগা, শূলধারিণী ভূগা, গৃহদেবী,

গৃহাক্রাণ অর্থাৎ গন্ধেশ্বরী, এবং মেধা, যাঁহাকে রাধা বলা যায় ও কালিকা অর্থাৎ রুদ্রচণ্ডী । সংক্ষেপতঃ ভুবনেশ্বরীর এই সকল মূর্তিভেদ কহিলাম ।

ফলিতার্থে এক কালীই সকল রূপ হইয়াছেন । পূর্বের কালীমাহাত্ম্য কহাতেই এ সকলের ব্রহ্মতা সিদ্ধি হইয়াছে । এক্ষণে প্রত্যেক রূপে মহাদেবী যে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই উপাসকদিগের বোধার্থ বিবৃত হইতেছে ।

স। কালী জগতাং মাতা পতিং গ্রাহ সনাতনী ।

আজ্ঞাপয় মহাদেব রূপমন্যঙ্করামাহং ॥

সেই আদ্যাশক্তি সনাতনী কালী নিজপতি সদাশিবকে কহিলেন, হে মহাদেব ! আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি অন্য প্রকার রূপ ধারণ করি ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অধুনৈব জগদ্ধাত্রি যজ্ঞপং কৰ্ত্তুমিচ্ছসি ।

করিষ্যামি চ তৎ সৰ্ব্বং যত্র প্রীতি স্তবাচলা ॥

পার্বতীর প্রশ্ন শ্রবণে মহাদেব কহিলেন, হে জগদ্ধাত্রি, ( অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিকারিণী ব্রহ্মশক্তি ) ইদানীং তুমি যে প্রকার রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ এবং যাহাতে তোমার অচলা প্রীতির উদ্ভাবন হয়, আমি সে সমস্তই করিব ।

অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ ব্যক্তি, এই উভয়ের ভেদ নাই । পরমাত্মা কালরূপ ; কালী পরমাত্মশক্তি ; কালে এই নানারূপ

বিশ্ব কালীকর্তৃক সৃষ্ট হয় ; এখানে সেই ভাব উক্ত হইয়াছে । যথা, মহাদেবকহিলেন, হে কালি ! তুমি যত রূপধারণ করিতে ইচ্ছা কর, আমিও ততরূপে প্রকাশিত হইব । আত্মা নিরঞ্জন, তিনি কেবল প্রকৃতিতে ভাসমান হন । এই দশ মহাবিদ্যা তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ । অর্থাৎ দশবিধা শক্তিতে জ্ঞান স্বরূপ আত্মাও দশবিধ রূপে ভাসমান হইয়াছেন । মৎস্যাদি দশ অবতারে তাহা সঙ্গত হইয়াছে । এতাবত আত্মা ও আত্ম-শক্তি অভিন্ন, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ।

দেবী উবাচ ।

সর্বকর্তাসি দেবশ তব শক্ত্যা জগৎপতে ।

কিন্তু বাক্যং তব বিভো শ্রয়তাং পরমেশ্বর ॥

মহাদেবী মহাদেবকে কহিলেন, হে জগৎপতে ! তুমিই তোমার শক্তি দ্বারা সকলের কর্তা হও । হে বিভো, হে পরমেশ্বর ! কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ তোমার কথা কহি, তাহা শ্রবণ কর ।

মর্যাদাং স্থাপয়িষ্যামি তপঃ কৃত্বা সুদৃক্ষরং ।

স্বপ্ৰীত্যে মহাভাগ প্রীতিস্তু কুরু তমসি ॥

হে মহাভাগ । আমি কঠিনতর তপস্যা করিয়া তোমার প্রীতির নিমিত্ত মর্যাদা স্থাপন করিব । অতএব তুমি আমাতে প্রীতি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর । অর্থাৎ তুমি অতি দুর্লভ্য, দুষ্কর তপস্যা ভিন্ন তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; আমি জগতে তোমার এই মহিমা স্থাপনা করিব ।

গৌরস্বা রক্তগৌরস্বা শ্যামং গুরুমথাপি বা ।

যদন্যদ্বা স্বরূপং মে তৎ কুরুষ জগৎপতে ॥

হে জগৎপতে শিব ! গৌরবর্ণ বা রক্তগৌর, কিম্বা শ্যাম-  
বর্ণ, অথবা শুক্লবর্ণ, কি অন্য কোন বর্ণ, যাহা আপনারই স্বরূপ  
ও প্রীতিজনক হয়, আমাকে সেইরূপ বর্ণবিশিষ্টা করুন ।

বামেন পাণিনা সাধ্বী মুখাপ্য পরমেশ্বরঃ ।

মার্জ্জয়িত্বা প্রিয়াদেহং নির্মলং কৃতবান্ হরঃ ॥

মহাদেব পার্শ্বতীবাক্য শ্রবণ করিয়া, বামহস্তে ধরিয়া  
তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন এবং অপ্রিয়া পার্শ্বতীর শরীরকে  
মার্জন করিয়া নির্মল করিলেন ।

মন্দাকিন্যা জলে রম্যো স্নাপয়ামাস পার্শ্বতীং ।

বিদ্যাজপাহতবদগৌরী বিদ্যাকৌরীতি বিশ্রুতা ॥

মন্দাকিনীর নির্মল মনোহর জলে পার্শ্বতীকে স্নান করা-  
ইলেন ; সর্বরূপা পার্শ্বতী তচ্ছলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যাতের ন্যায়  
গৌরবর্ণা হইলেন ; তদবধি সুন্দরীশক্তি “বিদ্যাদ্গৌরী” নামে  
বিশ্রুতা হন ।

স্বাহা গৌরীতি শ্যামা চ গুরা চ রক্তগৌরিকা ।

অনন্তরূপিণী মূর্তিঃ কোটিকোটীস্বরূপিণী ॥

শাকন্তর্যামলা স্মৃতা ষট্‌পদী ভ্রামরী তথা ।

অনেকবর্ণা গন্তব্যানন্দরূপা সনাতনী ॥

বিদ্যাদ্গৌরীরূপা হইবার পর সুন্দরী স্বাহা-গৌরী নামে  
শ্যামবর্ণা হইলেন এবং শুক্লবর্ণা ও রক্তগৌরী শাকন্তরী,

অমলা, সূক্ষ্মরূপা, ঘটপদী ও ভ্রামরীরূপা হইয়া প্রকাশ পাইলেন। ফলতঃ তৎকালে কোটি কোটি রূপ-ধারিণী, অনন্ত-রূপা, অনেকবর্ণা, অনেক-মূর্তি হইলেন। তিনি সনাতনী, ক্ষয়োদয়রহিতা, আনন্দরূপা, নিত্য প্রকৃতি হয়েন। কেবল সাধক-প্রাতির নিমিত্ত নানা রূপবতী হইয়াছেন।

ষোড়শী বিদ্যাই সুন্দরী। ইহার নানা-রূপ-ভেদ-মাত্র। যিনি বালা ত্রিপুরা, তিনিই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। দেবী ত্রিপুরা পঞ্চ-প্রেতাসনা। যথা।

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ রুদ্রশ্চ, ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ।

এতে পঞ্চ মহাপ্রেতা দেব্যাঃ পর্য্যঙ্কবাহিনঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর এই পঞ্চ দেবতা পঞ্চ মহাপ্রেতরূপে দেবীর সিংহাসন বহন করেন।

সাধকেরা এইবচনমূলক রাজরাজেশ্বরীর ধ্যান করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তির ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃ-তিকে দেবীর পর্য্যঙ্ক বাহক বলিয়া পরিহাসও করিয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল তান্ত্রিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের স্বরূপার্থ গ্রহণাভাবে লোকে নানা প্রকার বিতর্ক করে। ইহার প্রকৃত ভাব অবগত হইলে, আর কোন উৎপাত থাকে না।

যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি ও পরা বিদ্যা, তিনি প্রণবীকারে পরিণতা; ইহা জানাইবার নিমিত্ত ভগবান ভূত-ভাবন, শঙ্কর জীবের সম্বিধানার্থ রূপকব্যাজে উক্তরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ভূভুবস্বঃ—এইতিন লোককে তিন পুর বলে।

যিনি এতৎপুরত্ৰয় ব্যাপ্তা, তাহার নাম ত্রিপুরা জ্ঞানশক্তি । বিশ্ব-ব্যাপ্ত জ্ঞানকে প্রণবাকারে ব্যাখ্যা করা যায় । অর্থাৎ বিরাটরূপের মহিমা বর্ণনস্থলে ত্রিপুরা মূর্তির উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে, যাহারা তৎস্বরূপের উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইবে, তাহারাই ত্রিপুরা মূর্তির আরাধনাতেই প্রণবাবলম্বন-জনিত ফলভাগী হইবে ; এই সঙ্গুপায় করিয়া দিয়াছেন ।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বাশ্বেষী ব্যক্তিগণ এই “ভুবনেশ্বরী” ত্রিপুরা মূর্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; যথা—

প্রণব জীবদিগের আপাদ মস্তক ব্যাপ্ত । তৎক্ষমতাকে ত্রিপুরা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন । এই প্রেতশব্দ ভূত-বাচক । ভূত পদে জীব ।

মূলাধারে স্থিত ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে ।

মণিপূরে তথা তেজো হৃদি মারুত এবচ ।

বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাশং আজ্ঞাখ্যে চন্দ্র এবচ ॥

ষট্চক্র ব্যাখ্যায় পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত এবং চন্দ্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাপুর—এই ষট্চক্রে অবস্থিত ।

মূলে ( লং ) বীজ, লিঙ্গে ( বং ) বীজ, নাড়ীতে ( রং ) বীজ, হৃদয়ে ( যং ) বীজ, কণ্ঠদেশে ( হং ) বীজ, ক্রমধ্যে ( ঠং ) বীজ,—এই সঙ্কেতানুসারে প্রণবমাহাত্ম্য উপবর্ণিত হইয়াছে । এইরূপ বর্ণনা দ্বারা উপর্যুপরি বীজাধারের সংস্থাভেদে প্রণবের স্বরূপার্থ ব্যক্ত হইয়াছে । ক্রমধ্যে নাদ বিন্দু, তাহাতে

নাদ শক্তি প্রণবরূপ বিন্দু শিবস্বরূপ ।

“ বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদশক্তিসমম্বিতঃ । ”

নাদ-শক্তি-সমম্বিত বিন্দু সাক্ষাৎ শিব হয়েন । একারণ মন্তকোপরিস্থ প্রকৃতিকে ত্রিপুরা স্তন্দরী বলিয়া বিখ্যাত করেন । তারাপতি তন্ত্রে এই তত্ত্ব উক্ত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর পূজাপদ্ধতি নির্দেশ করেন । ফলে যিনি ত্রিপুরা, তিনিই প্রণব, ইহার অন্যথা নাই । যথা—

“ যথা কালী তথা তারা তথৈব ত্রিপুরেশ্বরী । ”

যে কালী, সেই তারা, সেই ত্রিপুরেশ্বরী ।

এই অর্থে কালী তারার মাহাত্ম্য বর্ণন হয় । বস্তুতঃ ব্রহ্মোপকরণ-বিনির্মিত এই সকল দেবীরূপ প্রকৃতি-ব্রহ্ম-স্বরূপ । ইহার সূক্ষ্মার্থ অবগত হইলেই চিত্তস্থ সন্দেহ সকল অনায়াসেই নিরস্ত হয় । ভগবান ভূতপতি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বোধার্থ অজ্ঞ-দিগের পক্ষে প্রকারান্তরে তত্ত্বসংঘাত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । যাহারা বোধশক্তির অভাবে চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, তাহাদিগকে ঘটস্থ অপ্রকট বিষয় প্রকট স্বরূপে এবং অরূপ তত্ত্বকে রূপক ব্যাজে বলিয়াছেন । স্ততরাং তত্ত্বানভিজ্ঞজনে ত্রিপুরারূপের উপাসনাতে অপূর্বরূপ ভগবানকে স্বরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । আধ্যাত্মিক মতে নাদচক্রে সূর্য্য, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, এই চন্দ্র সূর্য্যাত্মক জগৎকে ত্রিপুর বলে । তদধিষ্ঠাতৃদেবী নাদরূপা শক্তিই ত্রিপুরা বলিয়া বিখ্যাতা । সূর্য্য রক্তবর্ণ, রক্তাত্মক ; সোম শ্বেতবর্ণ, শুক্রাত্মক ; এই হেতু পরমপুরুষ

শিব শুক্লবর্ণ, পরমা প্রকৃতি বালা ত্রিপুরা রক্তবর্ণা হয়েন,  
শিবশক্তি হইতেই এতৎ জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

“হরগৌর্যাস্বকং জগৎ।”

বিশ্বসার ঐশ্বর লিখনানুসারে প্রতীয়মান হইতেছে যে,  
ত্রিপুরা জগদ্ব্যাপ্তা জগদীশ্বরী। একারণ তাঁহাকে ত্রিপুরে-  
শ্বরী বলা যায়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালাদি পুরত্রয়স্থ লোক সকল  
তাঁহাকে স্মরণ করিলে জনন-মরণ-ভয়ে পরিত্রাণ পায়। এজন্য  
সকলে ঘোড়শী শক্তিকে ত্রিপুর ভৈরবী বলিয়া উপাসনা  
করেন। অপর, ত্রিশঙ্গে তিনগুণ—যাহাতে পরিপূর্ণরূপে  
অধিষ্ঠিত, সেই ঐশী শক্তিকে ত্রিপুর বলে; তিনি নিত্য।  
যথা—

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাदीনাং ভবোষস্যা নিজেচ্ছয়া।

পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্য। সা পরিকীর্তিতা ॥

যামলং।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদি যাঁহার নিজ ইচ্ছাতে উৎপন্ন এবং তাঁ-  
হারা পুনর্ব্বার যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে নিত্য বল যায়।

পুনরপি

সত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।

সাম্যাবস্থেতি যা তেষাং সাধ্যাক্ত ত্রিপুরেশ্বরী ॥

যামলং।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় যে শক্তিতে সমতা প্রাপ্ত  
হয়, তাঁহাকে অব্যক্তা ও ত্রিপুরেশ্বরী বলে।



## [ ভৈরবী ]

ভৈরবী শব্দের প্রকৃত অর্থ এই—ভ শব্দে ভয়; যে ব্যক্তি ভয়যুক্ত তাহাকে ভীৰু বলে; ঙ্গ শব্দে শক্তি; অতএব যে ঐশ্বরিকশক্তি ভীৰু ব্যক্তিগণের ভয়নাশক, তাহাকে “ভৈরবী” বলে।

জীবগণের পক্ষে মরণ হইতে ভয় আর নাই; সেই জনন-মরণ ভয়-যুক্ত ব্যক্তি সকলকে ভীৰু বলে; তাহাদিগের পরিত্রাণ-কারক পরমাত্মাকে ভৈরব বলা যায়; দীর্ঘ ঙ্গকার তৎ-শক্তি রূপ! পরমাত্মার ক্ষমতাই তদীয় শক্তি বলিয়া বর্ণিত। সেই শক্তিকে নামভেদে ত্রিপুরা ভৈরবী ও ত্রিপুরেশ্বরী বলে। তিনিই পরমাত্ম তত্ত্ব-স্বরূপা; অতএব তছুপাসনাতে নিঃসংশয়ে জীবদিগের সংসার ভীতির অপহরণ হয়। ভৈরবী শক্তি নিত্য পদার্থ। যথা—

“অপক্ষয়বিনাশাত্মাং পরিণামার্তিজাগ্রবৎ ।”

ব্রহ্মরূপা শক্তির অবস্থান্তর নাই; অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ নাই। তিনি সর্বদাই জাগরুকা আছেন।

যেমন বাহিরে ভূভুবস্বঃ এই লোক-ত্রয় সেই রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডজীব-শরীরও লোক-ত্রয় বলিয়া পরিগণিত। যথা,

ভূর্লোকঃ কলিতঃ পাদৌ ভুবর্লোকঞ্চ নাভিতঃ ।

স্বর্লোকঃ কলিতো মুৰ্ধা ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ( ভস্মং )

পাদ দেশ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত ভূলোক, নাভির উর্দ্ধ হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভুবলোক; কণ্ঠের উর্দ্ধ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বলোক । অতএব জীবদেহ লোক ত্রয় ময় । ত্রিপুরা তৈরবী শক্তি সেই সমস্ত দেহ ব্যাপ্তা । যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও সোম-সূর্য্য পরা-পর হয়েন, সেই রূপ জীবের মূলাধার চক্রাবধি আজ্ঞাপুর পর্য্যন্ত চক্র সকল পরস্পর অবস্থিত রহিয়াছে । পঞ্চচক্রের উপরি ভাগস্থ পদ্মে বিন্দুরূপ পরম শিব অবস্থিত । তদুপর নাদ শক্তি ; তাঁহাকেই ত্রিপুরা তৈরবী শক্তি বলা যায় । পরস্পর চক্র সকল পরাপরে চক্রের আধাররূপে পরস্পর বহন করিতেছে । যথা,—

মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে ॥ ইত্যাদি \*

[ ছিন্নমস্তা । ]

ছিন্নমস্তা দেবীর স্বরূপ-জ্ঞান অতি দুর্লভ । তাহা স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহসা বোধগম্য হইতে পারে না । এতদ্বিষয়ে ভগবান ভূতনাথের যে ভঙ্গী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ নৈপুণ্যের কার্য্য । ইহাতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও অসূক্ষ্ম ভেদে তিন প্রকার উপদেশ আছে ।

যাহার যেমন প্রজ্ঞা, সে সেই প্রজ্ঞানুসারে তাৎপর্য্য করিয়া থাকে । ফলতঃ যে কোন রূপে হউক, গ্রহণ

এই বিষয় বিশেষরূপে ভুবনেশ্বরী প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

তদ্ভাবনা-যুক্ত পুরুষ বিমুক্ত হয় ; তাহাতে সংশয় নাই ।

প্রথমতঃ ভগবতী ছিন্নমস্তার উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত হইতেছে ।

“ছিন্নোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি তারা সৈবচ কালিকা ।”

মহাদেব পার্শ্ববতীকে কহিতেছেন, হে শিবে ! সংপ্রতি তোমাকে মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা দেবীর উৎপত্তির বিবরণ বলিব । বস্তুতঃ যে তারা, সেই কালী ।

কালীই ছিন্নমস্তা রূপে আবির্ভূতা ও রক্তবর্ণা হইয়া ছিলেন । এজন্য তাঁহাকে “উগ্ররূপা রক্ত-চামুণ্ডা” বলিয়াও খ্যাত করা যায় ।

পুরাকৃতযুগে টৈব কৈলাসে পৰ্ব্বতোত্তমে ।

মহামায়া ময়া সার্কং মহারতপরায়ণা ॥ ( স্বতন্ত্র তন্ত্র )

পূর্বের সত্যযুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পের প্রথম সত্যযুগে পর্ব্ব-তোত্তম কৈলাস শিখরে মহামায়া আমার সহিত মহা-রতি-ক্ৰীড়া-পরায়ণ হইয়াছিলেন ।

শুক্রেৎসারণ কালেচ চণ্ডমূর্তি রভুত্তদা ।

মহায়াঃ স্বদেহ সন্তু তে বেশজী সঙ্ঘভূবতুঃ ॥

সেই রতিতে শুক্রেৎসারণ সময়ে মহামায়া চণ্ডমূর্তি বিশিষ্টা হন । তন্নিমিত্ত সেই সময়ে তাঁহার শরীর হইতে দুই শক্তি উৎপন্ন হইলেন । যথা —

ডাকিনী-বর্গিনী নামা সখো তাভ্যাং সহস্বিকা ।

পুষ্পভদ্রা নদীকূলং জগাম চণ্ডনায়িকা ॥

একের নাম ডাকিনী, অপারার নাম বর্ণিনী । এই উভয়  
সখীর সহিত ঐ চণ্ডমূর্তি ভ্রূগং প্রসূ চণ্ডনায়িকা পুষ্পভদ্রা নদী  
তীরে স্বচ্ছজলে স্নান এবং বিহরণার্থ গমন করেন ।

মধ্যাহ্নে চ ক্ষুধার্জে তে চণ্ডিকাং পূজুত স্ততঃ ॥

ভক্ষণং দেহি তৎ ক্ৰম্য বিহস্য চণ্ডিকা শুভা ।

চিচ্ছেদ নিজ মূৰ্দ্ধানং নিরীক্য সকলাং দিশং ॥

অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে, ঐ দুই সখী ক্ষুধা-  
ভূর হইয়া চণ্ডিকাকে কহিলেন, হে মাতঃ ! ক্ষুধা আমা-  
দিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে ; আপনি কিঞ্চিৎ আহার  
প্রদান করুন । সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডিকা ঈষৎ হাস্য  
করতঃ দশদিক্ অবলোকন করিয়া ( বাম হস্তের নখাগ্রদ্বারা )  
নিজ মস্তক ছেদন করিলেন ।

ছিন্নমাত্রস্ত তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ ।

কণ্ঠাং বিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন ॥

( পঞ্চরাত্রঃ )

হে তপোধন ! ছেদন করিবা মাত্র ঐ ছিন্ন মস্তক দেবীর  
বাম হস্তে পতিত হয় এবং কণ্ঠস্থান হইতে তিন ধারে রক্ত  
নির্গত হইতে থাকে ।

বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে ।

সখীব্রুধে তু সংযোজ্য মধ্যধারাং স্বর্কাননে ।

দেবীর কণ্ঠ হইতে তিন ধারা বহির্গত হয় । যথা—বাম  
দিকে একধারা, দক্ষিণ দিকে একধারা এবং মধ্যস্থলে এক-

ধারা। ঋষদিকের রক্তধারা ডাকিনী-মুখে, আর দক্ষিণ দিকের ধারা বর্ণিনী মুখে নিয়োজন করিয়া ছিন্নমস্তা দেবী মধ্য-দেশোখিতা শোণিতধারা স্বীয় বদনে নিক্ষেপ করিলেন।

এবং কৃত্যতু তান্ত্র গতাঃ সৰ্বা যথাগতঃ।

ছিন্নঃ তস্যা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তী ততঃ স্বতাঃ॥

এইরূপে দেবীর স্বদেহোখিত শোণিত পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া তাহারা সকলে যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। মহাদেবী ছিন্নমুণ্ড ধারণ প্রযুক্ত “ছিন্নমস্তা” বলিয়া বিখ্যাতা হইলেন।

বস্তুতঃ ছিন্নমস্তা-মূর্তি কালী ভিন্ন অন্যরূপা নহেন। কেবল শিব-সঙ্গে চণ্ডমূর্তি হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত “চণ্ডনায়িকা” নাম খ্যাত হইয়াছে। তদ্ব্যক্টে মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে এক ভৈরবের উৎপত্তি হয়। সেই ভৈরবের নাম “ক্রোধ ভৈরব”; ঐ ক্রোধ ভৈরবই চণ্ড-নায়িকার রক্ষক হইলেন।

তদ্রাস্ত্রে ছিন্নমস্তা দেবীর দক্ষিণ ও বাম নাসিকী এবং কণ্ঠ হইতে তিন ধারা রক্ত নির্গত হওয়া বর্ণিত আছে। যথা,—

বামনাসাগলত্রৈকৈ উঁকিনীঃ পর্য্যতোবয়ং।

দক্ষিণ্যে বর্ণিনীঃ দেবী মপায়ত শোণিতং॥

গ্রীবামুলাদুগলত্রৈকৈ নস্তকং পর্য্যতোবয়ং।

( স্বতন্ত্র তন্ত্র )

বাম নাসিকা হইতে গলিত রক্তধারাতে ডাকিনীকে পরি-  
তোষিত করিয়া দক্ষিণ নাসিকা হইতে গলিত রক্তধারা বর্ণি-  
নীকে পান করাইলেন এবং গলদেশ হইতে নির্গত রক্তে  
আত্মমস্তক পরিতুষ্ট করিলেন।

এই বর্ণনার ভেদ নাই। কেবল নাসা কণ্ঠের ভেদ মাত্র।  
অধ্যাত্মপক্ষে ইহাতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সূক্ষ্মা এই নাড়ী-  
ত্রয়ের সংজ্ঞাভেদে ইড়া ডাকিনী শক্তি, পিঙ্গলা বর্ণিনী শক্তি  
এবং ভগবতী ছিন্নমস্তা সূক্ষ্মা নাড়ী রূপা। ইড়ায় প্রবৃত্তি  
মার্গ, পিঙ্গলায় নিরুতি মার্গ, সূক্ষ্মায় মোক্ষমার্গ হয়।  
অর্থাৎ জীবের বীজভূত রক্ত ইড়া-মার্গে শোষিত হইলে  
পুনরায় রক্তোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা; আর পিঙ্গলা মার্গে  
পরিশোষিত হইলে ক্রমে মূর্ত্তিপথে গমন হয়, আর সূক্ষ্মা  
মার্গে পরিশোষিত হইলে শিরঃস্থিত সহস্রারাখে জীবের  
গতি হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। পৌরাণিক  
কল্পনাতে দেবী রক্তপানচ্ছলে ইহাই প্রদর্শন করিয়া  
গিয়াছেন।

মহামায়ার ছিন্নমস্তারূপ হইতে এই উপদেশ লভ্য হই-  
তেছে যে, পরমাত্মাই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি রূপে সৃষ্টি প্রকাশ  
করিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল রূপই উপাস্য। পূর্বে  
উক্ত হইয়াছে, এই জগতে যত স্ত্রীরূপ আছে, সে সকলই  
মহামায়ার রূপ; অতএব সকল স্ত্রীকেই তদ্রূপ-জ্ঞানে  
অর্চনা করিলে মুক্তিলাভ হয়।

পুরাণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে,

নিত্যং স্ত্রীং পূজয়েদ্ যন্ত বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।

প্রকৃত্য স্ত্রীয়া ভূষ্টাশ্চ বধা কৃষ্ণা দ্বিজার্চনৈঃ ॥

( ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতি খণ্ডে । )

যেমন বিজ্ঞগণের অর্চনাতে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইলেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনাদি উপকরণ দ্বারা নিত্য স্ত্রীলোকের অর্চনা করে, তাহার প্রতি এই দশ মহাবিদ্যা মহাপ্রকৃতিগণ পরিতুষ্ট হইয়া সদগতি প্রদান করেন ।

এতাবতী সকল স্ত্রীই যে প্রকৃতি-স্বরূপা— তাহাতে সংশয় নাই । তথাহি, শাস্ত্রে কুমারী পূজার বিধি আছে ; অতএব প্রকৃতি কুমারী-রূপা । অপর, কালী তারাদি মহাবিদ্যাগণ যুবতীরূপা হইলেন । আবার বুদ্ধা এবং বিধবা স্ত্রীগণও প্রকৃতিস্বরূপা । কারণ, বুদ্ধা বিধবারূপে ধূমাবতী মূর্তি প্রকাশ হইয়াছে । কেহ ভাবিতে পারেন যে, রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা, সর্ব শাস্ত্রেই রজস্বলা স্পর্শ নিষেধ আছে । ইহাতে রজস্বলা স্ত্রী কোন মতেই পূজার্য হইতে পারে না । চন্দ্ৰিষয়ে বক্তব্য এই যে, মহাবিদ্যা মধ্যে ছিন্নমস্তা দেবী রজস্বলা মূর্তি । যখন ত্রিকোণাকার বেদী বিপরীত রতিতে ঐশ্বর্য, রতি-কামোপরি আসন এবং কবন্ধ-গলিত ত্রিধারা শাণিতের বর্ণনা রহিয়াছে, তখন বিশেষ রূপে বিবেচনা করিলেই রজস্বলা মূর্তির লক্ষণ লক্ষিত হইবে ।

ছিন্নমস্তা দেবীর বিবরণ অতি গোপনীয় তত্ত্ব । ইহার

সম্যাকরূপ অর্থ করিতে হইলে অনেক গুপ্তকথা বাহির করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে সৰ্ব্ব সাধারণের বিশেষ বোধ হইতে পারে; যেহেতু সে বিষয় সাধক ব্যতীত অন্যের অবিজ্ঞাত। বিশেষতঃ অনেকেই তরিতে অনেক সংশয় করেন। তজ্জন্যই তৎ প্রকাশে কিঞ্চিৎ যত্ন করা আবশ্যিক।

ব্রহ্মশক্তি জগৎকারিণী ও সংহারিণী। তিনি জগন্ময়ী, নিস্তারকারিণী ও মোক্ষমার্গ-স্বরূপা। তাঁহাতেই সৰ্ব্বশক্তিরূপে জগতের স্থিতি হয়। “স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ” এই জগতে ব্রহ্মশক্তিই সমস্ত স্ত্রীরূপা হয়েন। রজস্বলা স্ত্রীও যে সৰ্ব্বত্র পবিত্রা ও পূজনীয়া, তাহা জানাইবার নিমিত্ত প্রকৃতি দেবী ছিন্নমস্তা রূপে প্রকাশ পাইয়া উপদেশ করিয়া ছিলেন যে, যদি কেহ প্রবৃত্তিমার্গে আমার উপাসনা করে, তবে তাহার পুনঃ পুনঃ মৃত্যু অবস্থা দর্শন হয়। একারণ তিনি জীব সম্বন্ধীয় বহু-মস্তকমালা ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীসম্বোধে জীবনের অবিরত বিনাশের দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহার মুণ্ডমালা ধারণ হইয়াছে। জীবকে রক্তবিকার বলা যায়, সেই রক্ত স্ত্রীলোকের দেহোদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করা যায়। রজস্বলাগামী পুরুষকে কালশক্তি গ্রাস করেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে রক্তকালী ছিন্নমস্তাকে স্বরক্তপানাসক্তা বুলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

তিন ধারা রক্তস্রাব বর্ণনের তাৎপর্য্য এই যে ঋতুমতী স্ত্রীর নিষিক্ত দিবসত্রয়-সম্ভূত শোণিতকে শাস্ত্রে ত্রিধারা



বলিয়া উক্ত করেন। ঐ তিন দিবসের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মঘাতিনী, রজকী ও চণ্ডালিনী। তদর্থে ছিন্না, ডাকিনী ও বর্ণিনী নায়িকারূপে বর্ণিতা হয়। ডাকিনী ব্রহ্মঘাতিনী, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব বিঘাতিনী। রজকী মলকারিণী অর্থাৎ জীব-চিত্তে সমলতা প্রদায়িনী। চণ্ডালিনী ছিন্না অর্থাৎ নির্দয়-শীলা। যে স্বীয় মস্তক ছেদন করে, তাহার তুল্য নিষ্করণা আর কে হইতে পারে? সর্ব্ব শরীরে শক্তিব্রয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। একারণ প্রকৃতি দেবী স্বভাবের পরিচয়ার্থ শক্তিরূপে তৎকার্য্যের অনুদর্শন করাইয়াছেন।

মোহপাশে বদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি রজস্বলা রমণী রমণে রত থাকে, তাহার মোক্ষপথ অবরোধ হয় এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ মরণপথে বিচরণ করিতে হয়। এই ছিন্না প্রকরণে রজস্বলা দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় অনুমানে সারতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। স্মরণ্য স্বরূপ যোনিতে প্রকৃতির অধিষ্ঠান; শোণিতও যোনিকূপ হইতে নিঃসৃত হয়। রতি-কাম-বিপরীতা শক্তির তাৎপর্য্য এই যে, রজোযোগে স্ত্রীলোকের মনে রমণাশা অত্যন্ত বলবতী হয়; স্ততরাং ঔৎসুক্যতিরিক্ততা প্রযুক্ত রমণাজন রমণেচ্ছায় সমুথিতা হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে কামের বিপরীতাসন-বিশিষ্টা রক্তচামুণ্ডাকে “ছিন্ন-মস্তা” বলেন। রজস্বলা স্ত্রীতে সন্তোগেচ্ছু পুরুষ আপন মস্তককে আপনি নিরস্ত করে এবং আপনিই আপন শোণিত-পায়ী হয়, যে হেতু ঐ শোণিতধারাত্ম্যই তৎকালে তাহার বুদ্ধির

নিয়ন্ত্ৰৰূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে । অপরন্তু ছিন্নমস্তা দেবীর হস্তদ্বয় নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমार्গের কার্য্য-প্রদর্শক । যে হস্তে খড়্গ, সেই হস্তে প্রবৃত্তি মার্গীয় কার্য্য, যে হস্তে মুণ্ড, সেই হস্তেই নিবৃত্তিমার্গীয় কার্য্য প্রদর্শিত হইতেছে । ছিন্নমুণ্ডে শোণিত পানদ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ।

এক্ষণে নিবৃত্তিমার্গে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তাৎপর্য্য নিষ্কাশিত হইতেছে । সৰ্ব্বশক্তিময়ী ছিন্নমস্তার উপাসনায় জীবের সৰ্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় । যে শক্তির উপাসনায় জীবের পুনর্জন্মাদি নিবারণ হইয়া থাকে, বেদশাস্ত্রে তাঁহাকেই পরাবিদ্যা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । ব্রহ্মশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণা প্রকৃতি রূপা হয়েন । প্রকৃতির সেই অংশত্রয় অথবা ত্রিসংখ্যক দেবীই ছিন্নমস্তা প্রকরণে জীবের উৎপাদিকা ত্রিসংখ্যকরুধির ধারা রূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন । সেই গুণত্রয় যাহাতে সমতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলা যায় । সেই প্রকৃতিই ছিন্নমস্তা । তাঁহার উপাসনায় জীবের পুনরুৎপত্তির কারণ যে রক্ত সেই রক্তকে তিনি স্বয়ং পান করিয়া ভবার্ণব হইতে জীবের উদ্ধার করিয়া থাকেন । ইহাই ছিন্নমস্তামূর্ত্তির অন্তর্নিগূঢ় তাৎপর্য্য ; অতএব ছিন্নমস্তাদেবীর স্বরূপ তত্ত্ব জানিলে আর তদ্বিময়ে কোন সংশয় থাকে না, এবং জীবগণ অসংশয়ে পরমশক্তিকে লাভ করে । পূর্ব্বোক্ত কালী প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণনেই তদ্বিময় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যেহেতু এক কালিকাই ঐ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্টা হয়েন ।

[ ধুমাবতী ]

ধুমশব্দেব তেজোভাগের আবরক তমঃ । তমঃ সৰ্ব্বাচ্ছাদক । যে শক্তি সকলের আচ্ছাদিনী, সেই ঐশা শক্তিকে ধূমা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় । অথবা তমোবিশিষ্টা তামসী শক্তিকে ধুমাবতী বলা যায়, অর্থাৎ স্বয়ং শুদ্ধা হইয়াও যিনি বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থ সংসারসংহরণক্রিয়াকারিণী হন, সেই ঐশ্বরী শক্তির নাম ধুমাবতী ।

পূর্বোক্ত প্রকৃতির মহিমা বর্ণনায় যাহা উল্লেখ করা গিয়াছিল, এই মূর্তির বর্ণনদ্বারা তদর্থের পোষকতা প্রকাশ পায় ; অর্থাৎ সকল স্ত্রীই এক ব্রহ্ম-শক্তিরূপা এবং সকলেই পূজ্যা । তন্নিদর্শনার্থ ভগবতী প্রকৃতিদেবী দশমহাবিদ্যা রূপে আবির্ভূতা হন । ধুমাবতী বুদ্ধাস্ত্রীরূপে প্রকাশমানা হইয়াছেন, স্ততরাং বুদ্ধা স্ত্রীও সকলের পূজ্যা হন ।

এতদ্ভিন্ন যদি কেহ বিধবা স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করেন, এই জন্য তাঁহাকেও সাবধান করা হইয়াছে যে, বিধবাস্ত্রীও আমি ; আমিই সকল স্ত্রী ; আমাভিন্ন প্রকৃতি নাই, যেহেতু ধুমাবতী নামে আমি বুদ্ধা এবং বিধবা স্ত্রীরূপা হই ।

[ ভুবনেশ্বরী ও বগলা ]

ভুবন শব্দে সংসার । যিনি তাহার ঐশ্বরী অর্থাৎ সম্পাদনকর্ত্রী তিনিই “ভুবনেশ্বরী” হইবেন ; তদর্থে পরব্রহ্ম বুঝায় ।

বগ শব্দে জড় ; ল শব্দে চৈতন্য ; আকারের অর্থ কত্রী ; সমস্ত জড় বস্তুকে যাঁহার সত্ত্বায় চৈতন্য বিশিষ্ট করে, সেই ঐশী শক্তিকে “বগলা” বলা যায়। যিনি বাচালকে মূক করেন, মূককে বাচাল করেন, সেই কারণভূতা শক্তির নাম “বগলা”। তাঁহার মূর্তি দর্শনেই ইহা প্রতীয়মান হয়। যে হেতু ঐ মূর্তিবাদীর রসনা গ্রহণ করতঃ শিলা মুদগর প্রহারোদ্যতা হইয়াছেন।

[ মাতঙ্গী ]

মত শব্দে অভিমত। গকারের অর্থ গমন। ঈকারের অর্থ গ্রহণ। অতএব যাঁহাতে ভক্তগাণের গমন অভিমত এবং যিনি ভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম মাতঙ্গী।

[ কমলাঙ্গিকা ]

ক শব্দে ব্রহ্মা। ম শব্দে শিব। ল শব্দে দান। অতএব, যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রদান করেন, তাঁহার নাম “কমলা” বা “কমলাঙ্গিকা”। এই মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপা, তাহাতে সংশয় নাই।

পরব্রহ্ম সর্বরূপ ; তিনি স্ত্রীও বটে, পুরুষরূপও হয়েন। তিনি বালকও হয়েন ; যুবা ও বৃদ্ধও বটে। ব্রহ্ম-নির্দেশক ঋতিতে তাহা ব্যক্ত আছে। যথা—

“পুমাংস্বং স্ত্রী ব্ধ উতস্বং বালোযুবা বৃদ্ধস্বং দণ্ডোদণ্ডেন জীৰ্য্যতে ।”

তুমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং দণ্ডস্বরূপ ও  
আঘাতী স্বরূপও হও ।

অতএব ব্রহ্মে সকলই সম্ভবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।  
যে পুরুষ, সেই স্ত্রী ; ( যথা দুর্গা তথা বিষ্ণু যথা বিষ্ণুস্তথা  
শিবঃ ) যে দুর্গা সেই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু সেই শিব, ইহাতে  
ভেদ নাই । যে দশ মহাবিদ্যা রূপ সেই বিষ্ণুর দশাস্তর রূপ ।

কৃষ্ণস্ত কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী ।

সুন্দরী যামদগ্যস্ত বামনো ভুবনেশ্বরী ॥

ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্ত বলভদ্রস্ত ভৈরবী ।

কমঠো বগলা দেবী মীনো ধ্রুবাবতী তথা ॥

বুদ্ধো জ্যেষ্ঠাহি মাতঙ্গী কঙ্কিস্ত কমলাগ্নিকা ।

এতে দশাবতারান্ত দশ বিদ্যাঃ প্রকর্তিতা ॥”

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালিকা, ( এই কৃষ্ণনামোল্লেখে রাম-  
মূর্তি বুঝিতে হইবে, ) তারা বরাহরূপা, ষোড়শী পরশুরাম,  
ভুবনেশ্বরী বামনরূপা । ভৈরবী বলরামমূর্তি । মাতঙ্গী  
বুদ্ধমূর্তি, কমলাগ্নিকা কঙ্কিরূপা । এই দশাবতারই দশ-  
মহাবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত ।

অতএব ব্রহ্ম-বিশেষণে স্ত্রী-পুরুষদিগের বিশেষ নাই ।  
পরব্রহ্মকে সর্বরূপী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, ইহাতে  
আর সন্দেহ নাই ।

একাদশ অধ্যায় ।

রামায়ণমৰ্ম্ম ।

চির পবিত্র ভারতবর্ষের অমূল্য নিধিস্বরূপ সর্বদর্শী মহর্ষি  
বাল্মীকি পরম পবিত্র রামারণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।  
ভারতবর্ষবাসী পুরাকালীন হিন্দুবর্গ ঐ গ্রন্থকে ধর্ম ও জ্ঞান  
শাস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন এবং পরম পবিত্র  
মুক্তিপদ রাম নামকে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব মঙ্গলের  
আধার স্বরূপ জ্ঞান করিতেন । ইদানীন্তন নব্য যুবকগণ এই  
গ্রন্থকে সামান্য ইতিহাস কথা বলিয়া রাবণাদির যুদ্ধ বৃত্তা-  
ন্তকে অমূলক স্থির করেন এবং ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করি-  
য়াই স্থগার সহিত হাস্য করিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের এই  
জ্ঞানরাশি রামায়ণের মৰ্ম্মাবধারণ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা  
নাই এবং ইহা যে রূপক ব্যাজে পরমার্থ-তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ,  
ইহা তাঁহারা আদৌ জানিতে বা বুঝিতে পারেন না । ঐ  
সকল অল্পদর্শী জ্ঞানিগণের প্রবোধন জন্য পূর্বোক্ত জ্ঞানিগণ  
পরমহংসের ব্যাখ্যানুযায়ী রামায়ণ-মৰ্ম্ম বিস্তারিত রূপে  
ব্যাখ্যাত হইতেছে । যে সকল ব্যক্তির এ সম্বন্ধে কিঞ্চি-  
দ্রাত্ত ও ভ্রম আছে, তাঁহাদিগের ইহা বিশেষ মনোযোগ পূর্বক  
অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা উচিত ।

রামায়ণ মৰ্ম্ম দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথমতঃ ইহাতে বিবিধ সাংসারিক উপদেশ ও শিক্ষা বিস্তার পূর্বক বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে রূপকচ্ছলে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন ও আত্মতত্ত্বের জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত এবং রামায়ণের প্রত্যেক অংশের সহিত তদ্বিষয়ক ঐক্য সম্পাদন করা হইয়াছে। স্থির-চিন্তে নিরপেক্ষ অন্তঃকরণের সহিত বিচার করিলেই তাহা অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য অখণ্ডনীয়। ঋষিগণ সাধনবলে ঈশ্বর-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সকল অযথার্থ বাক্যে পরিপূর্ণ, ইহা বলাই অসম্ভব। সামান্য বুদ্ধিতে কোন কোন বিষয়ের বর্ণনা অসম্ভব বোধ হইতে পারে; কিন্তু সদ্যুক্তিযুক্ত করিতে পারিলে তাহার সে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রামায়ণ গ্রন্থে রামাবতারের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানতঃ দুই প্রকার। একতঃ ভগবান্ মর্ত্যলীলা প্রকাশার্থ অবতার হইয়া জগদ্ধাতার বিশ্বকার্যের প্রতিহর্তাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি নরাবতার হইয়া মনুষ্যাধিকারে যে যে কৰ্ম্ম কর্তব্য, তাহা আপনি লোক শিক্ষার্থ আচরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দর্শনে সেইরূপ আচরণ করিলে মনুষ্যেরা মহাত্ম-পদের বাচ্য হইবেন; অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পিতা-যে রূপ মান্য, পুত্রেরা পিতাকে যে রূপ মান্য করিবে এবং পিতার আজ্ঞাকে যে রূপ রক্ষা করিতে হইবে, তাহা শ্রীরাম-বনবাস-চ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। রাজা দশরথ ধার্মিকের

শ্রেষ্ঠ । কেন না, তিনি রামগত-প্রাণ হইয়াও সত্যধর্ম-  
 রক্ষার্থ প্রতিশ্রুত বরদানে বাধ্য হইয়া সর্ব-জ্যেষ্ঠ, কুল-শ্রেষ্ঠ  
 প্রিয়তম পুত্র রামকেও বনবাস দিয়াছিলেন । সুতীত্র রাম-  
 বিরহ যন্ত্রণায় মন্দহ্যমান হইয়া পরিণামে প্রাণত্যাগও করি-  
 য়াছিলেন ; তথাপি স্ববাক্যের অন্যথা করিতে পারেন নাই ।  
 অতএব মনুষ্যদিগের সত্য প্রতিপালনে যে বিশেষ যত্ন রাখা  
 সর্বতোভাবে কর্তব্য ইহা দ্বারা তাহাই সর্বতোভাবে উপদ্রষ্ট  
 হইয়াছে । ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেক সময়ে নিক্ক-  
 ণ্টক সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একমাত্র পিতৃ-আজ্ঞা  
 রক্ষণকে পরম ধর্ম বোধ করিয়া সমস্ত স্বথ-সম্পত্তি-ভোগে  
 বিতৃষ্ণ হইয়া জটাবকুল ধারণ পূর্বক বনবাগদীকার ও স্বত্ব-  
 গর্ম দণ্ডকারণে ভ্রমণ করিয়াছিলেন । অতএব মনুষ্যদিগের  
 কর্তব্য যে, তাহারা পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষণার্থ সমস্ত প্রকার ঐশ্ব-  
 র্যোও বরং বিযুক্ত হইবে, তথাপি পিতার আজ্ঞা অপ্রতিপালন  
 বা অবহেলন করিবে না । শ্রীমান সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ  
 সর্ব ধনুষ্কারের শ্রেষ্ঠ ছিলেন । তাঁহার প্রতি পিতার বন-  
 বাসাজ্ঞা ছিল না ; কিন্তু তিনি পিতৃবৎ মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার  
 পরিচর্যার্থ আশ্রয়-ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ পূর্বক জটাবকুল-  
 ধারী হইয়া রামের সহিত বিপিনবাসে গমন করিয়াছিলেন ।  
 ইহাতে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, সমস্ত স্বথ সম্পত্তি  
 ভোগে বঞ্চিত হওয়াও ভাল, তথাপি ভ্রাতৃসেবায় পরাজয়  
 হওয়া উচিত নহে ।



মনুষ্য স্ত্রৈণ হইলে যে অশেষ অমঙ্গলের কারণ হয় এবং তাহাতে যে পদে পদে বিপদ ঘটে, কৈকেয়ীর বাক্যে রাজা দশরথের শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দেওয়াতেই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। স্ত্রৈণ পুরুষ যদিও জীবিত থাকে, তথাপি তাহাকে মৃত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

জনকরাজনন্দিনী রামমোহিনী সীতা দেবীকে রাজা দশরথ বনবাস দেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে কৌশল্যার নিকট থাকিতেই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু পবিত্রতার একাধার, বিনয়, শীলতা, সদাচার, ও সতীত্বধর্মের প্রতি-মূর্তি স্বরূপ জনকনন্দিনী পতিব্রতা-ধর্মের দৃঢ়তা জানাইবার নিমিত্ত রাম সহ বনবাসিনী হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও তাঁহাকে কত প্রকার প্রবোধ বাক্যে সাস্তুনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বনগমনে নিবৃত্তা করিতে পারেন নাই।

“ ছায়েবাহুগতা স্ত্রিয়ঃ । ”

স্ত্রীগণ ছায়ায় ন্যায় পতির অনুগতা হইবে।

এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া পতিসেবা করিবার নিমিত্তই মিথিলরাজ-ছহিতা রামের সহিত বনচারিণী হইয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যালোকে পতিব্রতা স্ত্রীগণ পতি-সম্মি-ধান ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই অবস্থিতি করিবেন না এবং পতি বিপদগ্রস্ত বা সম্পত্তিহীন হইলেও স্ত্রীগণ তৎসেবায়

তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না ;—দৃঢ়রূপে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আচণ্ডাল ঋষিলোক পর্য্যন্ত সর্বত্রই যে সমান ভাব প্রদর্শন করামহতের কার্য্য, তাহাই দেখাইবার জন্য সমদর্শী শ্রীরামচন্দ্র গুহকের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞাবে সমদর্শী হইবে, অভিমান বশে আমি শ্রেষ্ঠ ও তুমি অপকৃষ্ট, এমত জ্ঞান করিয়া কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না, এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সীতাহরণ ব্যাপার অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ। পত্নীকে একাকী রাখিয়া কোন স্থানে গমন করা পতির উচিত নহে ; তাহা করিলে অবশ্যই কোন না কোন বিপদ ঘটিতে পারে। যদি উপাদেয় বস্তুও লাভ হয়, তাহাও পরিত্যাগ করিবে, তথাপি স্ত্রীকে একাকী রাখিয়া কোথাও গমন করিবে না ; অপরন্তু, স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না, তথাহি, অভাবনীয়-চেতন-বিশিষ্ট স্বর্ণময় যুগ দর্শনে বিমুগ্ধা সীতা রামকে কহিয়াছিলেন, হে রাম ! তুমি আমাকে এই উপাদেয় হরিণটী ধরিয়া দাও। শ্রীরামচন্দ্রও এই সীতা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিপিন-স্থলে সীতা রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে রাখিয়া যুগাশ্বেষে গমন করেন। অনন্তর অতি দূর বনে গিয়া মায়াযুগকে হত করাতে সে “হা লক্ষ্মণ !”—উচ্চৈঃস্বরে এই শব্দ করিয়া মৃত হয়। তদ্ধনিশ্রবণকাতরা

জনকমন্দিরী রামাশ্বেষণ জন্য রামানুজ লক্ষ্মণকে প্রেরণ করেন। তজ্জন্য বিষম বিপদের ঘটনা হয়। (একারণ লোকে ভ্রাতার অশ্বেষণে ভ্রাতাকে গমন করিতে নিষেধ করে) অর্থাৎ ছুরায়া রাবণ সীতা হরণ করিয়া অভাবনীয় বিপৎপাত উপস্থিত করে। ইহাতে উপদ্রষ্ট হইয়াছে যে, স্ত্রী-কিতে প্রলয় উপস্থিত হয়। উপাদেয় বস্তু দেখিলেই লোভ করা কর্তব্য হয় না, প্রত্যুত তাহার তথ্যানুসন্ধান একান্ত আবশ্যিক।

রাবণ সীতা হরণ করিতে আসিয়াও লক্ষ্মণ-দত্ত গণ্ডী পার হইতে পারিলেন না, অর্থাৎ পরানিষ্টকারী ব্যক্তিও সহসা পরগৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; পরে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ পূর্বক ভিক্ষা-গ্রহণচ্ছলে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতেও এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সাধু-রূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া অসাধুকর্মে করা অবিধেয়; করিলেও তাহার মঙ্গল হয় না। যেহেতু, রাবণের তৎকর্ম-ফলেই সর্বনাশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী-কি যোগী প্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তির ন্যায় বেশভূষা দেখিলেই কোন ব্যক্তিকে যথার্থ সাধু বলিয়া বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, অর্থাৎ তাহার পরীক্ষা লইয়া বিশ্বাস করা গৃহস্থদিগের উচিত হয়।

“অভবো ভবাকপেণ ভস্মাচ্ছ ইবানলঃ।

যতিকপপ্রতিচ্ছয়ো জিহীবুস্তানিন্দিতাং॥”

অভব্য অর্থাৎ অসাধু ব্যক্তি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ঋকপে প্রতিচ্ছন্ন থাকে; দেখ, অনিন্দিতা সীতাকে হরণ

করিবার জন্য অসংস্ভাব রাবণ সাধু-সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়াছিল ।

ফলিতার্থে ছুরাআরা আপনাকে সজ্জনরূপে পরিচিত করিয়া পরের সর্বনাশ করে ; অতএব এতাদৃশ বিষয়ে সকলকে সাবধানতার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

আগত অতিথিকে বিমুখ করা গৃহস্থের যে অকর্তব্য, তাহা সন্ন্যাসিদর্শনে সীতা দেবীর ভিক্ষা দানেই প্রতীতি হইতেছে । কেন না, বনবাসী হইয়া ও পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও সীতা আতিথেয় ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন । সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে সম্পন্নাসম্পন্নের বিচার নাই ; স্বয়ং বিপন্ন হইলেও অতিথিকে সাধ্যানুরূপ অন্নদান করিতে হইবে ।

রাবণ-ভগিনী সূর্পনখা কামাতুরা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছিল । তন্নিমিত্ত লক্ষ্মণ তাহার মাসিকা-কর্ণ-চ্ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপিণী করিয়াছিলেন । ইহাতে কুলকামিনীদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন যে, কুলবধূজন কামের অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া লজ্জা পরিচ্যাগ পূর্বক পুরুষান্তরের নিকট রতি যাচঞা করিলে এতদ্রূপ ছুরবস্থাপন হয় ; অর্থাৎ তাহার মান রক্ষা পায় না । অন্য কোন ব্যক্তিই তাহাকে আদর করে না ; পদে পদে ধর্গোরব হয় এবং অবশেষে সেই লঙ্কিত পুরুষও তাহাকে গণ্য করে ।

পরদার হরণে যে স্বকুল বিনষ্ট হয় এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য

ভ্রষ্ট হয়, তাহা রাবণের পারদারিক কৰ্মের ফল দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সুদুর্গম দুর্গমধ্যস্থ ব্যক্তিও যদ্যপি পরানিষ্ট-কৰ্ম করিয়া সাহস করে, যে, আমার দুর্গ অভেদ্য ও অজেয়, এজন্য কেহই আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তবে তাহার সে স্পর্ধাও বিফলা হয়। রাবণের সুদুর্গম লঙ্কা-বাসেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। ফলতঃ পরপীড়ক ব্যক্তির কোন স্থানেই আত্মপরিদ্রাণ নাই। অসং ব্যক্তি যদিও অসংখ্য ধনজনাদিতে যুক্ত থাকে, তথাপি হিংসাধর্মে রত হইলে তাহার বিনাশ হয়। তদৃষ্টান্ত এই যে, রাবণের ঐশ্বর্যের পরিসীমা ছিল না। তাহার এক লক্ষ পুত্র, সপাদ লক্ষ পৌত্র এবং দৌহিত্রাদি অসংখ্য পরিবার ছিল। ত্রিলোক মধ্যে অজেয় কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি তাহার ভ্রাতা। কিন্তু পরানিষ্টকারী রাবণের সাহায্য করিতে গিয়া সে সকলেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

নির্দোষা পরগৃহস্থা ভার্য্যাকে উদ্ধার করা স্বামীর অত্যা-বশ্যক কার্য্য, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ে—সীতার উদ্ধারেই প্রমাণিত হইয়াছে। স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য জঘন্য পুরুষেরও সহায়তা গ্রহণ করা উচিত, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের বানর-সংখ্যেই সপ্রমাণ হইতেছে। যথা—

স্বকার্য্য যুদ্ধরং প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্থতা ।

বানরেণ সহায়েন জিতো লঙ্কাং রঘুভূমঃ ॥

যে ব্যক্তি যেক্রমে স্বকার্য্যোদ্ধার করিতে পারে, তাহা

করিবে। না করিলে মূৰ্খতা প্রকাশ পায়। যেহেতু, বান্দ্র সাহায্যেও রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে সামান্য জন হইতেও বিশেষ উপকার হয়, তাহার সংশয় নাই।

অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থা মনুষ্যকে লঘু জ্ঞানে অবজ্ঞা করা মূর্খের কার্য্য। কেন না ভল্লুক ও বানরের দ্বারাও দুর্লভ্য সমুদ্র বন্ধ হইয়াছিল। পরগৃহস্থা ভার্য্যা সমাকরূপে দোষ-রহিতা হইলেও বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহা সীতার পরীক্ষাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। অসতের সহিত বন্ধুতা করিলে নির্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিরও বিনাশ হয়; রাবণ বালি রাজার সহিত অগ্নি স্বাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিয়াছিল, সেই মিত্রতা সূত্রে নির্দোষ বালি রাম হস্তে নিপাতিত হয়। ইহাই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। বিপন্ন হইলেও পিতৃ-দেবার্চন করা বিধেয়, আপন অবস্থার উপযুক্তরূপেই তৎ-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহা রহিত করা কর্তব্য নহে। তথাহি, রামচন্দ্র যুত পিতার উদ্দেশে মন্দাকিনী নদীতীরে পিণ্যাকশাকে চিত্রকূটে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন এবং গয়াভূমে ফল্লু তীর্থে বালির পিণ্ডও দিয়াছিলেন। এইরূপ রামায়ণের প্রত্যেক ঘটনাতে যে সকল নীতিসূত্র নিখাত রহিয়াছে, অনুধ্যানশীল ব্যক্তিগণ তাহা অনুধাবন করিলে বিশ্বায়রসে নিমগ্ন হয়েন।

লঙ্কাতে নিত্য পৌর্ণমাসী চন্দ্রোদয় হইত; ইহা শ্রবণ

এতই অসম্ভব বোধ হয়। কেন না লক্ষা অতি ক্ষুদ্র স্থান, চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবী হইতে অনেক বৃহৎ। পৃথিবীর আর আর স্থানে চন্দ্রোদয় না হইয়া কেবল লক্ষা-মধ্যেই উদয় হইত, ইহাতে অবশ্যই সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, একজন পরম জ্ঞানী ঋষি এতাদৃশ অসম্ভব বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহার কারণ কি? অতএব অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় তাৎপর্য আছে।

রাজধিরাজ রাবণ ত্রিলোকাধিকার করিয়াছিল। তাহার নিকট বিদ্যা-জিহ্বাদি অনেকানেক শিল্পকর মিলিত হইয়াছিল, তাহারা বিশেষ বিশেষ পদার্থ-তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিশারদ ছিল। তাহারা রাজনিয়োগে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি বলে বহুবিধ অভাবনীয় যন্ত্র কৌশলাদির উদ্ভাবন করিত। বিদ্যা-জিহ্বার শিল্প নৈপুণ্যে কে না বিস্ময়াপন্ন হয়? তদর্শনে ব্রহ্মাদি দেবতারাও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যখন সীতাকে ভুলাইবার নিমিত্ত রামলক্ষ্মণের সদ্যশিচ্ছিন্ন-গলিত-শোণিত মস্তক প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া কোন ক্রমেই বোধ হয় নাই। মায়াসীতাগুণ্তি দর্শনে শ্রীরামেন্দ্রাদিরও বিষয় জন্মিয়াছিল। অতএব এতাদৃশ অনুভব অসম্ভব নহে—যে সেই সকল শিল্পকরের বুদ্ধি-কৌশলে লক্ষার উপরিভাগে কোন এক প্রকার চন্দ্রাকৃতি আলোকমণ্ডল সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাতেই সমস্ত লক্ষা উপদ্রীপ আলোকময় হইত। লোকে

তাহাকেই যথার্থ চন্দ্রোদয় হইয়াছে বলিয়া মান্য করিত।  
একারণ গ্রন্থকর্তা নিত্য পূর্ণচন্দ্রোদয় বলিয়া অন্ততরমে গ্রন্থ  
বর্ণন করিয়াছেন।

অপর রাজা দশানন দেবতার নিকট বরপ্রাপ্তিনিবন্ধন  
বাহুবলে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিল ; সমস্ত দিকপতিদিগকে  
পরাজিত করিয়া স্ব-সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিল। হুতরাং  
সে ব্যক্তি যে চন্দ্রসূর্যাদিকে জয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে।  
কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা এ বিষয়ে এই সন্দেহ করিতে পারে  
যে, অতি প্রকাণ্ড এবং অচেতন জড় পদার্থ সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্র-  
মণ্ডল লঙ্কাবীপে আসিয়া রাবণের সেবা করিয়াছিল, ইহা  
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, সূর্য্য  
বা চন্দ্রমণ্ডল নিশ্চেতন জড় পদার্থ—ইহা যথার্থ। তাহার  
সচেতনবৎ সেবা-কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে ; কিন্তু সেই  
মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ জঙ্গম শরীরী, তাঁহাদিগের পটুতা  
আছে এবং স্বল্লাধারেও অবস্থিতি করিবার সামর্থ্য আছে।  
যেমন পৃথিবীমণ্ডল অতি বিস্তৃত, তাহাকে জয় করা শব্দে  
তৎস্বামীকে জয় করা বুঝায় ; (নতুবা অচেতন জড় বস্তুর  
জয় পরাজয় কি ?) সেইরূপ চন্দ্রসূর্য্য পরাজয় শব্দে তদ-  
ধিষ্ঠাতৃদেবগণের পরাজয় বুঝিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত রামায়ণের লোকশিক্ষার্থ উপদেশ ভাগ  
বর্ণিত হইল। এক্ষণে পরমাত্ম-ভদ্র-ভাগ বর্ণন করা যাই-  
তেছে। সপ্তম ও নিষ্ঠম ভেদে এক পরমাত্মাই উপাস্য ;



নিগুণ-ব্রহ্মে প্রসঙ্গপ্রসঙ্গ ভাব নাই। মৃততম লোকে তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে পাছে অপ্রত্যয় করে, এজন্য জগৎসর্জনকর্তা ব্রহ্মা কর্তৃক বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া পরমাত্মা এক এক সময়ে এক এক রূপ ধারণ পূর্বক বিশ্ব রক্ষা করেন। ভগবদগীতায় কহিয়াছেন,—

“ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।”

আমি পৃথিবীতে ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

পরমাত্মা এইরূপ যে যে রূপ ধারণ করেন, সেই সেই রূপেই জগতে সর্বলোকের ধ্যেয় হয়েন এবং ধর্মমার্গধ্বংসকারী অসুরাদির বিনাশ করিয়া জগতের শান্তি বিধান করেন। সেই সগুণ রূপের উপাসনা করিয়া যেক্রমে নিগুণতাপ্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, যে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা জানাইবার নিমিত্তই নিগুণ পরমাত্মা সগুণ হইয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রথ শব্দে গমনার্থ যান; এখানে দশধর্ম্মকে রথ কল্পনা করিয়া তাঁহার নাম দশরথ হয়। মম্বাদি শাস্ত্রোক্ত

যুতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং

শৌচমিচ্ছ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো

দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥”

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম লক্ষণ ।

ইহাতে নিষ্ণাত হইলে অর্থাৎ এতদশধর্ম অশ্বলিতরূপে চলিলে, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় । সুতরাং রাজা কোশলাধিপতি দশধর্মারূঢ় হইয়া অশ্বলিতরূপে চলিতেন, একারণ তাঁহার নাম দশরথ ছিল । জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই যে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয় । ষষ্ঠিশাস্ত্রে আত্মা, জীব, মনঃ ও অহঙ্কার এই চারিটিকে ব্রহ্মপুচ্ছ কহেন । জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়—ইহাদিগকে অবস্থা চতুষ্টয় বলেন । সপ্তম অবস্থায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চারি জন আত্মবৃহ চতুষ্টয় বলিয়া গণ্য । এখানে তুরীয়াবস্থায় বাসুদেবাখ্য আত্মা শ্রীরাম । সুষুপ্তাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা শ্রীলক্ষ্মণ । স্বপ্নাবস্থায় প্রহ্লাদাখ্য আত্মা ভরত ; জাগ্রদবস্থায় অনিরুদ্ধাখ্য আত্মা শত্রুঘ্ন । এই চারিরূপে শ্রীরামের অবতার হয় । এস্থলে পরমা বিদ্যাই সীতানামে অভিহিতা । তিনি ভূমি হইতে উত্থিতা হন । শাস্ত্রে উক্তি আছে, যে পৃথিবী সমস্ত ধর্মের আধারভূতা, “ধর্মধারা বহুমুখরা ।” এই নিমিত্তই পৃথিবী হইতে সীতার উৎপত্তি কহিয়াছেন । বিনাধর্মের জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, বিনা যজ্ঞে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বিদ্যালাভ হওয়া কঠিন, তজ্জন্যই যজ্ঞভূমিকর্ষণে সীতার জন্ম সর্বরামায়ণে খ্যাত হইয়াছে । মিথিলাধিপতি জনক রাজা রাজর্ষি

ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রাজযোগ-নিষ্ঠাতা যোগী। তিনি যোগ সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞান লাভ হইলে যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা জ্ঞান-স্বরূপ সীতাকন্যাদানে পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হওয়াতেই সম্প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

অপরন্তু, জ্ঞান প্রদানে পুরুষ-পরোক্ষার্থ কঠিন প্রতিজ্ঞা আবশ্যিক; অর্থাৎ যে ব্যক্তি কঠিন ব্যাপার ভূত ক্রিয়াবান হইবে, তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন সেরূপ পুরুষান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেই সীতা-বিবাহে হরধনু ভঙ্গরূপ “পণ” নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে সাধন-চতুর্কয়-সম্পন্ন পুরুষান্তর অপ্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীরামচন্দ্রই স্বয়ং ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন।

অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানাপহারক যে সমস্ত দোষ রাক্ষসরূপে জন্মিয়াছে, তাহাদিগের অশ্বেষণার্থ সংসার কাননে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান রামচন্দ্র সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক মুনিজন-নিকেতন পঞ্চবটীতে বাস করিয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগিগণ যেস্থানে নিয়ত যোগাভ্যাস করেন, সেইস্থানেই পরমাত্মার নিত্যার্থিষ্ঠান হয়। যথা

নিষকামলকং বিশ্বং ন্যাগ্রোধক্কাথ পিঙ্গলং।

জ্ঞেয়ং পঞ্চবটং দেবী যোগিনাং যোগসিদ্ধিৎ ॥ (যামল বচনঃ)

নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট ও অশ্বত্থ এই পঞ্চবট যোগ-সিদ্ধির স্থান।

এতাদৃশ স্থানে ভগবানের নিত্যাবাস হয়। তজ্জন্য জ্ঞানার্থী যোগীরা এই সকল স্থানে বাস করিয়া তত্ত্বজ্ঞানানু-সন্ধান করিয়া থাকেন। পরমাত্মার বিশেষ স্থান যে পঞ্চবট, ইহা জানাইবার নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্র আর আর সকল স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পঞ্চবটীতেই বাস করিয়াছিলেন।

অপর পরমাত্মার সহিত কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নভাবে যোগস্থান-স্থিত হইলেও তত্ত্ববিরোধী রাক্ষসস্বরূপ বিষ্ময় জ্ঞানকে অপহরণ করে। তাহার প্রমাণ স্বরূপে পরমাত্ম-মূর্তি রাম-চন্দ্রের কিঞ্চিৎ বিরহে জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যা সীতাকে কপটসন্ন্যাসি-রূপে রাক্ষসাধিপ রাবণযোগস্থান পঞ্চবটী হইতেও অপহরণ করিয়াছিল। কপট সন্ন্যাসী-রূপের তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তির অভিলাষে সন্ন্যাসী না হইয়া যে ব্যক্তি শুদ্ধ বিষয় কৰ্ম্মানুষ্ঠানরত ভিক্ষুক রূপে পরিচিত হয়, তাহাকেই জ্ঞানাপ-হারক কপট সন্ন্যাসী বলে। এতদুপদেশার্থ রাবণের সন্ন্যাসিবেশে সীতাহরণ প্রস্তাব উক্ত হইয়াছে।

সূর্য্যারিকা খণ্ডে নিবাসিনো নিকষা নাম্নী রাক্ষসী, বিশ্ব-শ্রবা ঋষির নিকট পুত্র প্রার্থনা করাতে ঋষি তাহাকে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্র ও সুপ্নখা নামে এক কন্যা প্রদান করেন এবং বিনা প্রার্থনাতে ঋষিতুল্য পরম ধার্মিক বিভীষণ নামে আরও এক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভারত-বর্ষের সূর্য্যারিক নামক অংশ দুইখণ্ডে বিভক্ত। তাহার এক খণ্ডের নাম মুনিদেশ, তাহাতে মুনিদিগের আশ্রম,—অপর

খণ্ডের নাম কানিবল, তাহাতে মাল্যবান প্রভৃতি রাক্ষসেরা বাস করে। নিকষা সেই কানিবল খণ্ড হইতে আসিয়া মুনিদেশ-স্থিত বিশ্বশ্রবার নিকট পুত্রপ্রার্থনা করে; ইহাই পৌরাণিক ইতিহাস। বিশ্ববস ঋষিকে কোন স্থানে বিশ্বশ্রবা, কোন স্থানে বিশ্ববস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ফলিতার্থে যিনি একোগম্য, তাঁহার নাম ঋষি; পরমার্থ-ঘটিত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইলে ঋষি পদে পরমাত্মা নারায়ণ। সকল শ্রবণ হইতে যাঁহার শ্রবণ বিশিষ্ট রূপ হয়, তাঁহার নাম “বিশ্রবা” অথবা বিশ্বলীলা শ্রবণ হেতু পরমাত্মাকে বিশ্ববস বলা যায়। কিন্না যিনি শ্রোতব্য, তিনিই বিশ্ববা, এ অর্থে আত্মাই শ্রোতব্য। সূর্য্যারিক পদে সূর্য্য যেখানে তীব্রতা প্রয়োগ করেন, এমত দেশ অথবা যেখানে সূর্য্যগ্নি বিদ্যুতের দীপ্তি নাই; তাহার নাম সূর্য্যারিক, অর্থাৎ তদ্বিস্ময়-পরম পদ। যথা—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, নেমা বিদ্যতঃ কুতোহঃমগ্নি রিতি শ্রুতিঃ।

সেই পরমাত্মা সৃষ্টিলীলা বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলে তদঙ্গিতাজ্ঞাতে সৃষ্টিকারিণী মায়া তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন, তাহাতেই মায়া-সম্ভব মহামোহ, মহাতম প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে মায়া শব্দে নিকষা।

সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে “কষ্ বিলোড়নে বিলোমেনে চোত। কঞ্চ নিকষতি নিকষা”।

কষ্-ধাতুতে বিলোড়ন ক্রিয়া, কখনও বা বিলোমন ক্রিয়াও

বুঝায়। নি + কন্ ধাতু, কৰ্তৃবাচ্যে অট্ প্রত্যয় করিয়.  
স্ত্রীলিঙ্গে “নিকষা” এই পদ সিদ্ধ হয়।

সুতরাং এ স্থলে নিকষা শব্দে জগদাকর্ষিণী এবং জগচ্ছিক্ত-  
কারিণী মায়া। বিশ্ব-শ্রবস পদে পরমাত্মা নারায়ণ, সেই  
দূরন্ত মায়াকে মহামোহ ও মহাতম নামে দুই পুত্র আর  
কলহকারিণী নিকৃতি নামে এক কন্যা প্রদান করেন। ঐ  
কন্যার নাম সূৰ্পনখা; আর মহামোহের নাম রাবণ ও মহা-  
তমের নাম কুম্ভকর্ণ খ্যাত হয়। অযাচিত পুত্র বিবেক,  
এখানে তাঁহার নাম বিভীষণ। অধ্যাত্ম-পক্ষে লঙ্কাদ্বীপ শব্দে  
দেহীর দেহকে বুঝাইবে; লঙ্কাস্বরূপে দেহ-বর্ণনার তাৎপর্য  
লইতে হইবে। যেমন স্ববর্ণময় লঙ্কাদ্বীপ লবণ সমুদ্র  
মধ্যে ভাসমান, সেইরূপ শোভন-বর্ণ-বিশিষ্ট জীবের দেহও  
সংসার-সমুদ্র মধ্যে দ্বীপবৎ ভাসমান হইয়াছে। লঙ্কা দ্বীপকে  
অধিকার করিয়া রাবণ কুম্ভকর্ণাদিরা বাস করিয়াছিল।  
সেইরূপ জীবের দেহকে অধিকার করিয়া মহামোহ, মহাতম  
ও নিকৃতি এবং বিবেক অবস্থিতি করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ,  
মদ, মোহ, মাৎসর্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও পৈশুন্য, মহা-  
মোহর এই দশ প্রধানঙ্গ। সুতরাং অঙ্গ সকলের মধ্যে  
মুখের প্রধানতা প্রযুক্ত রাবণকে দশানন বলিয়া উক্ত করিয়া-  
ছেন। ন্যায্যান্যায্যরূপে প্রত্যেক মুখে দুই দুই হস্ত কল্পনা  
দ্বারা বিংশতি হস্ত বর্ণনা হইয়াছে। অর্থাৎ কাম ক্রোধাদিরা  
বিহিতাবিহিত রূপে দ্বিবিধ কৰ্ম্ম করে। ন্যায় পূর্বক কামাদি

ক্রিয়া অর্থাৎ স্বদারোপভোগ, এবং অন্যায় পূর্বক পরদারোপ-ভোগাদি, উভয় কৰ্ম্মই মহামোহের অন্তর্গত হয়। যেখানে মহামোহের অধিষ্ঠান, সেখানে কোনক্রমেই ভদ্রতা নাই; অতএব রাবণকে সকলেই অহিতাচারী বলে। ঐ মহামোহ এতাদৃশ বলবান্ যে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালাদি ত্রিলোকস্বজন-মাত্রই তাহার বশীভূত; এই অভিপ্রায়ে রাবণকে ত্রিলোকজয়ী বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। হস্ত পদাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গণ মহামোহের অধীনে দেহস্থ সমস্ত কৰ্ম্ম করে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়গণকে দেষতা বলিয়া উক্ত করিয়া-ছেন। একারণ রাবণের আজ্ঞাধীন দেবগণ লঙ্কারীপে অধি-বাস করিয়া রাবণের নিয়োগে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা রূপক ব্যাজে বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র শব্দে আকাশ এবং আকাশ শব্দে কণ্ঠদেশ। স্ততরাং কণ্ঠ সন্নিহিত বাত্ময়গল ইন্দ্রাংশ স্বরূপ। তজ্জন্যই ইন্দ্রকে কণ্ঠভূষণ মাল্যগ্রন্থন কৰ্ম্মে নিয়োগ করার উক্তি আছে। সূর্য্যশব্দে চক্ষু, চক্ষুর অবলোকনশক্তি, অতএব সূর্য্যকে পুরীদর্শক দ্বারপালস্বরূপ বলিয়াছেন। পবন অর্থাৎ বায়ু দেহবিশোধক, একারণ তাঁহাকে পুরী শোধনে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বরুণ দেহ-মার্জ্জক, এজন্য বরুণকে রাবণের মন্দির মার্জনার্থ নিযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমসংজ্ঞক অপান বায়ু দেহবিনাশক, মহামোহ তাহারও দুর্দর্শ। এজন্য জঘন্য রূপে বর্ণনা করিয়া যমকে অশ্বেষ

যবসাহরণ কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। চন্দ্র সর্ব সন্তোষ-  
 কারক, চন্দ্রই দেহের উপরিস্থ মস্তকে ক্রীদলমধ্যে মনোরূপে  
 সংস্থিত। পরকাল-পরাঙ্কু মহামোহের অধীনে জীব সকল  
 বিষয়ালোচনায় সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করে। একারণ  
 লঙ্কাতে নিত্য পূর্ণচন্দ্রোদয় বর্ণিত হইয়াছে। মহামোহ  
 মনকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, মনঃ বন্ধিগু  
 লোকের ছত্রধারক ভূত্যস্বরূপে অনুগামী হয়। চন্দ্রাখ্য  
 মন মহামোহের অনুগত, তজ্জন্য রামায়ণে চন্দ্রকে রাবণের  
 ছত্রধারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জগৎশ্রুতি বিধাতা বেদবক্তা;  
 যেমন পিতা পুত্রগণকে ইতিহাসচ্ছলে উপদেশ দেন, সেইরূপ  
 ব্রহ্মা পুত্রগণকে অর্থাৎ মানবগণকে বেদের উপদেশ দিয়া  
 থাকেন। এই হেতু ব্রহ্মাকে লঙ্কায় শিশুপাঠনায় নিযুক্ত বলিয়া  
 বর্ণন করিয়াছেন। লঙ্কাস্থ জীবদিগকে ব্রাহ্মণ অথচ রাক্ষস বলার  
 তাৎপর্য্য এই যে, উহারা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এজন্য ব্রাহ্মণ  
 শব্দের বাচ্য; আর রাক্ষস পদে জগদ্রক্ষক; অতএব জগদ্-  
 গ্রাসিনী মহামায়ার উদরে জন্ম গ্রহণ জন্য রাক্ষস বলা হইয়াছে।  
 কিন্তু, মহামোহ ও মহাতম, ইহারাও জগৎকে গ্রাস করি-  
 য়াছে, এপক্ষেও রাক্ষস শব্দের বাচ্য না হইবে কেন? বিশেষতঃ  
 মহাতম কুস্তকর্ণ সাক্ষাৎ অহঙ্কারমূর্তি, অহঙ্কার জগদ্-  
 গ্রাসক হয়, তজ্জন্যই কুস্তকর্ণ, জন্মকালাবধি দেবতীর্থ্যকে নর-  
 অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদিকে গ্রাস করিয়াছিল; ইহা  
 রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। অহঙ্কার জগৎ-ব্যাপক, এজন্য



কুম্ভকর্ণকে বৃহদাকারে বর্ণনা করেন। স্বপ্নাধার লক্ষায় কুম্ভকর্ণকিরূপে বাস করিয়াছিল ? - অজ্ঞেরা যে এই আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহার খণ্ডন এই যে, অল্পাধার লক্ষাখাদেহে ত্রিলোক গ্রাস কর্তা অহঙ্কার অবস্থিতি করিতেছে, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র ব্যাপার নহে। ফলিতার্থ অহঙ্কারের তুল্য বৃহৎ পদার্থ ত্রিজগতে আর নাই। অহঙ্কারে উন্নত হইলে জীবগণ সর্বদা অভিভূত ও মূচ্ছিত থাকে। ইহা দেখাইবার জন্য অহঙ্কারের রূপ বর্ণনা করিয়া কুম্ভকর্ণকে দীর্ঘনিদ্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহঙ্কারী জীব জগৎকে তৃণতুল্য দেখে, ইহা রামায়ণে কুম্ভকর্ণের বক্তৃত্তাতেই প্রকাশ আছে।

মোহাকূট ব্যক্তির সম্যক জ্ঞানের অপহরণ হয়; তজ্জন্যই মহামোহরূপ রাবণ কর্তৃক জ্ঞানস্বরূপা মহাবিদ্যা সীতাহরণ ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। শরীরমধ্যে সন্তোষের নাম নন্দনবন, সেই নন্দন বনকেই এখানে অশোক বন বলেন। তাহাতেই বিদ্যার স্থিতি; কিন্তু মহামোহের দাসী স্বরূপা কুমতি, ঈর্ষা, অসূয়া, প্রভৃতি সেই সন্তোষ কাননে বিদ্যাকে মহামোহের বশে আনিবার নিমিত্ত সদাই উপদেশ দেয় এবং ভয়প্রদর্শনার্থ বিবিধ যন্ত্রণা-জালে আবৃত করে। এস্থলে, লক্ষাধীপে অশোক কাননে সীতাদেবী দুর্মুখা, দুর্মতি, ত্রিজ-টাদি চেড়ীগণ কর্তৃক সতত রক্ষিতা ও ভৎসিতা হইয়া-ছিলেন। কিন্তু বিবেকপত্নী স্তমতি কখন কখন বিবেকানু-শাসনে জ্ঞানের উদ্দাপন করেন। এস্থলে বিভীষণানুমতিতে

‘তৎপত্নী সরমা অশোক বনে মধ্যে মধ্যে সীতার পরিচর্যা করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার দ্বারা ইহাই উপ-  
দিষ্ট হইয়াছে যে, মহামোহে আকৃষ্ট হইলে জ্ঞানের অপহরণ হয় ও তাহার ক্ষুণ্ণতা থাকে না।

জ্ঞান কাণ্ডে বিবেকের সহচর সাধন-চতুষ্টয়; বিভীষণেরও সুবাহু, সুমুখ, সুভদ্র, সুকেতু প্রভৃতি সচিব চতুষ্টয় ছিল। এক শরীরে মহামোহ ও বিবেক বাস করেন এবং ঐ উভয়ে এক মায়াগুণেই উৎপন্ন। এখানে বিভীষণ ও রাবণ উভয় সহোদরের এক লঙ্কাদ্বীপেই অধিবাস; কিন্তু উভয়ে অরিভাবাপন্ন ছিল। মহামোহ কেবল বিষয় দর্শন করে; বিবেক শুদ্ধ পরমার্থ পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এখানে রাবণ সীতা-সম্ভোগে মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু বিভীষণ নিষেধ করিয়া ছিলেন। মহামোহ সর্বদাই বিবেকের পীড়াদায়ক, একারণ বিবেক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়া সাধন চতুষ্টয়ের সহিত অথগু সুখপ্রদ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন; এস্থলে বিভীষণও রাবণ কর্তৃক পদাঘাতে পীড়্যমান হইয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অথগু সুখপ্রদ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন। আসনাদি ষড়ঙ্গ যোগ বেদোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের প্রাতি কারণ; অর্থাৎ আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ষড়ঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানের সাধন। এখানেও ষড়ঙ্গ যোগরূপ স্ত্রীবাদি ছয় কপি, বিদ্যারূপা সীতার উদ্ধারের প্রাতি কারণ বা সাধন হইয়া

ছিলেন। যেমন ষড়ঙ্গ যোগযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যাত্মক দোষ-রাশির বিনাশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানশক্তি সীতার উদ্ধারের প্রতি-বিলম্বৎ রাক্ষস সমূহ ঐ কপিকুল দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। একাগ্রচিত্ততার নাম সমাধি, অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার অভেদ ভাবনাকে সমাধি কহে। এস্থলে স্ত্রীগ্রীব নামক কপি সমাধিস্থানীয় বলিতে হইবে। কারণ স্ত্রীগ্রীব ও রামে অভেদ্য ভাব ছিল। যিনি নল, তিনি আসন-স্থানীয়। আসনস্থ যোগীর আসনই ভবসমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ; একারণ নল দ্বারা সেতু-বন্ধন প্রস্তাব কথিত হইয়াছে। অগ্নিস্বরূপ নীলবানর প্রত্যাহার স্থানীয়। যে সাধক প্রত্যাহারপরায়ণ হয়, সে মহামোহের শিরোপরি পদাঘাত করিতে সক্ষম, একারণ নীল বানর রাবণের দশ-শিরোপরি পদাঘাত এবং শক্রমূত্রাদি ত্যাগ করিয়াছিল,—রামায়ণে ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। পবনপুত্র হনুমান প্রাণায়াম স্বরূপ। প্রাণায়ামের অপরিসীম ক্ষমতা।

“প্রাণায়ামৈদং দোষান্নিত্যাগি শ্রুতঃ।”

প্রাণায়াম দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাবরোধক দোষ সকল দৃষ্ট হয়। একারণ জ্ঞানশক্তি সীতার রোধক রাক্ষসচয়ের বিনাশ জন্য হনুমান প্রথমেই লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিলেন। বিনা প্রাণায়ামে কখনই জন্ম-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান পদবী দর্শন করিতে পারে না; এই হেতু প্রাণায়াম যোগস্বরূপ হনুমান শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে লঙ্ঘন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ সীতার উদ্দেশ

করিয়াছিলেন। প্রাণায়ামী ব্যক্তিই যে পরমাত্মার বিশেষ পরিজ্ঞাত অর্থাৎ অনুগৃহীত ও স্ববর্ণত্বমিলিত প্রণবই যে পরমাত্মার স্থায়ী ধন, ইহা জানাইবার জন্য পরম-রাম-ভক্ত হনুমান চিহ্নার্থ রামের স্ববর্ণাঙ্গুরীয়ক লইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাত্মপক্ষে স্ববর্ণ শব্দে প্রকৃত স্বর্ণ নহে ; শোভন বর্ণকে স্ববর্ণ বলে। এস্থলে অকার, উকার ও মকার এই স্ববর্ণত্ব মিলিত হইয়া প্রণব রূপ অঙ্গুরীয়ক উৎপাদন করে। ঐ প্রণব প্রাণায়াম-জপসংখ্যার বীজ, এবং প্রণবাবলম্বী ব্যক্তিই পরমাত্মার স্থায়ী জন; একারণ শ্রীরামের অঙ্গুরীয়ক দৃষ্টে সীতা দেবী হনুমানকে রামের নিজজন বলিয়া জানিয়াছিলেন। অঙ্গদ কপি ধারণা-যোগ-স্বরূপ। ধারণা যোগের নিকট মহামোহ নিরন্তর তিরস্কৃত থাকে ; এস্থলে লঙ্কার মধ্যে অঙ্গদ কর্তৃক অপহৃত-মুকুট রাবণ তিরস্কৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধ্যান-যোগীর শরীরে কোন রোগোৎপত্তি হয় না, হইলেও তাহা ধ্যান প্রভাবে বিনষ্ট হয় ; তজ্জন্য রামায়ণে ধ্যান-যোগ-স্বরূপ অসেন বানরকে বৈদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যক্ষরাজ জাম্ববান অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে ধীযোগ-স্বরূপ। মেধাবী যোগীর নিকট মহামোহাদির মন্ত্রকৌশল বিফল হইয়া যায় ; এস্থলে জাম্ববান মন্ত্রিকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাবণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, যে হেতু তত্বল্য বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। মহামোহের শক্তিতে জীবের হৃদয় বিদ্ধ হয় এবং জীবগণ সেই বেদনায় অভিভূত থাকে ; এখানে

সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে বিদ্ধহৃদয় হইয়া মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অপরন্তু মহামোহ হইতে উৎপন্ন লোভ অতি বলিষ্ঠ, তাহার নিকট সকলেই পরাজিত—অন্যে পরে কা কথা, দেবাদিদেব দেবরাজ ইন্দ্রও লোভের নিকট পরাজিত আছেন। তজ্জন্য লোভস্বরূপ রাবণের পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রজিত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেহী মাত্রেয় দেহেই লোভ আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান জীব তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলেই লোভের পরাজয় গণ্য হয় ; এস্থলে সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণে উক্ত হইয়াছে। মায়াভ্রুজা নিকৃতি কলহরূপিণী। যাহার দেহে তাহার অধিষ্ঠান হয়, সে দেহীর নিরন্তর কলহ দ্বারা শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং সেই শত্রু দ্বারা পরিণামে সকলই বিনাশ পায় ; এখানে নিকৃতিরূপিণী সূৰ্পনখা ভেদ প্রদর্শন দ্বারা রাম-রাবণে বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিল ; সেই বিরোধ জন্য লক্ষ্মাপতি রাবণ সমস্ত রাক্ষসকূলের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিল। মহামোহ সংশ্রবে হিরণ্যস্বরূপ জ্ঞানেরও মলিনতা জন্মে ; কিন্তু যোগাগ্নি জ্বালিতে পারিলে তাহার সে মলিনতা দূর হয়,—ইহা জানাইবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র রাবণগৃহস্থা জ্ঞান-শক্তি সীতাকে উদ্ধার করিয়াও অগ্নিতে পরীক্ষা লইয়াছিলেন। ভগবৎকৃপা ভিন্ন যে মহামোহ ও মহাতমঃ বিনষ্ট হয় না, সেই পরমতত্ত্ব জানাইবার জন্য

পরমাত্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র অবতার হইয়া রাবণ কুম্ভকর্ণাদিকে বিনাশ পূর্বক জ্ঞানশক্তির সহিত এবং জীবাত্মস্বরূপ লক্ষ্মণের সহিত স্বধামে গমন করিয়াছিলেন। স্বধাম পদে এস্থলে—

“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্”

সেই বিষ্ণুর পরম পদ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

রামাবতার-ঘটিত প্রস্তাবের সার মৰ্ম্ম এই। তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী হইলে, মোহ বা তমঃ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে মোহ বা অহঙ্কারের অধিবাস হয় না ; ইহাই রামায়ণের নিগূঢ় মৰ্ম্ম। এই বৃত্তান্তকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞজনে মনে মনে কত প্রকার কুতর্ক ও সন্দেহ উপস্থিত করে ; কিন্তু সুসমাহিত-চিত্ত সাধক ব্যক্তি এই রূপকাত্মক পরম তত্ত্বঘটিত রামাবতার বৃত্তান্ত মনন ও অনুষ্ঠান করিয়া মনে মনে পরেমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হন

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহারাসের মৰ্ম্ম।

মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি যতই সূক্ষ্ম হউক না, ঐশ্বরিক জগতের তন্ম তন্ম অনুসন্ধান দ্বারা যতই অভিজ্ঞতা লাভ হউক না, তথাপি পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি মানব, ঐশ্বরিক কার্যকলাপের সর্বতোভাবে মৰ্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিবে, ইহা বিবেচক ব্যক্তিদিগের কল্পনাপথেও উপস্থিত হয় না। পক্ষান্তরে বিচাররহিত অন্ধ-সংস্কার দ্বারা ধৰ্ম্মালোচনাও বিধেয়—বলিয়া

গণ্য হয় নাই। এই নিমিত্ত ঐশ্বরিক অবতার স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাঘটিত ব্যাপারের প্রকৃত মৰ্ম্ম যে পরিমাণে অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

সংসারে যখন এরূপ কোন বিপত্তি উপস্থিত হয় যে, মানবজাতি তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ নহে, তখন সৰ্ব্বসামঞ্জস্যকারী জগদীশ্বর কোনরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ পূৰ্ব্বক সংসারকে অনিবার্য্য বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন; শাস্ত্রে এ বিষয়ের বহুতর প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

“পরিভ্রাণয় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সত্ত্বামি যুগে যুগে ॥”

( ভগবদ্গীতা উপনিষৎ )

( ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে কহিতেছেন )—সাধুদিগের পরিভ্রাণ ও দুষ্কৃতিমান্ ব্যক্তিদিগের বিনাশ, এতাবত। ধৰ্ম্ম-সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

মূর্তি পরিগ্রহ করিলেই মূর্তিমান জীবের ন্যায় ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যকতা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। অতএব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যয়া।

( বেদান্তঃ )

আত্মা সৰ্ব্বগত, অনিৰ্ব্বচনীয়, মিরীহ, নিরঞ্জন ও নিৰ্ব্বিকার। কিন্তু তিনি মূর্তি পরিগ্রহকালে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় লীলা করেন।

অপিচ ।

“মায়্যা মোহিতাঃ সৰ্ব্বৈ জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ ।

কথমেবাং ভবেন্নোক ইতি-বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ ॥

কথাং প্রথয়িতুং লোকে সৰ্বলোকমলাপহাং ।

রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ ॥

ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ।

তত্ত্বং কামোচিতং গৃহ্ণন্ মোহয়তাবশাঃ প্রজাঃ ।

(অধ্যাত্মরামায়ণ)

অজ্ঞানাপন্ন জন সকল মায়া কর্তৃক মোহিত হইয়াছে । ইহাদিগের পরমাত্ম তত্ত্ব জানিবার কোন ক্ষমতা নাই । ইহারাকিরূপে মুক্ত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু রাম নাম ধারণ পূর্বক মনুষ্যরূপে অবতার হইয়া সৰ্বলোকের মানস-মলা পাপরাশির অপহরণের নিমিত্ত মনুষ্যচেষ্ঠা সমূহ দ্বারা লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত তৎকার্য্যের উপযোগীক্রোধ, মোহ ও কামাদি অবলম্বন করিয়া অবশীভূত ব্যক্তিদিগকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধি—এই হেতু প্রদর্শন দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, রাম তাহার কোন কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন না ; তিনি গগনসদৃশ নির্মল ।

সেই রূপ ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণও লোক পরিত্রাণার্থ নামা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু তিনিও আকাশবৎ নির্মল, তাঁহার রাসাদি লীলা দ্বারা সাংসারিক ও তত্ত্বজ্ঞান ঘটিত বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তন্নিষয়ে তাঁহার যে বিকারিষ্ণু তাহা সম্পূর্ণ ভাক্ত । তিনি সংসারধর্ম্মের উপদেশদ্বলে



দ্বারকালীলা ও পরমাত্মতত্ত্বোপদেশাঙ্কলে ব্রজলীলা প্রকটন করিয়াছেন।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাসলীলাতে গোপীশৃঙ্গার দ্বারা পরদারামর্ষণজ পাপ গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহাকে কিরূপে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে ? অন্যে পরে কা কথা,—পরীক্ষিতেরই এবিষয়ে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদিও কোন কার্য্য লৌকিক রীতি বিরুদ্ধ বোধ হয়, তথাপি তাহাতে পরমাত্মা শ্রী কৃষ্ণের অবতার হানি হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের পাপ পুণ্য কি ? তিনি সকলেই আছেন, তাঁহাতেই সকল আছে ; ঈশ্বরের কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নাই। প্রাকৃত লোকবৎ সদনং আচার দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যে যেমন দোষারোপ করা যায়, ঈশ্বরে সেরূপ দোষ বর্ত্তে না। যথা,

“বুদ্ধাঐতস্য তস্য যথেষ্টাচরণং বদি।

শূনাং তত্ত্বদৃশ্যৈব কোভেদোহুচিভক্ষণে ॥”

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও যদি যথেষ্টাচরণ বাসনা হয়, তবে অশুচিভুক কুকুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর বিশেষ কি থাকিল ? প্রকৃতপক্ষেও এতাদৃশ দৃষ্টান্ত ঈশ্বরবতার শ্রীরামশ্রীকৃষ্ণাদিতে কোনমতে বর্ত্তিতে পারে না। এ দোষ জ্ঞানসাধক ব্যক্তি বিশেষে সম্ভব হয়। যে পরমাত্মা সর্বদেহে বিরাজমান, তাঁহার শুচি অশুচি কি ? যিনি বিষ্ঠাসঙ্গত কুমিরও অন্তরাঙ্গা, তাঁহার আবার অশুচি ভক্ষণ বিষয়ে বাধা

কি থাকিল ? পরমাত্মা সর্বকারণস্বরূপ, সমস্ত-কার্য-স্বরূপ, তিনি সকলের হর্তা, কর্তা মহেশ্বর ও সর্ব ঈশান। সুতরাং ঐরূপ সামান্য ব্যতিক্রম দ্বারা কি তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে ? যে স্থলে সকল ঐশ্বর্য, সকল স্মৃতি ও সকল সংহিতাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে স্থলে মূর্তি গ্রহণের আনুষঙ্গিক ছুই একটি সাংসারিক ব্যবহারের দোষানুসন্ধান কবিয়া তদীয় অনীশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

“তস্যোদিতিনাম সত্ৰং সর্কেভ্যঃ পাপুভ্যঃ

উদিত উদেতি হবৈ সর্কেভ্যঃ পাপুভ্যঃ স এবং বেদ”।

(ইতি ছন্দোগ্য-উপনিষৎ)

স্বপ্রকাশ দেব পরমাত্মা পরম পুরুষ সকল পাপের সহিত অর্থাৎ পাপকার্যের সহিত উদিত হয়েন, সমস্ত শুভাশুভ কস্মকে অঙ্গীকার করেন ; কিন্তু তাঁহাতে কোন পাপই লিপ্ত হয় না।

বেদে আত্মাকে “অপহতপাপ” বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তিনি সকল শুভাশুভ কার্যের উৎপাদক, সংস্থাপক এবং সংহারক হয়েন ; অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে শুভাশুভ ও ধর্মাদর্শ দৃষ্টি করিয়া যে সাধক তাঁহাকে নির্লিপ্ত জানে, সেই বেদজ্ঞ। তাহাতে কোন পাপ স্পর্শ হয় না। যেমন সূর্য্যদেব সকল শুভাশুভ কার্যে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত, আত্মাও তদ্রূপ শুভাশুভ কার্যে লিপ্তবৎ থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন।

ফলিতার্থে ঈশ্বরবতার শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্যেই লিপ্ত নহেন।  
ইহাতে আশঙ্কা মাত্র নাই। পাপকার্য্য যে দেবতাদিগের  
প্রতি বর্তে না, প্রতিশাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট আছে। যথা,—

“স্বর্ঘ্যো যথা সর্বলোকৈকচক্ষু

ন লিপ্যতে চাক্ষুৰ্ব বাহ্যদোষৈঃ।

একতথা সর্বভূতান্তরাহ্মা

ন লিপ্যতে শোকহুঃখেন বাহ্যঃ ॥”

যেমন সর্ব লোকের চক্ষু স্বরূপ সূর্য্যদেব স্বকর বিস্তারে  
এতজ্জগতে চাক্ষুয পবিত্রাপবিত্র সকল বস্তু স্পর্শন করিয়াও  
মনুষ্যবৎ অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ সর্ব জীবের অন্তরাহ্মা  
এক পরমাত্মা শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্ম স্পর্শ করিয়াও তাহাতে  
লিপ্ত নহেন। তদর্থে রাসপঞ্চাধ্যায়ে পরীক্ষিৎ-প্রশ্নে শুক-  
দেব কহেন,—

“ধর্ম্ম ব্যতিক্রমোদৃষ্ট

ঈশ্বরগাণ্ড সাহসং।

তেজীয়সাং ন দোষায়

বহুঃ সর্বভূজো যথা।

অতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে  
কার্য্য ও কর্ম্মাদিতে লিপ্ত বিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে মূর্থতাই  
প্রকাশ পায়। যিনি মৃত পুত্রকে জীবিতরূপে আনয়ন দ্বারা  
সান্দীপনীকে সান্ত্বনা করেন, যিনি বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জু-  
নের মোহ বিধ্বংস করেন, যিনি যশোদাকে নিজ মদনে

ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করান এবং যিনি রাসস্থলে বহুসংখ্যক মূর্তি ধারণ করেন ও শত কোটি স্ত্রীর মনোরঞ্জন করেন, তাঁহাকে কদর্য্যাচারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, হতজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হয়। যখন “নিত্যং সদসদাত্মকং” বলিয়া তাঁহাকে সর্ববেদে উক্ত করিয়াছেন, তখন আত্মাতে সকল শুভাশুভ কর্ম প্রোথিত আছে, ইহাতে সংশয় কি? কিন্তু যদি আত্মাতে কেবল শুভকর্মাচরণের অবস্থিতি, কোন মতে অশুভ কর্মের অবস্থান নাই,—এরূপ বোধ করা যায়, তবে অশুভকর্ম সকলের অবস্থান কোথায়? ফলতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা একবারে পরমেশ্বরের অদ্বৈততা খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, সেরূপ হইলে, পাপ-কর্মের উৎপাদকরূপে পরমেশ্বরান্তর মান্য করিতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে পুণ্যবানের আত্মা স্বতন্ত্র, পাপাত্মার আত্মা স্বতন্ত্র,—কল্পনা করিতে হয়; অর্থাৎ বিট্‌কুমি প্রভৃতি নিকৃষ্টাচারী জীব ও পবিত্রাচারী ব্যক্তির ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হন, এরূপ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যে কত প্রকার বিপ্লুত ভাবের উদয় হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতেছে। অতএব এক পরমাত্মাতে অগ্নি ও তম্বির্বাপক জল, অমৃত এবং বিষ, হিংস্রকতা ও অহিংস্রকতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও অজিতেন্দ্রিয়তাদি শুভাশুভ সকল কর্মই অবস্থিতি করে; কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে লিপ্ত নহেন; এইরূপ মীমাংসাই যারপর নাই যুক্তিসঙ্গত। ফলিতার্থ উক্তয়াত্মক ঈশ্বর, এই জ্ঞানই মোক্ষের পরম কারণ। ইহা

দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সদসংকার্য্য পরিগ্রহ করিয়া আপ-  
নার অখণ্ডতা বোধ করাইয়াছেন ।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, ঈশ্বরের  
পক্ষে শুভাশুভ সকল কার্য্য সমান হইলেও, উৎকৃষ্ট উপায়  
দ্বারা সংসারের হিতসাধনের চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বরাবতার  
শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত জঘন্য শৃঙ্গাররস অবলম্বন পূর্ব্বক হিত-  
সাধনের চেষ্টা পাইলেন ?

তদ্বিশেষে বক্তব্য এই যে,—ভাগবতের রাসলীলা-বিষ-  
য়ক বর্ণনার মধ্যেই এতাদৃশ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর বিদ্যমান  
রহিয়াছে । রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে,—

“সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়তরস্য চ ।

অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥

স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা ।

প্রতীপমাচরত্বক্ষন্ পরদারাভিমর্ষণং ॥”

অর্থ । ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্তই  
জগদীশ্বর আপন অংশদ্বারা অবতীর্ণ হইলেন । সেই ঈশ্বর-  
বতার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়া  
কিরূপে পরদারাভিমর্ষণ রূপ প্রতিকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান  
করিলেন ?

তদুত্তরে পরম জ্ঞানী শुकদেব বলিয়াছেন যে,—

মূল ।

“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মাদৃশং দেহমাপ্রিতঃ ।

ভক্ততে তাদৃশী ক্রীড়া বাঃ শ্রদ্ধা তৎপরোত্তবেৎ ॥

## টীকা ।

“শৃঙ্গাররসাক্ষেপেভ্যো বহিঃস্থানপি  
স্বপরান্ কৰ্ত্তুমিতি ভাবঃ ।”

তাৎপর্যার্থ ।

শৃঙ্গাররসের সম্ভোগ ঈশ্বরের প্রয়োজন নহে । যাহাদি-  
গের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিতান্ত বলবতী, সুতরাং যাহারা ধৰ্ম্মানু-  
ষ্ঠানবিমুখ তাহাদিগকেও ঐ জঘন্য কার্যের মধ্যে ধৰ্ম্মপথে  
আনয়ন করাই শৃঙ্গার রস অবলম্বনের উদ্দেশ্য ।

অপরন্তু মহৎ লোকে যেরূপ আচরণ করেন, সামান্য -  
লোকে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে । সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃ-  
ষ্ণের গুণতাৎপর্য না বুঝিয়া লোকে ঐরূপ আচরণ দ্বারা  
উচ্ছিন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় লিখিত হইয়াছে যে,—

“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।

বিনশ্যত্যাচরন্ মোঢ্যাৎ যথা ক্রোধোহক্লিভং বিষম্ ॥”

তাৎপর্য ।

শৰ্কৰশক্তিমান্ জগদীশ্বর মানবের অগোচর উদ্দেশ্য সাধ-  
নার্থ এতাদৃশ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া অল্পশক্তি  
মনুষ্যগণ তাহা করিবেন না । এমন কি, মনেও কল্পনা করি-  
বেন না । কারণ ভগবান্ রুদ্রদেব যেরূপ শক্তিদ্বারা যেরূপ  
উদ্দেশ্যে সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত হলাহল পান করিয়াছিলেন, তাদৃশ  
শক্তিও তাদৃশ উদ্দেশ্য সহিত মনুষ্যগণ বিষপান করিলে যেমন

উচ্চিম হইবে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ঐশ্বরিক শক্তি রহিত মানবগণ কেবল নিকৃষ্ট প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে রাস ক্রীড়াদির অনুকরণ করিলে উচ্চিম হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদিগকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিবার বিষয়ে শৃঙ্গার রসের অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন, তাহার-  
দিগকে তাৎপর্য্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

শৃঙ্গার করুণা ইত্যাদি ছয়টি রস মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিতি করে।

কোনস্থানে কোন্ রসের অবস্থান, তাহারও নির্ণয় আছে। যথা—

শৃঙ্গারঃ শিরসি জ্যেয়ঃ

ক্রোধমাজ্জাপুরে তথা ।

বিষুদ্ধাখ্যেতু করুণাঃ

হৃদি ভীষণমেবচ ॥

মণিপুরেহন্তুতঃ হাস্যঃ

স্বাধিষ্ঠানে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

ইত্যাদি।

মস্তকে শৃঙ্গার রসের স্থান, জ্ঞানদলে রৌদ্ররস, কঠস্থানে করুণরস, হৃদয়ে ভয়ানক রস, নাভিমণ্ডলে অমৃতরস ও লিঙ্গ-  
মূলে হাস্যরস ইত্যাদি।

অতএব সহস্রারম্ভিত আত্মতত্ত্বকে শৃঙ্গার রসভাবে প্রকাশ-  
শান্তিপ্ৰায়ে শৃঙ্গারোদ্দীপন রাসলীলা প্রকাশ হয়। ইহা-

রই নাম মধুর ভাব। মধুর ভাবেই সকল ভাব সিদ্ধ হয়।  
 ঘেহেতু, আপাদতল পর্য্যন্ত সমস্তাবয়ব এক মস্তকের অধীন,  
 তজ্জন্য শাস্ত্রে মধুরভাবে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ  
 করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বই শ্রেষ্ঠ হয়। এস্থলে স্ত্রী-  
 সম্ভোগকে মধুর রস বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, এমত তাৎ-  
 পর্য্য নহে। আত্মাকে শান্ত, দাম্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর  
 এই পঞ্চভাবে উপাসনা করিবার যে অনুশাসন আছে, তাহার  
 প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য জানিতে পারিলেই ভ্রান্ত জীবের  
 ভ্রান্তির শান্তি হয়। শান্ত্যভাবের অর্থ ঐকান্তিকী নিষ্ঠা;  
 দাম্যের অর্থ সেবা করণ; সখ্যের অর্থ সমতা অর্থাৎ সমাধি-  
 যোগ; বাৎসল্যের অর্থ স্নেহ; মধুরের অর্থ আত্ম নিবেদন।  
 স্ততরাং আত্মশরীর পরমাত্মাতে সমর্পণ করার নাম শৃঙ্গার-  
 ভাব। অতএব যে সাধক আত্মাতে আত্মসমর্পণ করে, সে  
 তন্ময় হয়। ইহা উপদেশ দিবার নিমিত্তই ভগবচ্ছক্তি  
 শ্রীরাধিকা রাসাবেশে পরতত্ত্বের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।  
 তদ্ব্যাপ্তে জ্ঞানশক্তি পরা প্রকৃতির শাখা, অনসূয়া, ক্ষমা,  
 অহিংসা, দয়া, শাস্তি, ধৃতি, স্মৃতি ও মেধা এই অষ্ট মাতৃকা  
 প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র সংখ্যায় পরিগণিত। এ দিকে নিবৃত্তি-  
 মার্গস্থা পরাশক্তি রাধিকারও বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, ইন্দু-  
 রেখা, তুঙ্গবিদ্যা, চিত্রা, চম্পকলতা, অশোকা ইত্যাদি  
 ষোড়শ সহস্র গোপীসংখ্যারূপে গণ্য। যিনি বৃন্দা, তিনি  
 অনসূয়া, অর্থাৎ তাঁহাতে অসূয়া নাই, ইহা শ্রীকৃষ্ণ মিলনে



সকলের সম্যক গুণ বর্ণনাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যিনি বিশাখা, তিনিই ক্ষমা, যেহেতু এক মাত্র উত্তমা শাস্তিই ক্ষমা-পদবাচ্য। তাহার অন্য সহায় নাই, বিশাখাও উভয়ের শাস্তি বিধান করেন, অন্য গোপীর সাহায্য অপেক্ষা করেন না। যিনি ললিতা, তিনি অহিংসা; যে হেতু ললিতা গোপীর রেষপৈশুন্য ছিল না। যিনি ইন্দুরেখা, তিনিই দয়া; কারণ চন্দ্রমণ্ডলস্থা নাদশক্তি অর্থাৎ দয়া সমস্ত জীবে সুধাবর্ষণ করিয়া শাতলতা প্রদান করেন; ইন্দুরেখাও সুধাবর্ষণবৎ মিস্তি-ভাষা প্রয়োগে সকলের চিত্ত শীতল করেন।

তত্ত্বশাস্ত্রে অপরা শক্তি অবিদ্যা; তিনি আপন শাস্তাস্বরূপ ঈর্ষা, অসূয়া, অক্ষমা, হিংসা, তুষ্টি, পুষ্টি, সন্নতি ও রতি প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র বৃত্তির সহিত সহস্রারস্থ পরমাত্মাকে প্রবৃত্তিরূপ আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে প্রবৃত্তি-মার্গস্থা অপরা প্রকৃতি চন্দ্রাবলী নাম্নী গোপীও চন্দ্রাবতী, চন্দ্রমালা, প্রিয়চন্দ্রা, মধুমতী, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রমাতুলী, সুন্দরী ইত্যাদি সখীগণ সহিত বিদ্যাস্তের বিপরীত-বর্ত্তিনী হয়েন। স্ততরাং এক আত্মাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত, উভয়েই পরস্পর বিপরীত পথে গমন করেন। যেমন নিকাম কর্মের অনুগামিনী পরা বিদ্যা নিরন্তর আত্মরসে ক্রীড়মানা, সেইরূপ অপরা বিদ্যাও সকাম কর্মমার্গে স্থিতি করিয়া কদাচিৎ খণ্ড-সুখার্থ আত্মাকে লাভ করেন। যদ্রূপ পরাশক্তি ত্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কাগনাতে অন্তরঙ্গ-রসে নিয়ত কৃষ্ণসমি-

ধিতে বাস করিতেছেন, তদ্রূপ অপরাশক্তি চন্দ্রাবলীও আত্ম-  
স্থখাভিলাষে রাধিকার অনবলোকনে কদাচিৎ কৃষ্ণ-সন্তোষ  
করেন।

অপরন্তু দ্বারকাবাসিনী অপরাশক্তি-সমাপ্তিতা মহিষীগণও  
যে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়া পুত্রাদি স্থখ সম্পত্তি  
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সন্ধ্যাসাধক-  
গণ নানা কন্মের সমাচরণ করিয়া আত্মার প্রসন্নতাতে নানাবিধ  
সংসারোচিত খণ্ড স্থখ-ভোগ করিয়া থাকে, তাহা দেখাইবার  
নিমিত্ত মহিষীগণের প্রেমভক্তির প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।  
ফলতঃ আত্মা ভিন্ন কেহই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না।  
যে হেতু শ্রুতি শাস্ত্রে আত্মাকে “সৰ্ব্বকামপূর” বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

“একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।”

যিনি এক, কিন্তু বহুজনের বহুবিধ কামনা পূরণ করেন,  
অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপে ভাবনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল  
প্রদান করিয়া থাকেন।

আত্মাকে যেমন কামী বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ  
শ্রীকৃষ্ণও এক হইয়া অনেকের অনেক কামনা পরিপূর্ণ করি-  
য়াছেন ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে কামে লিপ্ত বলা যায় না, এবং  
শ্রীকৃষ্ণের আত্মতা খণ্ডনও হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে দ্বারকাদি-লীলা যাহা বর্ণিত হইয়াছে ; সে সম-  
স্তই মায়ার কার্য্য ; শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই। লৌকি-

কাচারেও রাসস্থলে ইন্দ্রজাল খাটাইয়া থাকে ; সুতরাং রাস-নাট্য যে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি অনন্তাখ্য সঙ্ঘর্ষণ তিনিই জীব, এখানে তাঁহাকে বলরাম বলে। তিনি সখাভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সহ ক্রীড়া, করেন। শ্রীদামাদি অন্যান্য গোপমকল শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন। উদ্ধব-অক্রুর প্রভৃতি, অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যাস্বরূপ। আত্মতত্ত্ববিরোধী অশ্বরবৎ কেশী-কংস-মূর-নরকাদি মহামোহাদি স্বরূপ। মায়াজ্জা পূতনা নিকৃতি স্বরূপ। নন্দকে দ্রোণবস্ত্র বলাতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রতিপালক বলা হইয়াছে। কারণ ( গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণ ) সুতরাং গোপশব্দে ধর্ম্মরক্ষা-পরায়ণ। যশোদা ধরা, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়-ভূতা, ইত্যর্থ্যেই তাঁহাকে নন্দ-পত্নী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সম্যকরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানোদয় হয়, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দালয়ে উদয় হইয়াছিলেন। সকাম সাধন ফলেও প্রথমতঃ ক্লেশ পাইয়া পরিণামে আত্মতত্ত্ব লাভ হয় ; তদৃষ্টান্ত এই যে, বসুদেব ও দৈবকী বহুক্লেশ সহ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন।

বলাসন অর্থাৎ কফ, আত্মতত্ত্ব-বিদ্বেষকারী ভুজঙ্গ স্বরূপ। উহা পিঙ্গলা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া প্রাণায়াম-যোগ-বিন্ম দ্বারা পিঙ্গলাকে বিদূষিতা করে ; কিন্তু সাধকের মানসে আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়া সেই বিষবৎ বিন্মস্বরূপ বলাসনকে দ্বীপান্তরে দূরীকৃত করেন ; অর্থাৎ সেই ভুজঙ্গ রমণক দ্বীপবৎ

অসাধক ব্যক্তির হৃদয়কেই আশ্রয় করে। ইহা জানা-ইবার নিমিত্ত “কালীয় দমন” ব্যাপারের সংঘটন হইয়াছে। এস্থলে যোগবিন্ধবিষ কক, কালীয় হৃদয়, পিঙ্গলা যমুনা ; পর-মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ; রমণক দ্বীপ অসাধু-হৃদয় ইত্যাদি স্ফুটীকৃত হইয়াছে। অতএব রূপকাচ্ছাদনের অপনয়ন করিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমাত্মা, তাহাতে বিচক্ষণ সাধকের কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

বাহ্যে বৃন্দাবন, রাসমণ্ডল ও গোপীগণ এ সৰুলই অধ্যাত্ম-বিষয়াক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ ভগবান্ নারায়ণমনুষ্যশরীরস্থ তাবৎ তত্ত্ব পরিজ্ঞাপনার্থ রাসলীলা ব্যাজে মানবশরীরকে বাহ্যে বৃন্দাবনধামরূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্য মাত্রকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—“আমার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করা জীবের সাধ্য নহে, আমার এই মাধুর্য্য-লীলা শ্রবণে জীবগণ কৃতার্থ হইবে।” ইত্যাদিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছা-শক্তি রাধিকায় প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। সেই পরাশক্তি রাধিকাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। চিন্ময়, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিরীহ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই। তিনি নির্লিপ্ত, অতি স্বচ্ছ ও নিৰ্ম্মলস্বরূপ। যেমন স্বচ্ছ-স্ফটিক-সন্নিধানে রক্তবর্ণ কোন বস্তু থাকিলে তাহার রক্ত-মাতে তৎকালে অতিশুদ্ধ স্ফটিককেও রক্তবর্ণ বোধ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। রাসলীলাস্থলে লিখিত হইয়াছে যে,—

“ যোগমায়া মুপাশ্রিত । ”

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াতে সমাশ্রিত হইয়া রাসলীলা করিয়াছেন ।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব নাই; কেবল যোগমায়াই সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন । অর্থাৎ আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যোগমায়া-বিলসিত রাসাদি লীলা প্রকাশিত হইয়াছে । তথাহি, যেমন নটদিগের রঙ্গভূমিতে মায়া অর্থাৎ ভেল্‌কী দ্বারা অন্বরূপে স্বরূপবৎ দৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাসস্থলে মহানটী যোগমায়া রঙ্গভূমি সাজাইয়া আপনকৃত লীলাকার্য্য-সকল শ্রীকৃষ্ণ করিলেন, ইহাই সর্বলোককে জানাইয়াছিলেন । ঐ যোগমায়া রাধিকা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জীবশরীরে শিরোহবস্থিত সহস্রদল-পদ্ম গোলোকাখ্য মহদ্ধাম । পরমাত্মা তাহাতেই নিত্য রাস করিতেছেন । সমস্ত পৌর্ণমাসী তিথিতে রাস হইবার তাৎপর্য্য এই যে ;—প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার রাত্রি-পরিমাণ । যাবৎ প্রলয় না হয়, তাবৎ রাস হইতেছে । তজ্জন্যই ভাগবতে লিখিত হইয়াছে, যে,—

“ ভগবানপি তা রাত্রীঃ । ”

ভগবান্‌ও সেই সকল রাত্রি ( এইরূপে অতিবাহন করিলেন ) শাস্ত্রে একবিধ যাবতীয় জীবের কলেবর নাশ-কালকে প্রলয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ; সুতরাং রাসক্রিয়ার কাল, কোটি কোটি ব্রহ্মরাত্রি বুঝাইতেছে এবং রানেরও নিত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে ।

“ব্রহ্মরাত্র উপায়ন্তে” এই বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবশক্তি সকলে স্ব স্ব দেবের দেহমধ্যে বিলীন হইলেন। কিন্তু অপর জীবের শরীরে রাসের বিরাম নাই। লীলা শব্দে প্রাকৃত লোকেরা যে, প্রাকৃত শৃঙ্গারাদি ক্রিয়াপর রাসলীলা বর্ণন করে, স্বরূপতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে তাহা সহে। নিগূঢ় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে গুণবৎ ক্রিয়ার বর্ণন, তাহা ভান্ত—

“ঈক্ষিতে নী শব্দঃ।”

(বেদান্তম্।)

তাহার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মচিন্তকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন যে, প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা এবং প্রকৃতিই সর্ব্ব জীবের বন্ধন-মোচনী হয়েন। একারণ, পরমাপ্রকৃতি যেমন জীবদিগকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন, তেমনই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত বাহ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বকে মূর্ত্তিমান করিয়া উপদেশ দিতেছেন; অর্থাৎ পরমাত্মাকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে সাজাইয়া রাস-বিলাসাদি নানা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল লীলার কথা শ্রবণ মননে জীবের পরমা-গতি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য পুরাণাদিতে শ্রীবৃন্দাবনকে গোলকের ছায়া বলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবনধাম শিরঃস্থিত অধো-মুখ সহস্রদল কমলাখ্য গোলোকমণ্ডলের প্রতিবিম্বস্বরূপ। যথা,—

“সহস্রপত্র কমলং ধ্যায়ং মাথুরমণ্ডলং ।”

( পদ্মপুরাণং । )

মাথুর মণ্ডলকে সহস্রদল কমলবৎ চিন্তা করিতে হইবে ।  
যজ্ঞপ শিরঃসহস্রপত্রের দল সকল অধোমুখ, তজ্ঞপ বৃন্দা-  
বনস্থ তরুগণেরও শাখা সকল অধোমুখী । যথা,—

“ বৃন্দাবনস্থ্য গুরবঃ সর্কে চাধোমুখোঃ স্মৃতা । ”

যেমন শিরঃস্থিত অধোমুখ কমলীভ্যন্তরস্থ দ্বাদশ দল  
পদ্মান্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান, তজ্ঞপ বৃন্দাবন  
মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসনরূপ দ্বাদশ বন আছে । তথাহি—

“ ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীকহোদরে নিত্যলগ্ন মন্দাত মডুতঃ ।

কুণ্ডলী-বিবরকাণ্ড-মণ্ডিত দ্বাদশার্ণ সরসীকহং ভজে ॥ ”

ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সহস্রদল কমলোদরে নিত্যলগ্ন পরম  
বিশদ বর্ণ, অত্যুদ্ভূত শোভাবিশিষ্ট এবং কুণ্ডলীশক্তির বিবর  
কাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা দ্বারা মণ্ডিত দ্বাদশদল পদ্মকে আমি  
ভজনা করি । কারণ তথায় আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান হয় ।

বৃন্দাবনেও সহস্রবন মধ্যে দ্বাদশ বন প্রধান আছে ;  
তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাধিষ্ঠান । যথা—

দ্বাদশৈব বনী-সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ।

পূর্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাণ্ডি গুহা মুক্তমং ॥

অন্যোচ্চো পবনং প্রোক্তং কৃষ্ণকীড়াবস স্থলং ॥

( পদ্মপুরাণম্ । )

প্রধান বনসংখ্যা দ্বাদশটী । যমুনার পশ্চিমে সাত, পূর্বে

পাঁচ। তাহাতে অতি গোপনীয় পরমোত্তম তত্ত্ব আছে। অর্থাৎ অতি গূঢ়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য আত্মার নিত্যাদিষ্ঠান তাহাতে আছে। অন্য যে সকল উপবন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-রসের স্থান।

পৌর্ণমাসী দেবী সেই বৃন্দাবনাখ্য পদ্মের মূলকাণ্ড হয়েন। যজ্ঞপ সহস্রার-মধ্যে শিরঃস্থিতাখ্য বিরজা-শংখিনী-নাড়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অকথাপি ত্রিরেখারূপে বিদ্যমান, তজ্জপ বৃন্দাবনে যমুনাও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। পরমাত্মা যেমন সর্ববশক্তিমান, অর্থাৎ উরু শক্তিতে পরিবেষ্টিত, শ্রীকৃষ্ণও তজ্জপ উরুশক্তিমান, বৃন্দাবনে গোপীগণে মগ্নিত। আত্মা যেমন কোন কার্যাই করেন না, প্রকৃতি হইতে সকলই হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ কিছুই করেন নাই, গোপীরাই সকল কার্য্য করিয়াছেন। অজ্ঞ লোকেরাই বলে যে, শ্রীকৃষ্ণ নরবৎ নানা লীলা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। শক্তিগণকে এই নিমিত্ত গোপিকা বলা যায় যে,—গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণ; সকলকে যে প্রকৃতি রক্ষা করেন; তাঁহার নাম গোপিকা। নতুবা সামান্য গোপপত্নী বলিয়া গোপিকা বলা হয় নাই। আত্মার সভায় জগৎ রক্ষিত হইয়াছে, এনিমিত্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে গোপ-বেশে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ জীব-শরীরে আত্মার ও শক্তিগণের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত শরীর রক্ষা হইতেছে। কান্তি, শান্তি, ক্ষান্তি, দয়া, মেধা, স্মৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মনতি প্রভৃতি শরীর-রক্ষণকারিণী শক্তিসকল গোপারূপা;



আর আত্মা গোপ-স্বরূপ। এই সকল শক্তির অধিদেব রূপে একরূপী আত্মা বহুরূপে শরীরাত্মন্তরে অবস্থিত; এজন্য ঐ ঐ শক্তির পতিগণকে গোপ বলিয়া শক্তিগণকে গোপীনামে উক্ত করিয়াছেন; এ নিমিত্ত রাস-পঞ্চাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে,

“যথা শিশুঃ স্বপ্নতিবিশ্ববিভ্রমঃ,” ইত্যাদি।

বালক যেমন আত্ম প্রতিবিশ্বকে দ্বিতীয়-ব্যক্তি ভ্রমে ক্রীড়া করে, এখানেও সেইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

নিত্যসিদ্ধা রাধাশক্তি পরাপ্রকৃতি। তিনি নিত্য আত্মার সম্মিহিতই আছেন; ইহা জানাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে যে,

“বিহায়ান্যাঃ ক্রিয়ো বনে”

সকল প্রকৃতি হইতে অন্তর হইলেও আত্মা পরা-প্রকৃতির নিকট থাকেন; একারণ আত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্দান করেন। আবার প্রকৃতি হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা দেখাইবার জন্য অনন্তর রাধিকাকেও ত্যাগ করেন; কিন্তু প্রকৃতি নিকটে না থাকিলে যে আত্মার নির্দেশ হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া একবারে অদর্শন হন; অর্থাৎ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর প্রকাশ থাকে না।

রাধা যে ক্ষণে আরোহণ করিতে চাহিয়া ছিলেন, তদভিপ্রায় এই যে, মায়াপ্রকৃতি সমীপস্থ আত্মার বশবর্তিনী;

কিন্তু তিনি কখনই আত্মাকে আক্রমণ করিয়া আত্মবশে আনিতে পারেন না ; অর্থাৎ আত্মাতে মায়ার স্পর্শ হয় না ; ইহা ভ্রান্ত লোক সকলকে দেখাইবার জন্য “তুমি স্কে আরোহণ করহ” বলিয়া ভগবান অদর্শন হয়েন। এতাবত প্রকৃতির পর পরমাত্মা, ইহাই জানাইয়া দিলেন।

কিঞ্চ,

“দৃষ্ট্বা কুমুদন্ত মখণ্ডমণ্ডলং”

পরমাত্মা শিরঃস্থ সহস্রদল পদ্মে নির্মল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ উরুশক্তিক ; তাঁহার সম্বিহিত রক্তশক্তির আভাতে সমস্ত শরীর অনুভাসিত হওয়াতে ভ্রদলস্থ স্বপূর্ণ শশিমণ্ডলও অরুণাভ হইয়াছে, এবং ভবাটবীও অনুরঞ্জিত হইয়াছে ; ইহার অভিপ্রায় এই যে, আপাদতল মস্তকাদি সমস্ত স্থানেই চন্দের কিরণ পাত হইতেছে। চন্দ্র শব্দে সমস্তোষের আহরণ করিতে হইবে। যখন নিবৃত্তি-মার্গস্থা আতমোরঞ্জিনী পরা প্রকৃতির প্রতিভাতে সাধকের সমস্ত শরীর অনুরঞ্জিত হয়, তখন সাধকের ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত বৃত্তির আত্মাতে রমণ করিতে ইচ্ছা জন্মে ; তন্নিমিত্তই “রমাননাভং নবকুঙ্কমারুণং বনঞ্চ তং কোমলগোভিরঞ্জিতং” বলিয়া বর্ণন করেন।

আত্মাভিলাষবতী প্রকৃতি ও পরমাত্মার নাদ-স্বরূপ মনো-হর প্রণব-ধ্বনিতে সাধকের শরীরস্থা বৃত্তি সকল প্রকৃতি ও আত্মার সম্বিকর্ষে আকৃষ্ট হয়। যাহাদিগের মন পরতত্ত্বা-ভিলাষে অনুরাগী হয়, তাহাদিগের চিত্তকে নাদরূপ প্রণব

আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ প্রণব-স্বর যেমন সুমধুর, তেমন মধুর স্বর আর কিছুই নাই। এক প্রণব শব্দ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; এবং ভাগবতে “জগৌ কলং বাম-দৃশাং মনোহরং” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রাসস্থলে বংশী-ধ্বনি হইয়াছিল, এমত প্রসঙ্গ আছে এবং বংশীর নাদ অতি সুমধুর, ব্রহ্ম-কটাহ ভেদ করিয়া থাকে, বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বংশীর ধ্বনিই যে প্রণব-ধ্বনির স্থানীয়, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। যথা—

“যঃ উদগীতঃ সঃ প্রণবঃ”

ইতি শ্রুতিঃ।

এ কারণ, প্রণবকে যজ্ঞরূপ, তচ্ছিত্রকে যজ্ঞচ্ছিত্র ও বেণুরবকে প্রণবধ্বনি বলিয়াছেন। অর্থাৎ যেণু যজ্ঞোৎপন্ন। প্রণব ধ্বনিতে সকল যজ্ঞের অচ্ছিত্রাবধারণ হব ; আত্মাই যজ্ঞ-চ্ছিত্রকে অবরোধ করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধর বলিয়া-ছেন। ঐ যজ্ঞ ভোগার্থে সম্পাদিত হইলে ভোগীর ভোগ প্রদান করেন, ভগবৎপ্রাপ্তি কামনায় নিরুত্তি মার্গে সম্পাদিত হইলে, সেই যজ্ঞই অশ্বের ন্যায় সাধক ব্যক্তিকে পরমাত্মার সান্নিধ্য প্রাপ্ত করান। যথা—

“যজ্ঞাদিব্রতেহশ্ববৎ”

( ইতি বেদান্ত সূত্রং )

সুতরাং ভোগাভিলাষিণী গোপীদিগের সম্বন্ধে ঐ বংশীরব শারীরিক সুখপ্রদ হইয়াছিল এবং কৃষ্ণাভিলাষিণী-নিরুত্তি পরা

গোপীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণান্তিকে লইয়া গিয়াছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি গোপীরূপে পরমাত্মা কৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্টমাণা ও পরস্পর অলক্ষিতোদ্যমা হইয়া আসিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে বাহার ইচ্ছা জন্মে, সে কখন গোপন ব্যতীত প্রকাশরূপে ভজনা করে না। অপরন্তু “হাসাবলোক-কলগীত” ইত্যাদি প্রয়োগে এবং “ঈক্ষিতের্নাশদঃ” ইত্যাদি বেদান্ত প্রমাণে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য করেন, আত্মা নির্লিপ্ত। কলগীত শব্দে বেণুধ্বনিব্যাঞ্জে প্রণবধ্বনি ব্যক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ যাহা-দিগের চিত্ত পরতত্ত্বান্বেষণে নিবিষ্ট হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে কেহই গ্রাম্য ধর্মে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। তজ্জন্যই সমস্ত বন্ধুবর্গ কর্তৃক নিবার্যমাণা গোপীদিগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন সমস্ত শক্তি এক আত্মাকে সহস্রারে বেষ্টন করিয়া রমণাভিলাষে অর্থাৎ আত্মার রঞ্জনার্থে আত্মাকে রমণাভিলাষীর ন্যায় প্রতিপন্ন করেন, ফলে আত্মাতে কিছুই স্পর্শ হয় না; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-তত্ত্ব প্রতিভাসিত হয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহাতে কিছুই স্পর্শ করে না।  
যথা—

“স্মীরত্বৈরষিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহতিঃ । ইত্যাদি  
ররান ভগবাংস্তাভি রাষ্ট্রারামোহপি লীলয়া ॥”

শ্রীভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়।

কাম কস্মাভিলাষীদিগের নিরন্তর দুঃখ, নিকামদিগের স্বেখ,  
আর আত্মতত্ত্বপরাদ্ধুখ বৃত্তিস্বরূপা প্রকৃতির দুরাশ্রয়তা দেখাই-

বার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরাশক্তি শ্রীরাধা নাম্নী গোপী  
বহুশক্তি প্রকাশে রাস-নাট্য দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।  
অর্থাৎ যাহারা পরমাত্মতত্ত্বে পরাঙ্মুখ হইয়া নিয়ত সংসারো-  
চিত ধর্ম কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখভোগের চেষ্টা করে,  
তাহাদিগের নিরন্তর সংসৃতি যন্ত্রণা ভোগ হয়, আত্মতত্ত্ব-  
প্রাপ্তির যে পরম সূত্র, তাহা তাহাদিগের অনুভব হয় না।  
যেমন নরশরীরস্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল পরমাত্মাতে বিমুখ ও স্ব  
স্ব অধিষ্ঠাতার বশে থাকিয়া নিরন্তর যন্ত্রণা পায়, তদ্রূপ ইহ-  
লোকে স্ত্রীরূপ সকল পতিবশে থাকিয়া কষ্ট পায়। মোক্ষরূপ  
যে অখণ্ড সুখ, তাহা তাহাদিগের প্রাপ্তি হয় না। তদর্থো উক্ত  
হইয়াছে যে,

“কামিনাং দর্শনং দৈন্যং জীর্ণাঙ্কৈব দুঃখতাম্।”

অপরন্তু একাত্মা নিকাম ও সকাম, উভয় সাধনার ফল-  
প্রদ হয়েন; ইহাও জানাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-  
লীলা ও দ্বারকালীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তথাহি;

ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল শরীর-রক্ষা-কারিণী; সুতরাং তাহারা  
গোপী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে; যাহারা নিবৃত্তিমাগস্থিত  
সাধক, কেবল আত্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের  
গোপিকা-রূপিণী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল প্রণবধ্বনিরূপ বংশী-  
ধ্বনিতে আবৃষ্ট হইয়া সহস্রাঙ্গ বৃন্দাবন রাস-মণ্ডলে গমন  
করেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মগ্নী-  
ভূতা হইয়া সংসার-সম্পর্কে বিমনস্কা হয়েন। অর্থাৎ যাহারা

কেবল আত্মার অন্বেষণ করেন তাঁহারা আর কখনই সংসার কার্যের অন্বেষণ করেন না । লোকে ইহা জানাইবার নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণের সালঙ্কার বাক্য ব্যাজে ভগবান বেদব্যাস কহিয়া গিয়াছেন । যথা—

“ তদযাত মাচিরং ঘোষণং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ ।

ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত হৃদ্যত ॥ ”

হে গোপীগণ ! তোমরা পতিব্রতা স্ত্রী ; গৃহে গিয়া পতি-সেবা কর এবং বালক বালিকাগণ ক্রন্দন করিতেছে, তাহা-দিগকে স্তন পান ও গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ দান দ্বারা সাস্তুনা কর ।

এ বাক্যে শুদ্ধ লৌকিক ধর্ম দেখাইয়াছেন । অর্থাৎ কটু-ধর্ম সংসারে যাহারা মুগ্ধ হইবে তাহাদিগের কদাচই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইবে না । যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ ভগবদ্ধর্মে শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহারাই নৈষ্ঠিকী ভক্তি সহকারে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । গোপ্যুক্তি-চ্ছলে পরম দুঃখদ সংসার ধর্মের আকাঙ্ক্ষার নিরাকরণ করিবার জন্য এইমাত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । যাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সকাম সাধক, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় ব্রতিকে মহিষীরূপে ব্যাখ্যা করিয়া নিয়ত ধর্ম-কর্মোপদেশ করিয়া-ছেন এবং কর্মানুসারে আত্মার অনুকম্পায় যে লোকের আপন আপন অভিলষিত স্ত্রু লাভ হয়, ইহা মহিষীদিগের পুত্র পৌত্রাদি সম্পত্তি-সংযুক্ত স্ত্রু ভোগ প্রদর্শন দ্বারা জানাইয়া

গিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করা যায় না। কেন না, আত্মা অবিকারী; কিন্তু তিনি সাধকের সাধনানুসারে বিকারিবৎ প্রতিভাত হন। তিনি সর্বকাম-পূরা আপনি লিপ্ত না হইয়া লিপ্তবৎ অনেকের অনেক-মত কামনার পূরণ করেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, হর্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তাঁহাতে শুভাশুভ কর্ম কিছুই লিপ্ত নহে। দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রই মায়ার কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে লিপ্ত নহেন;—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক। নিরুদ্ভি-ধর্ম্মিণী গোপীকৃপা রুদ্ভিদিগের সহিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ক্রীড়ামূলে শুদ্ধ পরমার্থোপদেশ এবং প্রবৃত্তিমাৎসর্য্য মহিবীদিগের সহিত বিহারোপলক্ষে সংসার ধর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে;—এইমাত্র পুরাণ বর্ণনার তাৎপর্য্য। ইহাতে যাহার যেমন মনঃ, যেমন বুদ্ধি, যেমন মেধা, আধারানুসারে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গে তাঁহার সেই রূপই ধারণা হইয়া থাকে।

সাধারণ ব্যক্তিগণের অনুধ্যানরহিত চিত্তে যে রাসলীলার ভাব সর্বদা জঘন্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহার মধ্যে রূপকালঙ্কারে যে সকল পরমাত্মতত্ত্ব নিখাত আছে, তাহা অল্প কথায় ব্যক্ত হইবার নহে। চিন্তাশীল পাঠক ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকারান্তরে আরও বিষদরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

ঐশ্বরিক পরাশক্তি, সাধকদিগের ভগবদ্ভাবোদয়ের নিমিত্ত

আত্ম-বৈভব-সূচক এই রাস-লীলা প্রকাশ কবেন। শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় পুরুষ, তিনি কিছুই করেন না। কেবল প্রকৃতিই সকল কার্যের মূলাধার হয়েন। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সকাম সাধক ও নিবৃত্তি-মার্গস্থ নিকাম সাধকের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে প্রকৃতি রূপা বলিয়া তাহাদিগের লোকবৎ চেষ্টা বর্ণন করা হইয়াছে। অর্থাৎ সকামের অভিলাষ পূরণ ও নিকামের মোক্ষ প্রদান এক পরমেশ্বরই করেন। যথা

একো বহুনাং বিদধাতি কামানিতি শ্রুতিঃ।

এক পরমেশ্বরই সাধনানুসারে অনেক প্রকার কামনা পূরণ করেন।

তাহা দেখাইবার জন্য এক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বাসিনী বহু সংখ্যক মহিষীর ঐহিক মনোরথ পূরণ করিয়াছেন। অজ্ঞ লোকে শ্রীকৃষ্ণকে তদাসক্ত জ্ঞানে দোষ-লিপ্ত বলিয়া বোধ করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যবৎ দোষ-লিপ্ত নহেন। এই ব্যাপার যোগ-মায়া-বিলাস মাত্র। এস্থলে এরূপও বিবেচনা করা উচিত নহে যে, প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণাবতার হয় নাই; উহা কেবল পৌরাণিকী রচনা মাত্র। বস্তুতঃ কৃষ্ণাবতার হওয়া যথার্থ। কিন্তু সেই অবতার বিষয়ের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বিতীয়, অব্যয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্লিপ্ত পরমাত্মা—ইহাই পরিগ্রহ করিতে হইবে। যদিও পরমাত্মার কোন কর্তব্যাকর্তব্য নাই, তথাপি এই বিশ্ব তাঁহারই কৃত বলিতে হইবে। যখন পরমেশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন,



বেদে ইহা মান্য ও স্বীকার্য্য হইয়াছে, তখন তাঁহার বিশো-  
পকারক অবতারকে মান্য না করিবার কারণ কি ? ফলিতার্থ  
পরমেশ্বরের স্মৃতিদ্বার-আরুঢ় হইয়া বিবিধ সাধকের যেরূপ  
গতি লাভ হয়, তাহাই “রাসলীলা” ছলে বর্ণিত হইয়াছে ।  
ইহা ঐ রাসপঞ্চাধ্যায়েই গোপী-গীতায় কহিয়াছেন । যথা

“ন খলু গোপিকানন্দনোভবান্নিখিলদেহিনামস্তরাঙ্গদৃক্ ।”

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কেবল গোপিকানন্দন নহ, সমস্ত  
জীবনিকরের এক অন্তরাঙ্গা হও ।

অতএব যখন শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকারা জীবাস্তরাঙ্গা  
বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তখন বৃন্দাবনে রাসলীলার ব্যাপার  
যে অধ্যাত্মতত্ত্ব-ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? স্তত্রাং  
জীবের পক্ষে অনায়াসে অধ্যাত্মতত্ত্ব-বোধের নিমিত্ত এই  
রাসলীলা প্রকটিত হইয়াছে ; অর্থাৎ অপ্রকট পরমাত্মতত্ত্ব  
প্রকটিত হইয়াছে । যে সকল নিষ্কাম সাধক কেবল  
ভগবন্তত্ত্ব-প্রাপ্ত্যর্থী, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি ও  
তদ্ভিন্ন কাস্তি, পুষ্টি, ধৃতি, শাস্তি প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি সকল  
এক প্রণব-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানকে পরিত্যাগ  
পূর্বক উদ্ধব্রজশীলা হইয়া সহস্রাখ্য পরমাত্মার পরমাসনে  
গমন করিতে ব্যগ্র হয় । তাহাদিগকে তদধিষ্ঠাতৃ দেবগণ  
কদাচ নিষারণ করিয়া রাখিতে পারেন না । তাহাদিগের  
বিপক জ্ঞান হয় নাই, অথচ আত্ম-সম্মিধানে গমনে ওৎসুক্য  
হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সকল তত্ত্বং দেব কর্তৃক

নিবারিত হয় । কিন্তু আত্মতত্ত্ব-প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনায় সেই সকল ব্যক্তি নিয়ত সংসার-রূপ বিষয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট পায় । সেই কষ্ট ভোগ করিয়াও পরমাত্ম তত্ত্ব বিস্মৃত না হইয়া যে কোন রূপে দেহোপরতি দ্বারা দেহান্তে পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভ করে । যাহারা অনিবারিত, তাহারা ঐ দেহেই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বজীবন-পরিমুক্ত হয় ;—ইহাই রাসের সূক্ষ্মার্থ । ভগবান বেদব্যাস নিষ্কাম সাধকদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিকে গোপীরূপে এবং প্রণব-ধ্বনিকে বংশীধ্বনি-রূপে, সহস্রাশ্ব্য ভূপ্রদেশকে বৃন্দাবনধামরূপে নির্দেশ করিয়া অন্তর্গতরূপে আত্মার নির্বাণ-মুক্তির উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । যাঁহাদিগের অবিপক সাধন, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিকেও গোপী বলিয়া পতি-পিতাদি কর্তৃক বার্ষ্য-মাণা ও অন্তর্গতহরুদ্ভা অথচ তদ্ভাবনা-যুক্তা বলিয়া গিয়া-ছেন । সেই অলক-বিনির্গমা বৃত্তিময়ী গোপিকা সকল পরমাত্ম-তত্ত্ব চিন্তা করতঃ গুণময় দেহকে ত্যাগ করিয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধি প্রাপ্ত হন । নিকটগতা গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ অলঙ্কৃত বাক্যে ধর্মোপদেশ দ্বারা পুনঃ ভ্রজে গমন করিতে কহিয়াছিলেন । যথা—

“তদ্বাত মা চিরং ঘোষং শুশ্রবধ্বং পতীন্ সতী” রিতাদি

এবং “ভর্তৃঃ শুশ্রবণং স্ত্রীণাং পরোধর্মো হুমায়রা ।” ইত্যাদি ।

তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থ-তত্ত্বাশ্বেষী পরমহংস-গণের স্বচিন্ত-বৃত্তি সকল প্রণবধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পরমা-

আর সম্মিটে গমনোদ্যত হয়, তাহারা আর কোন ক্রমেই সংসারোচ্চিত ধর্ম কথা শুনে না। ভর্তা শব্দে ভরণ-কর্তা। এখানে ধর্মকে ভর্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু, ধর্মই সকলের প্রতিপালনকর্তা অর্থাৎ রক্ষা-কর্তা। যাহারা ভগবদ্বেষণ করিবার নিমিত্ত পরিত্রজনশীল হন, তাহারা কখনই সাংসারিক ধর্মোপদেশ বিচারে বাধিত হইবেন না; সর্ব-ধর্ম-ময় এবং তপোময় পরমাত্মাকে জানিয়া একান্ত মনে তাহাকেই প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। সুতরাং তাহাদিগের চিত্তবৃত্তাদি সকল কখনই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীনতা স্বীকার করে না। ইহাই দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে সাংসারিক ধর্মোপদেশ করেন। পরমহংসেরা সাংসারিক ধর্ম কর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া সর্ব-ধর্মময় আত্মাতে আত্মসমর্পণ করেন। সেইরূপ গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া ধর্মে বিতৃষ্ণা জানাইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা,

“অন্ত্যেব মে তত্বপদেশপদে ভয়ীশে,

প্রেমোভবাংস্তত্বভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা।”

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকল জীবের পরমাত্মা হও। ধর্মোপদেশ দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম উপদেশ পদ। অতএব তুমিই উপদেশ-পদ। তোমাতেই তোমার উপদেশ থাকুক। আমরা ত্বৎপ্রাপ্তির উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করি না।

পরমহংসেরা ধর্মাদ্বৈত সকলই একমাত্র আত্মাতে সমর্পণ করেন ; গোপীরাও শ্রীকৃষ্ণে সকল সমর্পণ করিয়া ইহা জানা-ইয়াছেন যে, অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাধকের উপাসনার পথ এই। মহাতমঃ ও তৎসহচারিণী অসূয়া ও হিংসা,—ইহারা সর্বদাই বিদ্যার বিদ্বেষ করে এবং সর্বদাই বিদ্যার প্রতি দোষারোপ করিয়া লোকদিগকে মহাতমের বশে আনিতে চায়, এবং আত্মাকেও অলীক পদার্থ বলিয়া জল্পনা করে। এখানেও আয়ান জটীলা ও কুটীলা—ইহারা সতত জ্ঞানশক্তি রাখার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন এবং নানা প্রকার কলঙ্কবোজনা ও ঘোষণা করিয়াছে। আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেও অনেক নিন্দা করিয়াছিল। মহানটী বৈষ্ণবীমায়া, এক আত্মাকে কতরূপে প্রতিভাসমান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদা আয়ানের সম্মুখে যোগমায়া রাধা শ্রীকৃষ্ণকে কালীরূপেও প্রতিভাত করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা নির্মল হইয়াও মায়া-সন্নিধানে অবস্থিতি প্রযুক্ত, নানারূপে পরিণত হইয়েন। মায়া-যোগে মানভানে আত্মাকে পুরুষরূপে দৃষ্ট করিয়া কদাচিৎ মায়া আপনি তাঁহার আরাধ্যা হইয়েন, অর্থাৎ আত্মাকে উপাসক ও উপাস্য উভয়রূপেই পরিণত করেন।

মায়াই বিশ্বব্যাপী আত্মাকে সাধ্য-সাধকরূপে প্রতিভাত করেন। তাহাই দেখাইবার জন্য শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ আত্মাকে মায়ার সাধনা করাইয়াছেন ; কদাচিৎ তন্মানোপশনার্থ শ্রীকৃষ্ণকে শিবরূপেও দর্শনীয় করিয়াছিলেন।

কলিতার্থ, শ্রীকৃষ্ণ ইহার কোন কার্য্যই করেন নাই। শ্রীরাধিকাই সকল নাট্যাচরণ করিয়াছিলেন। আত্মাই সজীব ও অজীব সকল পদার্থ হয়েন। তাঁহাতেই সকল ও তিনিই সকল বস্তুরূপে খ্যাত ; তন্নিম্ন বস্তুন্তর নাই। শুভাশুভ যাবতীয় কার্য্য সকলই আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে—ইহা লোকে জানাইবার জন্য যোগেশ্বরী রাধিকা এক কৃষ্ণরূপে সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যকে প্রতিভাত করিয়াছেন ; শাস্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু এ সকল বিষয় অসত্য হইলেও তদ্রূপের উপাসনা ও তৎকৰ্ম্মানুস্মরণমননে সত্য, পরাৎপর, পরমার্থ-পদ লাভ হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যদিগের শরীর মিথ্যা ; কিন্তু ঐ মিথ্যা শরীরে সত্য কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, ইহাই তাহার উদাহরণ স্থল।

বেদে আত্মাকে বহুশক্তিমান বলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-কেও যোড়শসহস্র-গোপীগোষ্ঠীতে পরিবেষ্টিত বলা হইয়াছে। আত্মা ক্রিয়াপরা শান্তি, ক্রান্তি, কান্তি, পুণ্ড্যাদি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরিণামে পরাপ্রকৃতির সন্নিহিতে থাকেন। অবশেষে অব্যক্ত প্রকৃতিকেও পরিত্যাগ করিলে সাধক ব্যক্তি সেই পরমপুরুষে লয় হয়। তখন তাহার নাম-রূপাদি আর প্রকাশিত থাকে না। ইহার উপদেশার্থ শ্রীকৃষ্ণ একা রাধিকাকে লইয়া সকল গোপীর নিকট হইতে অন্তর্হিত হন। পরিণামে পরাপ্রকৃতি রাধাকেও পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান করতঃ অনামরূপ অর্থাৎ অপ্রকাশিত

হইয়াছিলেন। এতাবত ইহাই বুঝিতে হইবে, যে যাবৎ প্রলয়াবস্থা, তাবৎ মুক্ত-পুরুষদিগের ঐ ঐ বৃত্তি সকল স্ব স্ব ব্যাপারে নিরন্তর থাকে; পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যবস্থাতে প্রকাশিত হইয়া নামরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

“তাবন্নির্ব্বৃত্তঃ স্তিয়ঃ”এবং “জ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে”

অর্থ—

পরিত্যক্তা গোপিকাগণ যাবৎ অন্ধকার, তাবৎ নিরন্তর থাকিয়া আলোকবিভাবে পুনর্ব্বার কৃষ্ণাশ্বেষণপরায়ণা হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়ে লোক তমোময় হয়। তখন প্রকৃতিই আত্মাতে অব্যক্তরূপে চেষ্টা-বিহীনা হন। সৃষ্টি-প্রকাশে পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্য করেন;—এইরূপ গূঢ়ার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মা যেমন একমাত্র চন্দ্রমা মায়াযোগে জল শরীরস্থ প্রতিবিস্তিত চন্দ্রের আকারে পিণ্ডে পিণ্ডে বহুরূপে ব্যাকৃত হন, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থ মায়াস্থানীয় গোপীসংযোগে অনেক রূপে ব্যাকৃত হইয়া প্রতি গোপীতে প্রতিবিস্তিত হইয়াছিলেন।

কিঞ্চ

“বিমুহ্যমানাঃ খেচরস্তিয়ঃ।”

দেবস্ত্রী সকল বিমুগ্ধ হইয়া রাসস্থলে আসিয়াছিলেন। ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ দেব-শ্রেণীয়। তাহাদিগের বৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়স্ত্রী; অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সকল বিমুগ্ধপ্রায় হইয়া তাহার মনের সহিত উর্দ্ধগ সহস্রারে গিয়া নিস্তরক হয়। সুতরাং রতিপ্রভৃতি

ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল মানসাখ্য কামের সহিত বিমুক্ত। হওয়াতে  
রাসপক্ষাধ্যায়ে কাম-জয়াখ্যান উক্ত হইয়াছে।

অপরন্তু

“শৃঙ্গার ইব মূর্ত্তিমান্”

অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায়—এইরূপ বলিবার  
তাৎপর্য্য এই যে, রতি কামের একত্রাবস্থানের নামই শৃঙ্গার।  
এখানে পরমাত্মার পরমাসনে রতি-কামের অধিষ্ঠান হওয়া-  
তেই তথায় শৃঙ্গারকে মূর্ত্তিমান বলিতে হইয়াছে। একারণ  
তন্ত্রে “শৃঙ্গারং শিরসি জ্যেয়ং” বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।  
সুতরাং শাস্ত্রে যে শৃঙ্গার-ব্যাজে কাম-জয়-ব্যাখ্যা করেন,  
তদ্বারাই প্রতীত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সামান্য-লোকবৎ শৃঙ্গার  
করিয়াছেন, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। রাজা পরীক্ষিৎ তদ্বজ্ঞ  
ছিলেন, তিনি এ সকল তাৎপর্য্য জানিতেন; কেবল লোক-  
বোধানুরোধে প্রহ্নমাত্র করেন। পরমজ্ঞানী শুকদেবও,—  
“তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্ব্বভূজো যথা।” সংক্ষেপে  
এই উত্তর দিয়াছেন। ইহারও প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, তেজোময়  
বলি যে বিষ্ঠাদি নিকৃষ্টতম পদার্থ ভক্ষণ (অর্থাৎ ভক্ষ-  
সাৎ) করিয়াও অপবিত্র হন না—তাহা যেমন সত্য, অথচ  
তাহার প্রকৃত কারণ মানবের অগোচর;—সেইরূপ, ঐশ্বরিক-  
শক্তিরূপ তেজোদ্বারা যে সকল ব্যক্তি তেজস্বী, তাঁহাদিগের  
যে সকল অপবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান মনুষ্যের প্রত্যক্ষ-গোচর,  
তাহারও প্রকৃত কারণ মানবের অগোচর। যদি কোন

কালে কোনরূপ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা মনুষ্যসমাজ বহুিন্ন নির্দোষতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবে ঈশাবতার-দিগেরও জঘন্যবৎ কার্য্য সকলের নির্দোষতা সপ্রমাণ হইয়া উঠিবে।

ফলতঃ রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তি-গণ নিগূঢ় তত্ত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন প্রকৃতির অনু-যায়ী লৌকিক শৃঙ্গারাদি কার্য্যকে অবলম্বনীয় ও ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে, এই ভাবিয়া ভগবান বেদব্যাস এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, —

“ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥’

(ভাগবত, ৩৩ অধ্যায় অর্থাৎ

রাসপঞ্চাধ্যায়ের ৫ম অঃ ৩২ শ্লোক। ৭)

অর্থ—ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মুখ-বিনির্গত উপদেশ-বাক্য-সকল সর্ব্বথা মানবগণের হিতজনক; তাহাদিগের আচরণের মধ্যেও কোন কোন আচরণ সত্য, অর্থাৎ মনুষ্যদিগের অনুকরণীয়, কোন কোন আচরণ সেরূপ নহে। অতএব আচরণের অনুকরণ করিতে হইলে, ঈশ্বর-দিগের যে আচরণ তাহাদিগের উপদেশ-বাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহারই অনুকরণ করিবেন।

অতএব সাধকের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি গোপীরূপে নিয়ত কৃষ্ণাখ্য



পরম পুরুষে লগ্না হইয়া সহস্রারাখ্য নিত্য বৃন্দাবনে অশ্বলিত-  
রূপে নিত্য রাস করিতেছেন,—যাহার রাস-পঞ্চাধ্যায়-পাঠে  
এই স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই সাধক অগ্নিপূত, সূর্য্যপূত ও  
সর্ব্বতীর্থপূত। সেই তত্ত্বজ্ঞানী সাধকই বিষময় বিষম সংসার  
যন্ত্রণার পরিত্রাণ পাইয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করে। সে ব্যক্তি ইহ  
লোকে নিরন্তর ব্রহ্মরস-পূরিত আনন্দাগরে ক্রীড়মাণ হইয়া  
দেহাবসানে সেই পরাংপর পরম বিষ্ণুপদে স্থান প্রাপ্ত  
হয়, ইহার অন্যথা নাই। রাসের এই উপদেশ, রাসের এই  
আদেশ, ইহাই বেদের অনুশাসন; ইহাই তত্ত্বজ্ঞান ও  
উপাসনার যোগ্য। অতএব মহরাস ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের  
পরমাত্মতা-বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা করা কেবল নরকের কারণ,  
তাহার সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কৃষ্ণাবতার-স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের প্রকৃত  
স্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ বিষ্ণুধ্যানের প্রকৃত মৰ্ম্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে।  
বিষ্ণুর ধ্যান যথা—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিত্ত্বমণ্ডল মধ্যবর্তী  
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।  
কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী  
হারী হিরণ্ময়বপুঃ স্বৰ্ণতশচ্চক্রঃ ॥

অর্থঃ—

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী, পদ্মাসনস্থিত, কেয়ুর, কুণ্ডল, কিরীট

ও হার দ্বারা বিভূষিত এবং শঙ্খচক্রধারী ও স্বর্ণময়-শরীরী নারায়ণকে সর্বদা ধ্যান কর।

নারায়ণকে সূর্য্য-মণ্ডলস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যতেজঃ সর্বব্যাপী ও সর্বগত। সুশব্দে গমন, য শব্দে কর্তা। সূতরাং সূর্য্য শব্দে—তৈজস রূপে সর্বত্র গমনশীল; এবং নার—জীবসমূহ, অয়ন—আশ্রয়। সূতরাং নারায়ণশব্দে যিনি সর্বভূতের অন্তর্যামী।—এই উভয়ার্থ প্রতিপাদনার্থ নারায়ণকে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নির্দেশ করা সুন্দর সঙ্গত হইয়াছে। তিনি পদ্মাসনস্থিত, — এই বিশেষণের তাৎপর্য্য এই যে, পদ্ম অর্থে সত্ত্বগুণ; সূতরাং পরমাত্মা বিষ্ণু সত্ত্বগুণ সন্নিবিষ্ট হইবেন। কেয়ূরবান্ অর্থে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশব্যাপী। অর্থাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু সর্বত্র স্থিত ও সর্বত্র-গামী। কুণ্ডলবান্ অর্থে,—প্রবৃতি ও নিবৃতি মার্গ অর্থাৎ সগুণ-নিগুণ-প্রতিপাদক ঋতি। সখ্যযোগস্বরূপ কুণ্ডল ঋতিমূলে দোহুল্যমান। কীরীটাদি ধারণে তদ্বিস্ময় পরমপদ অর্থাৎ যদুপরি আর নাই, এমত সর্বোচ্চপদ, অর্থাৎ বিদেহ-মুক্তি বুঝায়। তিনি সূর্য্যভ্যন্তরস্থ বরগীয় তেজঃ-স্বরূপ। তজ্জন্য তাঁহাকে হিরণ্য-বপুঃ বলা হইয়াছে। চক্র-শব্দে সুদর্শন, অর্থাৎ মনঃ, তেজঃ ও সত্ত্ব এবং শংখ শব্দে জলতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুর এই ধ্যানানুযায়িনী মূর্ত্তি ব্রহ্মোপকরণাত্মক। তিনি যজ্ঞস্বরূপ পুরুষ; শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, চৈতন্যরূপের উপকরণ দ্বারা তাঁহার দেহ নির্মাণ

হইয়াছে। অতরাং সে শরীর প্রাকৃত শরীরের ন্যায় নহে।  
 ধ্যান কালে বাক্য সকলের এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থই গ্রহণ  
 করিতে হইবে।

---

তয়োদশ অধ্যায়।

দুর্গোৎসব-তত্ত্ব।

এতদ্দেশে যে সকল ক্রিয়া কৰ্ম্ম এবং পূজা-উপাসনাদি  
 প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুর্গোৎসবই সর্বাপেক্ষা প্রধান।  
 এই দুর্গোৎসবই গৃহস্থজীবনের সার্থকতা সাধক কার্য্য বলিয়া  
 স্থির আছে। যে গৃহস্থ যাবজ্জীবন দুর্গোৎসব করিতে সমর্থ  
 না হইলেন, তিনি যেন আপনাকে বুখাদেহধারী বোধ করিয়া  
 একান্ত দুঃখিত হইলেন। এই দুর্গোৎসব পরমতত্ত্ব। ইহার  
 নিগূঢ় মৰ্ম্ম বোধ হইলে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে  
 পারিলে বস্তুতই মানবজীবনের সকল কর্তব্য সাধন করা  
 হয় এবং অনায়াসেই পরমানন্দ-সম্ভূত অথও ব্রহ্মানন্দ  
 লাভ হইতে পারে। ক্রিয়াকাণ্ড মধ্যে ইহার সদৃশ যজ্ঞ  
 আর নাই। শাস্ত্রে দুর্গাপ্রতিষ্ঠাকে কলির রাজসূর্যযজ্ঞ বলিয়া  
 গণ্য করিয়াছেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ধৰ্ম্ম, অর্থ,  
 কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মহোৎসবরূপ দুর্গোৎসবের আনুষঙ্গিক যে সকল কার্য আছে, অনেকে তাহার তাৎপর্য সহসা অনুধাবন করিতে পারেন না।—পূজার পূর্বে বিদ্বৎসম্মুখে বোধন; পরে নব পত্রিকা-প্রবেশ; অনন্তর তিন দিবস পূজা; অবশেষে বিসর্জন;—এই সকল কার্য কি এবং ইহার তাৎপর্যই বা কি, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যিক। অপর দুর্গোৎসবকার্য বৎসর মধ্যে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়, ইহারই বা কারণ কি? আবার বসন্তকালীন পূজাতে বোধনকার্য করিতে হয় না; কিন্তু শরৎকালের পূজাতে ঐ বোধনের নিতান্ত আবশ্যিকতা কেন? অপরন্তু, কোথাও বা নবমীতে, কোন স্থানে প্রতিপদে, কোথাও বা ষষ্ঠীতে কল্লারস্ত হইয়া থাকে; এরূপ বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানেরই বা কারণ কি?—এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত তাৎপর্য ও মর্ম বোধ করা নিতান্ত আবশ্যিক। বোধ হয়, আমাদিগের দেশে অনেকেই ইহা অবগত নহেন। ইহা অতিশয় রমণীয় বৃত্তান্ত এবং ইহার অবগতিতে অশেষ প্রকার আনন্দ ও পরিণামে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয়। এই নিমিত্ত সর্বসাধারণ হিন্দুমণ্ডলীর উপকারার্থ এতদ্বিষয়ক নিগূঢ় মর্ম (যাহা পূর্বোক্ত জ্ঞানিবর পরমহংসের নিকট অবগত হইয়াছিলাম, তাহা) ব্যক্ত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, এতদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধমনাঃ ব্যক্তিগণের ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য যে, পরমতত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিগণ যে কার্যের

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার হিতসাধকতা বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। ঋষিরা বেদবিধি অনুসারেই সকল কৰ্ম্মের সমাচরণ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। ঋষিবাক্য ও বেদ-বাক্যে প্রভেদ নাই। বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ ঈশ্বরাভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, ঋষিরাও তাহাই বলেন। কেবল ভ্রান্তদৃষ্টি প্রাকৃতজনগণই মোহবশে তাহাতে অনৈক্য দেখিতে পায়। এই উভয়কালীন দুর্গাপূজা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ঘটিত পরমাত্মা উপাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব-গ্রহণে অনিপুণ মুগ্ধ লোকের উপকারার্থই মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্বের উদ্ঘাটন পূর্বক এইরূপ বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মার স্বরূপতত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা নাই, যে ব্যক্তি কেবল লোভ-মোহে অভিভূত ও নিয়ত সংসারে থাকিয়া স্বখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং নিয়তই জনসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তাদৃশ ব্যক্তিও যদি আত্মতত্ত্বোপাসনা না করিয়া দুর্গামহোৎসবোপলক্ষে ব্রহ্মময়ী দুর্গার অর্চনা করে, তবে সে ব্যক্তি পরম্পরা-সম্বন্ধে ক্রমশঃ যোগসমাধি-প্রাপ্য তদ্বিস্তুর পরমপদ লাভ করিবার যোগ্য হয়। যাহারা দুর্গামহোৎসবে তাম্বিল্য বা ঔদাস্য করে, কিম্বা আমরা তত্ত্ব-জ্ঞানী, ইহা দুর্ব্বলাধিকারীর কৰ্ম্ম,—এরূপ অবজ্ঞা করিয়া, অথবা আলাস্য বা মোহবশতঃ পরিপূর্ণ-জ্ঞানময়ী দেবী দুর্গার অর্চনা না করে, তবে ভগবতী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাদিগকে

সমস্ত অভিলাষ হইতে বঞ্চিত করেন ; তাহাদিগের আর কোন সাধনাই সফল হয় না ; শাস্ত্রে এরূপ শাসনবাক্যও নির্দিষ্ট আছে । বস্তুতঃ নিগূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানে প্রায় জীবমাত্রই অনিপুণ । তন্নিমিত্ত পরমহিতকারী বেদ-শাস্ত্র এক একটী ঈশ্বররূপের উপাসনার দ্বারা সংসারবদ্ধ জীবগণের মুক্তির উপায় কহিয়া গিয়াছেন । অতএব সগুণে বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া কেবল নিগূর্ণোপাসনায় মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে এবং কস্মিন্কালে কেহই সেরূপ হয় নাই । জৈগীষব্য প্রভৃতি পূর্বে যত যত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, সে সকলেই সগুণ ব্রহ্মে চিন্তাস্থাপন করিয়া নিগূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন । ফলতঃ মুক্তিসাধন বিষয়ে এই পথ ভিন্ন আর অন্য পথ নাই ।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

মহাবিস্তৃত নিগূর্ণতত্ত্বময় দুর্গোৎসব-ব্যাপারের প্রত্যেক কার্য্যে একদিকে পৌরাণিক কল্পনা, অন্য দিকে বৈদিক-তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ,—এই উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য লক্ষ করিতে হইবে :

সূর্য্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুই পথ । পৌরাণিক কল্পনাতে দক্ষিণায়ন—পিতৃযান ও উত্তরায়ণ—দেবযান বলিয়া গণ্য । আধুনীয় কৃত্য পিতৃযানে, চৈত্রীয় কৃত্য দেব-যানে হইয়া থাকে । প্রবৃতিমাগের যে কৰ্ম্ম, তাহা দক্ষি-

ণায়নে এবং নিবৃত্তিমার্গের যে কৰ্ম তাহা উত্তরায়ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে ; একারণ শাস্ত্রে বলেন, যে দেবতাদিগের দিবা উত্তরায়ণ ও রাত্রি দক্ষিণায়ন। সুতরাং দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই নিদ্রিত দেবগণকে জাগাইতে হইবে; তাহারই নাম বোধন। উত্তরায়ণে জাগ্রদবস্থা ; তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্য প্রযুক্ত বোধনের প্রয়োজন হয় না। এতাবত প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য লাভ প্রত্যাশা করিলেই ঐ প্রবৃত্তিমার্গ-স্থিত ব্যক্তির তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ করিয়া লয়ন। “বোধন” শব্দের ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ। যথা—

“প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারো নিবৃত্তিস্তদন্যথা।”

ইতি যামলং।

সংসারকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে ; তদ্বিষয় নিবৃত্তিমার্গ ; অর্থাৎ সংসার সম্যাসধৰ্ম্মকে নিবৃত্তিমার্গ কহে।

অপরন্তু, কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রাবস্থাকে প্রবৃত্তিমার্গ, আর তাঁহার জাগরণাবস্থাকে নিবৃত্তিমার্গ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অতএব কুণ্ডলিনী-বোধনের নামই বোধন বলিয়া যোগিগণ নিয়ত কুলকুণ্ডলিনীকে বোধনে রাখিয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিয়ত দেবযান উত্তরায়ণে কার্য্যসম্পন্ন হইতেছে, অর্থাৎ তৎকার্য্য আদিত্যদ্বারে গমন করিতেছে। আদিত্য শব্দে সূর্য্য। অধ্যাত্মতত্ত্বে সূর্য্যশব্দে পিঙ্গলানাড়ী। তাহা দক্ষিণ দিক্‌সিকাতে অবস্থিত ; তাহাতে প্রাণবায়ু বহনকালে

কুণ্ডলিনী জাগ্রদবস্থায় থাকেন। সুতরাং তত্ত্ব-চিন্তকেরা কুণ্ড-  
লিনীর জাগ্রৎকালকে দিবা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

এজন্যই কাল চিন্তকেরা দেবযান উত্তরায়ণকে দেবতা-  
দিগের দিবা বলেন। দেবতা শব্দে এখানে ইন্দ্রিয়গণ। ঐ  
ইন্দ্রিয়গণকে কুণ্ডলিনী জাগ্রদবস্থায় বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত, নিদ্রি-  
তাবস্থায় বিষয়ে অভিভূত করেন। তৎকালে কোন যাগ-  
যজ্ঞাদি-সাধন সম্পন্ন হয় না ; অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ বাম-নাসা-  
চারী প্রাণবায়ু জীবগণকে বলপূর্বক নিয়ত সংসারে আবদ্ধ  
করেন। শ্রুতিতে নির্দিষ্ট আছে যে,—

“চক্ষুসং গচ্ছতীতি”

অর্থাৎ পিতৃলোককামী ব্যক্তি চন্দ্রলোকে গমন করে।

অধ্যাত্মপক্ষে দ্বিদল ভ্রমধ্যে চন্দ্রলোক অবস্থিত ; সুতরাং  
উর্দ্ধে সত্যলোকে যাইবার পথ না পাইয়া তাহারা পুনর্ব্বার  
অধঃপ্রবৃত্ত হয়। অতএব তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি আছে।  
সূর্য্যদ্বারে গমন করিলে সত্যাত্ম্য লোকে গমন করে, আর  
আবৃত্তি থাকে না। যথা,—

“সত্যালোকো মহামৌলো”

শিরঃসহস্রাখ্য মহাপদ্মে সত্যাত্ম্যলোকে নিত্য আত্মা-  
ধিষ্ঠান হয়। সুতরাং পিঙ্গলা দ্বারা নাদচক্রকে ভেদ করিয়া  
তথায় গমন করিলে জীবের সংসারে পুনরাগমন হয় না।  
তজ্জন্য তাহাকেই নিত্য বসন্তাত্ম্য উত্তরায়ণ বলিয়া খ্যাত  
করিয়াছেন। উত্তর শব্দে সর্ব্বশেষ, অয়ন শব্দে আশ্রয়।



সর্বশেষ-আশ্রয় অর্থাৎ তদ্বিস্তার পরমপদ প্রাপ্তিই উত্তরায়ণ।  
 যাহাতে নিত্য বাস, তাহাকে বসন্ত বলা যায়। সেই পরম  
 পদে অর্থাৎ প্রসন্নস্থানে যে বিদ্যার প্রভাবে অধিবাস হয়,  
 সেই বিদ্যার নাম “বাসন্তী”। সূতরাং বোধস্বরূপা কুল-  
 কুণ্ডলিনী শক্তিকে এখানে বাসন্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়া-  
 ছেন। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি নিত্য জাগ্রদবস্থায় অবস্থিতি  
 প্রযুক্ত তত্ত্ব-চিন্তকের আপনাতে তত্ত্ব বোধের নিমিত্ত আর  
 যত্ন করার প্রয়োজন হয় না। একারণ, জ্ঞানশক্তি কুল-  
 কুণ্ডলিনীর অর্থাৎ বোধ-স্বরূপা দুর্গার উত্তরায়ণে বসন্ত সময়ে  
 যে মহোৎসব হয়, তাহাতে বোধন নাই। মহাশক্তি দুর্গাকে  
 শাস্ত্রে এই নিমিত্তই বাসন্তী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। নতুবা  
 বাসন্তী শব্দের “বসন্তে ভবা বাসন্তী” এরূপ সাধারণ ব্যুৎ-  
 পত্তি নহে।

এই দুর্গোৎসব কল্প এক পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপ; পক্ষা-  
 স্তরে পৌত্তলিক ব্যাপার বোধ হইতে পারে। নিরুত্তিমার্গস্থিত  
 তত্ত্বজ্ঞানীরা অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-চিন্তায় ঐ দুর্গোৎ-  
 সব কল্প সম্পন্ন করেন। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সংসারী ব্যক্তি  
 ঐশ্বর্য ও স্বাস্থ্যসম্পত্তি লাভার্থ অশ্বমেধানুকল্প যজ্ঞরূপে  
 দুর্গোৎসব করিয়া দুর্গা-প্রসাদে নির্বিঘ্নে ঐহিক নানাবিধ  
 ঐশ্বর্য লাভ করিয়া পবিত্র স্বরলোকে অধিগমন করেন।  
 নিরুত্তিমার্গে জ্ঞানিগণ ইহাতেই মোক্ষ-নিরুত্তি লাভ করেন।  
 তথাহি,—এরূপ পৌরাণিক ইতিহাস আছে, স্বরথ ও সমাধি

উভয়েই ছুর্গোৎসব করেন। কিন্তু প্রকৃতিমার্গে সাধিতা দেবী স্বরথকে মনুহ-পদ-প্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন। নির্বিঘ্নচেতাঃ সমাধি নিরুত্তিমার্গে ঐ ছুর্গোৎসব করেন; এজন্য ঐ জ্ঞানশক্তি ছুর্গা তাহাকে আপনার স্বরূপতত্ত্ব যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে ছুর্গোৎসবেই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা হয়। উভয়মার্গ-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণই ইহাকে পৌত্তলিক ব্যাপার বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ফলে সেই অবজ্ঞাই তাহাদিগকে পরম-পথে বঞ্চিত করিয়াছে।

ছুর্গোৎসব-কার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিক্রম। উত্তরায়ণ বসন্তকাল শুদ্ধকাল বলিয়া লোকে বাসন্তী-পূজায় বোধন করে না। ইহার সূক্ষ্ম মর্শ্ম এই;—কেবল কুণ্ডলিনী-শক্তির নিদ্রাভঙ্গ-কালকেই শাস্ত্রে উত্তরায়ণ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর নিদ্রাবস্থায় কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, জাগ্রদবস্থাতেই সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। যথা—

“মূলাধারে স্থিতা দেবী যাবন্নিদ্রাশ্রিতা ভবেৎ।

তাবৎ কিঞ্চিন্নসিধ্যোত মন্ত্রযজ্ঞার্চনাদিকং ॥”

মূলাধারে কুণ্ডলিনী দেবী যাবন্নিদ্রাশ্রিতা থাকেন, তাবৎ মন্ত্র-যজ্ঞাদি কিছুমাত্র সিদ্ধ হয় না। এই অবস্থার নামই দক্ষিণায়ন।

অপরঞ্চ

“যদি সা বোধিতা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঙ্কটৈঃ।

তদা সৰ্ব্বং প্রসিধ্যোত মন্ত্রযজ্ঞার্চনাদিকং ॥

যদি বহুপুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ঐ দেবী মূলাধারে প্রবেশিতা হন, তবেই মন্ত্র বস্ত্র অচ্চ'নাদি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয় ।

এই নিমিত্ত দক্ষিণায়নে দেবীর বোধনের প্রথা আছে । যদি বহুপুণ্য সঞ্চয় দ্বারা তিনি জাগরিতা হন, তবে সিদ্ধি লাভ হয়,—এই উক্তিতে নবম্যাদি সকল কল্পই সম্পন্ন হইয়াছে । অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ও তপঃকর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইলে পরতত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয় ; সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় ।

শাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ে নবম্যাদিতে কল্পারম্ভ করিতে এইরূপ অনুশাসন আছে, যে দেবীর শুভাগমনার্থ পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক সংযত হইয়া কল্পঘণ্টে পূজন, স্তবন ও বন্দনাদি দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হইলে পর, তৎকালে সর্ব্ব-জ্ঞান-শক্তিস্বরূপা দুর্গাদেবীর বোধন হয় । বোধনানন্তর স্বভবনমূলে দেবীর প্রবেশ হয় । অধ্যাত্মপক্ষে বোধ শব্দে—জ্ঞান ; পরিশুদ্ধ জ্ঞান লাভার্থ পূর্ব্বে সংযম-নিয়মাদির অনুষ্ঠানে চিত্ত সুস-মাহিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছা জন্মে ; জ্ঞানের প্রতি ইচ্ছা জন্মিলে, অল্পশ্রমে ও অল্প সাধনাতেই তদ্বিদ্যা 'অর্থাৎ সেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান, স্বভবনমূলে অর্থাৎ হৃদয়াঙ্কুরে স্বয়ং প্রবিষ্ট হয়েন । ফলিতার্থ, ইহাতে বোধকের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় । এই নিমিত্ত বাহ্যে দেখাইয়াছেন, যে পূজার বহুদিন পূর্ব্বে কল্পারম্ভ করিয়া দেবীর পূজা করিলে, ষষ্ঠীতে বোধন হয় । বোধনানন্তর মূলা-যোগে সপ্তমীতে দেবীর

পত্রিকা প্রবেশ উক্ত হইয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দুর্গোৎসব কল্পে বোধন কার্যের সহিত অধ্যাত্ম-ঘটিতা তত্ত্বব্যাখ্যা সংলগ্ন হয় কি না ? দেবীর বোধনে ও অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে অভেদরূপ দেখা যায় কি না ? অতএব দুর্গোৎসব যে পরমতত্ত্ব ও পরব্রহ্মের প্রাপ্তি নিমিত্তক মুখ্য সাধনা, তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।

গৌণচন্দ্রে ভাদ্রীয়া কৃষ্ণানবমীতে বোধন হয় ; ঐ পক্ষকে অপর পক্ষ বলে। আর আশ্বিনের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ অবধি পরপক্ষ ; তাহাকে দেবীপক্ষ বলিয়া খ্যাত করা যায়। সূক্ষ্মার্ঘ্য ব্যাখ্যায় সূক্ষ্মকাল-স্বরূপে, অপর পক্ষকে অপরাবিদ্যাব অনুষ্ঠান জন্য পিতৃযান ও দেবীপক্ষকে পরাবিদ্যাধিষ্ঠান হেতু দেবযান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অপর পক্ষে পিতৃকৃত্য ও দেবীপক্ষে দেবকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং এই দুই পক্ষকে পক্ষান্তরে স্বপক্ষজ্ঞানে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ বলিয়া খ্যাত করা যায়। পিতৃলোককামী সংসারী ব্যক্তি পিতৃযান অর্থাৎ দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোকে গমন করে ; পুনর্ব্বার তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া নিয়ত বোধকর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে পুনরপি স্বর্গলোকে গমন করে এবং ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে তাহার সংসৃতির নিবৃত্তি হয় না ; সে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত দ্বারা অমাতুভব করিতে থাকে ; কোন মতেই তাহার বিশ্রান্তি-সুখ লাভ হয় না। দেবযানে

আরুঢ় হইয়া নিষ্কারণে কন্মাদি সমাপন করিলে, সূর্যালোকে গমন পূর্বক আদিত্য-দ্বারে বৈশ্বানরাখ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ; আর তাহার পুনরাবুত্তি থাকে না । এই নিগূঢ় অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-ব্যাপার নরশরীরে নিত্যই নিরুদ্ধ রহিয়াছে ; তাহাতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিতে পারিলেই জীবের নিরতিশয় পর-মাত্ম-জ্ঞান লাভ হয় ; সেই জ্ঞানবলে প্রাণায়াম-প্রভাবে বিদ্যা-প্রবোধনে পিঙ্গলাখ্য সূর্য্যদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া বৈশ্বানরাখ্য সূক্ষ্মা-প্রাণ-নাদ-শক্তিকে ভেদ করতঃ বিন্দুরূপ পরম শিবাখ্য কার্যাত্মকে প্রবিষ্ট হয় । অনন্তর জীবাত্মা উপাসনা-ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরা বিদ্যার প্রভাবে মঙ্গলদায়ক পরম শিবরূপ শরীরাত্মকে ঐ বিন্দুর সহিত পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায় । তথাহি বেদান্তঃ—

“কার্যাত্ম্যে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমাভিধানাৎ ।”

কার্যাত্ম্যে জীব কার্যাত্ম্যের সহিত পরম কারণ পরম পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয় ; তাহাকে আর দুর্গম সংসার-ভ্রমণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ।

যে পরাবিদ্যা দ্বারা পরম্যা শাস্তি লাভ হয়, সেই দুর্গা ভেদিনী পরমাত্ম-স্বরূপা পরা বিদ্যাকেই এ স্থলে দুর্গা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কেন না, সেই জ্ঞান স্বরূপা বিদ্যা প্রসঙ্গা না হইলেও দুর্গতি নাশ হয় না । যথা সপ্তসতী—

“স বিদ্যা পরমা মুক্ত্যর্হেতুত্বা সনাতনীতি ।”

সেই পরমা বিদ্যাই নিত্য ও মুক্তির হেতুভূতা হয়েন ।  
অপরাবিদ্যা সংসারবন্ধনের হেতুভূতা । যথা তত্রৈব—

“সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সৰ্ব্বেশ্বরেশ্বরীতি”

সৰ্ব্বেশ্বর অর্থাৎ কার্যাত্মক হিরণ্যগর্ভাখ্য দেব ; যিনি তাঁহার  
ঈশ্বরী অর্থাৎ নিয়ন্ত্রী হয়েন, তিনিই সংসারবন্ধের কারণরূপা ,  
যথা শ্রুতিঃ—

“ঋক্‌যজুঃসামাণর্কশিক্ষাকল্পনিকৃতচ্ছন্দো

ব্যাকরণজ্যোতিষমিতাপরা ।

“ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—ইতি । ”

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এই চারি বেদ এবং শিক্ষা,  
কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ,— এ  
সমস্তই অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ ইহাতেই কৰ্ম্মকাণ্ড-বিধি ।  
সুতরাং প্রণবাবলম্বন পর্য্যন্ত সপ্তাণ বিষয়, তাহাতে পুনরা-  
বৃত্তির নিবৃত্তি নাই । যদ্বারা অক্ষর পরমাত্মাতে জীব একী-  
ভূত হয়, তাহাই পরা বিদ্যা । চন্দ্র পর্য্যন্ত অবিদ্যা ; পিতৃ-  
লোককামী চন্দ্রগামী হইয়া তথা হইতে পুনরাবৃত্ত হয় ।  
সূর্য পর্য্যন্ত বিদ্যা পরা-প্রকৃতি ; তদ্বারা পরমপদপ্রাপ্ত  
সাধকের পুনরাবৃত্তি থাকে না ; ইহারই নাম বিশ্রান্তি । এ  
সুখ লাভ কেবল পরাবিদ্যার প্রসন্নতাতেই হইতে পারে ।  
কিন্তু এ সাধনার সাধক জীব অতি বিরল । এই নিমিত্ত  
অধ্যাত্মসাধনরূপ বিদ্যা প্রবোধনচ্ছলে শারদোৎসব-পর্বেপি-

লক্ষে দেবীর বোধনাদি ক্রিয়া বাহ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। অর্থাৎ দুঃসাধ্যবস্তুকে সুসাধ্যরূপে লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মন্দভাগ্য, মন্দবুদ্ধি, মন্দায়ুঃ, অজ্ঞ জীবেরা তত্ত্ব-জ্ঞানানুষ্ঠান করিতে পারুক বা না পারুক, অনায়াস-সাধ্য দুর্গোৎসব উপলক্ষে পরা বিদ্যার অর্চনাতে সেই নিরতিশয় আনন্দ-সন্দেহে তদ্বিস্ময় পরমপদে অভিগমন করিতে পারিবে। লোকদিগকে দুর্গা-মহোৎসবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব জানাইবার জন্য ভগবান্ ভব উহা বিস্তৃতরূপে আগমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন তদ্বিস্ময় পরমপদরূপে বারানসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান সকল পৃথিবীতে দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ দুর্গা-মহোৎসবও পরমাত্মতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজা করিলে পূজক ব্যক্তি আত্মতত্ত্বরূপে সংসারে থাকিয়াও বিশ্রান্তি স্থখ লাভ করে। সংসারী ব্যক্তি পিতৃঘানে আরুঢ় থাকিয়াও নিকাম কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া যেরূপে পরমাত্মতত্ত্বলাভ করিবে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে পিতৃপক্ষের নবমীতে কল্লারস্ত করিয়া দেব্যাকর্না করিবার বিধি দিয়াছেন। কৰ্ম্ম দ্বিবিধ; ভোগ-সংযুক্ত ও জ্ঞান-সংযুক্ত। সেই জ্ঞান-যুক্ত-কৰ্ম্ম পিতৃপক্ষ হইলেও ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিবলে মোক্ষবিরোধী হয় না। এক পিতৃপক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। অষ্টমীর পর নবমী অবধি পরপক্ষ অর্থাৎ দেবপক্ষে সংযোজিত আছে। এতাবতাইহাই প্রবোধ দিয়াছেন, যে, নিরন্তর সংসারে কৰ্ম্মকাণ্ডে

যুক্ত থাকিয়াও বৈরাগ্য;পদবীতে গমন পূর্বক জীবগণ পশ্চি-  
মুক্ত হইতে পারে।

কিঞ্চ,

“বদহরেব বিরজোৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ”

সংসারে থাকিয়া যে দিন বিরক্ত হইবে, সেই দিনই  
সম্যাসী হইবে।

এই জন্য পিতৃপক্ষে পিতৃকৃত্য করিতে করিতে তন্মধ্যেই  
নবমীতে জ্ঞানস্বরূপা দুর্গার অর্চনা বিধি উক্ত হইয়াছে। অপ-  
রন্ত, ইহার নাম পঞ্চব্রত; পঞ্চান্তরে পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অব-  
রোধ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত  
তন্মাত্র এই পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তি আবরণের নামও পঞ্চব্রত।  
ইহাতেও বোধনশব্দ প্রযুক্ত করা যায়। যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞান  
প্রাপ্তীচ্ছায় আত্মার উপাসনা করিতে করিতে যে বোধোদয়  
হয়, তাহার নাম বোধন। যথা -

ঈষে মাস্যাসিতেপক্ষে নবম্যা মার্জযোগতঃ।

শ্রীবক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥

ইহার স্থূল অর্থ এই যে,—ঈষ অর্থাৎ আশ্বিন মাসে কৃষ্ণ-  
পক্ষে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে, আমি যাবৎকাল  
পূজা করিব, তাবৎকালের জন্য শ্রীবক্ষে অর্থাৎ শ্রীফলবক্ষে,  
তোমার বোধন করিতেছি।

ফলিতার্থ,—ইহার অন্তরে অধ্যাত্ম তত্ত্ব-ঘটিত অর্থ গুপ্ত  
আছে।



তথাহি—

“ঈশাবাস্যমিদং সৰ্বং বৎকিঞ্চিজগতীং জগৎ ।

ভেন ত্যক্তেন ভূতীথাঃ মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং ॥”

হে ঈশ ! হে পরমেশ্বর ! তুমি এই জগতের অন্তরাত্মা, জগতীতে প্রপঞ্চভূত যে কিছু জগৎপদার্থ, তাহা তোমার দ্বারা আচ্ছাদিত ; সেই প্রপঞ্চ পরিত্যাগে সত্যাত্মা তুমিই ব্যাপ্ত থাক ; তোমাকে জানিলে স্বরূপতত্ত্ব বোধ হয় ; ইত্যাদি ।

অর্থাৎ স্বরূপতত্ত্ব বোধ হইলেই বোধন শব্দের চরিতার্থতা হয় । এই কারণে নবমী-বোধনে ঈশাবাস্য শ্রুত্যাভিপ্রায়ে “ঈষে মাস্যসিতে পক্ষে” বলিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয় । সেই প্রার্থনাবোধক বাক্যার্থের নাম নবম্যাদি কল্পে বোধন । পিতৃযান—দক্ষিণায়ন ; সেই পিতৃপক্ষের নবমী অবধি দেবপক্ষ উত্তরায়ণ—পূর্বোক্ত বিচারে সম্পন্ন হইয়াছে । অর্থাৎ পিতৃকামী ভোগার্থী ব্যক্তির যে দিবস বিবেক জন্মে, সেই দিনকেই ষোড়শকলা পরমাত্মার নবম কলা এবং তৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নবমকলাপ্রাপ্ত সাধক বলা যায় । কৃষ্ণপক্ষ শব্দে—এখানে কৃষ্ণবর্ণ তমঃপক্ষ ; অর্থাৎ শাস্ত্রকর্তার পরমাত্ম তত্ত্ব উদয় না থাকা প্রযুক্ত ভোগার্থ ক্রিয়াকালকে তমঃপ্রধান সময় জানিয়া কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কৰ্ম্মাত্মিকা অষ্টম কলার বোধ করাইয়াছেন । কিঞ্চিৎ বিবেকোৎপত্তি বিধায় নবমী কলাকে তত্ত্বভূতা বলিয়া উক্ত করেন ।

“আর্দ্রযোগতঃ” এই পদের অর্থ এই যে, যোগহেতুক চিত্ত আর্দ্র হওয়াতে। যোগ শব্দে আত্মজ্ঞান। তৎপ্রাপ্তির উপযোগী বলিয়া অষ্টমী কলা, অষ্টাঙ্গ-যোগ-স্বরূপ হয় ; অর্থাৎ পূজাজপাদি দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। তৎ প্রভাবে জীবের কঠিন চিত্ত আর্দ্র হয়। তজ্জন্যই তদ্বোধনের পূর্বে পূজাদি করণের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত

“শ্রীযুক্ষে বোধয়ামি য়াং যাবৎ পূজাং করোম্যহং।”

হে পরমাত্মন! আমি যাবৎ পূজাদি করিব, তাবৎ তোমাকে শ্রীফলযুক্ষে বোধন করাইব,—এইরূপ উক্ত হয়। অর্থাৎ তুমি সত্যাত্মারূপে জগদ্ব্যাপ্ত, সেই জগদ্রূপ তোমাকে সাধকের বোধ করাইব। যখন, চিন্তাসমাহিত হইলে বাহ্য পূজা থাকিবে না, তখন তন্ময় হইয়া যাইবে। জগৎ শব্দে এই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড পদে বিরাট। অর্থাৎ জগদীশ্বর বা ঐশ্বরী শক্তি বিরাটরূপে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রসুপ্তবৎ রহিয়াছেন। তদীয় স্বরূপ-বোধের নামই শ্রীযুক্ষে বোধন ; তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ;—ইহাই সকলকে প্রতিবোধিত করার নাম “বোধন” বলা হইয়াছে। যদি বল, শ্রীফলযুক্ষে বোধন শব্দ আছে ; ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রসুপ্তি—এরূপ ব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারে ? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—শ্রীশব্দে ঐশ্বর্য্য ; ঐশ্বর্য্যই বাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল। সূতরাৎ শ্রীফলযুক্ত বলাতেই ব্রহ্মাণ্ড শব্দ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, যদি শ্রীফল শব্দে বিলম্ব হয়, ব্রহ্মাণ্ড

না হয়, তবে কি দেবী সেই কণ্টকময় বৃক্ষাশ্রে শয়ন করিয়া  
আছেন? পূজার কালে কি নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বৃক্ষ হইতে  
নামাইবার নিমিত্ত এই বোধাত্মক মন্ত্র প্রতিপন্ন হইয়াছে?  
স্বরূপতঃ রূপকব্যাজে শ্রীফল শব্দে ব্রহ্মাণ্ড; তাহাতে প্রসুপ্ত  
চৈতন্যশক্তির উদ্বোধনের নাম শ্রীবৃক্ষে দেবীর বোধন, তাহাতে  
সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ

“যথৈব রামেণ হতো দশাস্য তথৈব শত্রুণ বিনিপাতয়ামি।”

রাম যেমন দশাস্যকে নিহত করিয়াছিলেন, আমিও সেই-  
রূপ শত্রুগণকে বিনিপাতন করিব।

এই অপর মন্ত্রার্থের তাৎপর্য্য বিবেচনা করা যাইতেছে।  
ইহাতে রামায়ণোক্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ করিলেই  
প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হইবে। “দশাস্য” হত ব্যতীত রাব-  
ণের অন্য নাম উল্লেখ করিয়া “হত” এই বিশেষণ প্রযুক্ত  
হয় নাই। স্মরণ্য এহলে পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, মহামোহ  
রাবণ, মহামোহের প্রধানগু কাম ক্রোধাদি দশটী আস্য,  
এরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে,—  
পরমাত্মা কর্তৃক দশাস্য মহামোহ যেরূপে হত হইয়াছে,  
আমিও সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বোধ দ্বারা মহামোহকে বিনষ্ট  
করিতে অভিলাষ করিয়াছি। রামের সহিত আপনার সাদৃশ্য  
দেওয়ায় দোষ হয় না; যেহেতু,—

“ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি”

শ্রুতিঃ ।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্ম-  
তত্ত্ববিৎ তাহাকে আত্মাই বলা যাইতে পারে। অতএব  
পরমাত্মস্বরূপ রামচন্দ্রের সহিত তাহার উপমান-উপমেয়-  
ভাব অসঙ্গত হইতে পারে না। অপর, শ্রীফল বৃক্ষের ব্রহ্মা-  
ণ্ডত্ব সিদ্ধ হইলে, দেহীর দেহকে শ্রীফল বলায় বিরোধ  
থাকিল না। যথা—

“পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োৰভেদ ইতি”

মনুষ্য শরীরে ও ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ।

কিঞ্চ

“ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে।”

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, কলেবরেও তাহা আছে।

অর্থাৎ শ্রীই শরীরের ফলস্বরূপ। একারণ এখানে দেহকে  
শ্রীফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীফলে ব্রহ্মরূপা-  
জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীবশরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্য শক্তির  
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্নিদ্রাভঙ্গ-পদে চৈতন্যরূপা কুল-  
কুণ্ডলিনীকে বোধ করাইবার কথা বୁঝিতে হইবে। সেই  
জ্ঞানশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গার্থে অনেক জপ, তপঃ,  
পূজা ও যোগাদি করিতে হয়; তাহার বোধন না হইলে  
কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু প্রাণায়াম ও জপ যজ্ঞ বিনা  
তাঁহার বোধন হয় না; সুতরাং দুর্গোৎসব উপলক্ষে অধ্যাত্ম-

তদ্বাছেষণ পক্ষে ভোগপর তমোময় অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে প্রসুপ্ত-  
বৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত অপরপক্ষে নবম কলায়  
ত্রীমুখে বোধনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত  
বাহ্য-পূজোপদেশে দেবীর বোধন এখানে স্বরূপার্থ সঙ্গত হয়  
না ; যেহেতু প্রথমতঃ দেবীর নিদ্রাই অপ্রশস্ত ; দ্বিতীয়তঃ  
স্বকোপরি শয়ন অত্যন্ত অলীক। সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্ব বোধই  
এ বোধনের স্বরূপার্থ জানিতে হইবে। নবম্যাদিকল্পে দেবীর  
বোধনাভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর ষষ্ঠ্যাদি কল্পে  
দেবীর সায়ংকালের বোধন-তাৎপর্য ব্যক্ত হইতেছে।

“ষষ্ঠী” এই সংখ্যাবাচক শব্দটি উপাসনা ভেদের সময়  
বিশেষ এবং কালাবয়ব অর্থাৎ তিথি ও যোগাবয়ব এই  
তিনেরই বিশেষণ। যথা, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম,  
ধ্যান, ধারণা, সমাধি, এই ষড়ঙ্গযোগ। এস্থলে প্রতিপৎ  
আসনযোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযমনযোগ,  
তৃতীয়া প্রাণায়াম যোগ, চতুর্থী ধ্যানযোগ, পঞ্চমী ধারণা যোগ,  
ষষ্ঠী সমাধিযোগ ; ইহা প্রতিপদাদি তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য  
দানচ্ছলে বোধিত হইয়াছে।

প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে ; ইহাতেই আসন-  
যোগ বলা হইল। দ্বিতীয়াতে কেশ সংযমনার্থ ভোরক দান-  
চ্ছলে ইন্দ্রিয়সংযমন প্রত্যাহার যোগ উক্ত করিয়াছেন। তৃতী-  
য়াতে নাসাভরণ স্বর্ণ-রজত-নির্মিত তিলকদানচ্ছলে প্রাণায়াম  
যোগ উক্ত হইয়াছে। রজতাকার ইড়া স্বর্ণাকার জ্যোতিশ্ময়ী

পিঙ্গলা—নাশাভ্যন্তরচারিণী পুরকরেচকাদিলক্ষণসমষ্টিতা ;  
 স্ততরাং ইহাতে প্রাণায়াম যোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে । চতু-  
 র্থীতে উচ্চাবচকলদানচ্ছলে, জগতের অভিলষিত ফল প্রদাতা  
 পরমেশ্বরের অনুস্মরণরূপ ধ্যানযোগের উপদেশ প্রদান করা  
 হইয়াছে । পঞ্চমীতে কঙ্কতিকা-দানচ্ছলে ধারণাযোগ কথিত  
 হয় ; কারণ, অসার বজ্জন পুরঃসর সারবস্তুসম্ভারণই ধারণা-  
 যোগ । ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য ও মধুপর্ক প্রদানচ্ছলে সমাধিযোগো-  
 পদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । কারণ—মধুধারাপানে আসক্ত ব্যক্তির  
 বাহ্যজ্ঞান যায় ; সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয় ।  
 স্ততরাং সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী এক এক যোগের  
 যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদৃচ্ছান্ত স্বরূপে কালাবয়ব প্রতি  
 পদাদি তিথিক্রমে এক এক দ্রব্য দানচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগোপদেশ  
 প্রদত্ত হইয়াছে ।

অপরন্তু সাধক ব্যক্তি জন্মময়, প্রাণময় ও মনোময় এই  
 কোষত্রয়ে উত্তীর্ণ হইয়া সমাধির অবসানে, বিজ্ঞানময় কোষে  
 অবস্থান করিবেক, দুর্গোৎসবকল্পে তাহাই সঙ্কেত দ্বারা কথিত  
 হইয়াছে । যথা,—প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী,  
 ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্পপূজোপলক্ষে ষষ্ঠী অবসানে অর্থাৎ সায়াংকালে  
 বোধন করিতে কহিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও  
 বিজ্ঞান প্রাপ্তির নাম বোধন ; স্ততরাং সমাধির পর বিজ্ঞান  
 কোষপ্রাপ্ত সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর  
 প্রবোধন হয় । তদ্বোধন ব্যতীত বিশ্রান্তিস্থ লভ হয় না ।

জ্ঞানস্তর সপ্তমী, অষ্টমীও নবমীতে আনন্দময়কোষপ্রাপ্ত জীব, জীবমুক্তের ন্যায় নিত্য মহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। একারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহা-মহোৎসব নবমীতেই হয়। ইহাকেই শারদোৎসব বলে। এই তত্ত্ববোধনোপদেশ নবমীকালে শ্রীকৃষ্ণে দেবীবোধনেই বোধ করিতে হইবে।

কিঞ্চ,—

বাখীত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শ্রীফলবৃক্ষমূলে অর্চনা করিয়া এই মাত্র মন্ত্র পড়িয়া থাকে।

“ঐং রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় চ।

অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্থয়ি কৃতঃ পুরা ॥

অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি তং।”

হে দেবি ! রাবণের বধের নিমিত্ত, আর শ্রীরামের প্রতি অনুগ্রহ জন্য ব্রহ্মা তোমাতে অকালে বোধন করেন। অত-এব আশ্বিনী ও আশ্বিনে ষষ্ঠীতে সায়াংকালে বোধন করি। ইত্যর্থে, শ্রীফলবৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডমূলে চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিতা; তাঁহার বোধ না হইলে ব্রহ্মপুরে গতি হইতে পারে না। ষষ্ঠী শব্দে—ষড়ঙ্গ-যোগান্তঃসমাধি; সায়াং পদে—দিবাবসান; ব্রহ্মা-শব্দে—হিরণ্যগর্ভ; হিরণ্যগর্ভার্থে—জীব; পরমাত্মা-রাম; তৎপ্রসন্নার্থ জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন অর্থাৎ এখানে সমাধিবোগের অবসানে জীব আত্মতত্ত্বের প্রসন্নভাবার্থ-

এবং রাবণ পিদে মহামোহ, তদ্বিনাশার্থ আত্মতত্ত্ব-প্রাপ্তির পূর্বে দেবী জ্ঞানশক্তি মহাবিদ্যা কুলকুণ্ডলিনীর বোধন করিতে কহিয়াছেন। অকালে অর্থাৎ সংসারাসক্তিকালে, আমিও তোমার বোধন করিতেছি। ইত্যভিপ্রায়ে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির কর্তব্যতা স্পষ্টরূপে পূজাঙ্গ দেবী বোধনে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই বোধনের স্বরূপার্থ বোধ করিতে পারিলে দুর্গোৎসবেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হইতে পারে ; ইহাতে পরিত্রাজকতার অপেক্ষা রাখে না। সংসারে কশ্মে নিযুক্ত থাকিয়াও বিযুক্ত-ফল দেব্যাকর্ষনায় নিরতিশয় মুক্তি লাভের কিছুমাত্র ব্যাঘাত নাই। যত দিন এ বোধ না জন্মিবে, ততদিন বিলম্বমূলে বিঘট-ঘট-বোধে ঘটনামাত্রই সার হয় ; স্বঘটে ঘটনা না ঘটিলে যথার্থ বোধন হইবে না।

এই দুর্গোৎসব ক্রিয়ার অনুক্রমণিকা এই যে,—

আর্দ্রায়ান্ বোধয়েদেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ।

পূর্বোক্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ ॥”

আর্দ্রায়ুক্ত অপরপক্ষীয় কৃষ্ণা নবমীতে ত্রীমূর্ত্তে বোধন, মূলায়ুক্ত সপ্তমীতে প্রবেশন, পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী ও উত্তরাষাঢ়ায়ুক্ত নবমীতে অর্চন, শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দশমীতে বিসর্জন করিবে।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, যোগার্চচিত্তবৃত্তিতে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের নাম বোধন,—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। মূলে প্রবেশের স্বরূপার্থ এই,—মূলা নক্ষত্র উপলক্ষণ মাত্র ; শুক-



প্রাণায়াম-যোগ-সিদ্ধির কারণভূতা কুলকুণ্ডলিনী জগদ্যোনি,  
জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, ভূতশুদ্ধ্যঙ্গিকশক্তির সহিত জীবের  
মূলাধারে স্নয়মানবৃত্তে প্রবেশের নাম মূলাতে প্রবেশন। পূর্বো-  
ক্তরে পূজনার্থে অষ্টমী কলাতে প্রবৃত্ত সাধক, পূজা জপাদি  
সহকারে সগর্ভ প্রাণায়াম করিবে; উত্তরে নবমী কলাতে  
প্রণবাবলম্বন পূর্বক প্রাণধারণা করিবে; তদর্থ পূজা জপাদির  
আবশ্যকতা আছে; অর্থাৎ যে সাধক অন্নময়াদি কোষত্রয়গত  
হয়েন, তাঁহাকেই যোগশাস্ত্রে প্রাপ্ত-সমাধি বলিয়া খ্যাত  
করিয়াছেন। বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-কোষ-প্রাপ্ত-সাধক  
জীবমুক্তপ্রায়; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিয়া ও  
থাকেন। যাদৃশ প্রাপ্ত-বিজ্ঞানময়-কোষ সাধকের পূজায় যন্ত্রাদি  
সহকারে পূজা করিবার বিধি আছে, তাদৃশ আনন্দময়-কোষ-  
প্রাপ্ত সাধকের যন্ত্রাদি প্রকাশের অপেক্ষা নাই; তিনি পূর্ব-  
কল্পিত ঘট ও পূর্বাঙ্কিতযন্ত্রে যদৃচ্ছাক্রমে গন্ধ-পুষ্পদান  
মাত্র করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে; আনন্দময়ীর প্রসঙ্গ-  
তাতে আনন্দময় হইয়া যাবৎ দিন যাপন করিব;—যাবৎ  
দিন পদে, যে পর্য্যন্ত পরমায়ুর ইয়ত্তা, সেইকাল পর্য্যন্ত সর্ব  
বন্ধন পরিত্যাগ পূর্বক দেহ যাত্রা সমাধান করিব। প্রণবাব-  
লম্বনে যে কালক্ষেপ করিবার বিধি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে  
ধন্যাঙ্গক নাদশক্তির সমাশ্রয় করিলেই দেহের দক্ষিণান্ত  
হয়। আনন্দময়-কোষপ্রাপ্ত যোগীর মানাপমান, লাভালাভ,  
হেয়োপাদেয়, শুভাশুভ জন্মাদির বিশেষ বোধ থাকে না।

তাদৃশ ব্যক্তি সলজ্জ ও বিলজ্জ জ্ঞানের উপেক্ষা করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ তিনি লোকলজ্জানুরোধ করেন না,—সর্বদাই আনন্দপ্রকাশে যত্নপর হইয়া যাহাতে আত্মার আনন্দ হয়, তাহাই করিতে থাকেন। এই রাজযোগীর যোগসিদ্ধিলক্ষণ জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে দেবীমহোৎসবে নবমীপূজার বাহ্য ব্যবহার দেখাইয়াছেন। স্বঘটে জ্ঞানশক্তির প্রবেশ মূলাধারে হয় ; একারণ সপ্তমীতে বাহ্যে মুখ্যাদি ঘটস্থাপনা করিয়া আবাহনাদি করে ; তাহার প্রমাণ মানসপূজায় শিরঃসহস্রারস্থ ইন্দ্ৰদেবতারূপে পরমাত্মাকে স্বহৃদয়ঘটে অধিষ্ঠিত করিয়া মানসোপচার প্রদানে পূজা করিবার পদ্ধতি চির-প্রথিত। সেই পূজাই বাহ্যে কল্পিত ঘটে ঘটিয়া থাকে ; স্তবরাং ফলে পূজার পরতত্ত্ব ঘটয়া উঠিয়াছে। অষ্টমীতে পুনর্ঘট ও ভদ্রমণ্ডলাদি যন্ত্র নির্মাণ করিয়া বাহ্যরূপে পূজা করিয়া থাকে ; অর্থাৎ শরীরস্থিত সমস্ত তত্ত্বকে লক্ষ্য করিবার উপায়ার্থ আবরণ-দেব-দেবীরূপে গন্ধপুষ্প দানচ্ছলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যেহেতু পীঠপূজা ও আবরণপূজার মন্ত্রার্থেই প্রকাশ আছে যে, এ সকল বাহ্যবিষয়মাত্র নহে। তথাহি প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধির সহিত বাহ্যসম্বন্ধের ঘটনা হয় না ; উহার ফল কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃকান্যাসও শরীরাত্ম্যন্তরবৃত্তির আবৃত্তি মাত্র। যথা “আধারে লিঙ্গ নাভো” ইত্যাদি মন্ত্রে শরীর যে কালাত্মক, সেই তাৎপর্য প্রকাশ পাইতেছে।

“পঞ্চাশত্ৰিপিতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থে বাঁহ্যাবয়ব উপলক্ষে বর্ণমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ পূজকেরা যে সকল বর্ণাত্মক মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা সাধকের শরীর হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। সুতরাং মন্ত্র সকল যে আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা ঐ পূজাছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পীঠপূজা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিপোষক। হৃদাহর পরমাত্মার পীঠ। বাহ্যে যত আধার সেই সমস্ত আধারই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছে। একারণ “হৃদি আধার-শক্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ পুষ্প প্রদান করা হয়। কিন্তু বাহ্য পূজাকালে ঐ পূজা মানসে বা জল্পনাতেই সম্পন্ন হয়। তাহার একপীঠও কন্মিনকালে কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় না। কুর্শ্ব, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদী, সিংহাসন এবং দক্ষিণস্কন্ধে অভ্যাস ও অধর্ম, বামে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য, দক্ষিণে ঐশ্বর্য ইত্যাদি সমস্তই অচাক্ষুষ বিষয়। চতুর্থতঃ আবরণশক্তি পূজা ক্রমে ধ্যান, সৌম্য, রোদ্ভা, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি, মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্রান্তি, জাতি, শাস্তি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, শোভা, বৃষ্টি, প্রাপ্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ব্যাপ্তি, অনসূয়া প্রাপ্তি, চিতি ইত্যাদি সমস্তই সর্বশক্তিমান পরমাত্মার উরুশক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপে বিখ্যাত। অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যতীত ইহারা যে দেবী-মূর্তিরূপে প্রকাশিতা, কোনক্রমেই এরূপ উপলব্ধি হইবার

বিষয়ীভূতা নহে। সুতরাং অষ্টমীপূজাছলে বিজ্ঞানময় কোষের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। দুর্গোৎসব করিয়া যে ব্যক্তি একরূপ বোধ করেন যে, আমি যুগ্মী বা অন্যবিধ প্রতিমায় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেব-দেবীগণের পূজা করিতেছি, তাঁহার প্রতি বোধের নিমিত্ত ভগবান্ ভূতনাথ প্রকারান্তরে ঐ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ, মহানবমী উত্তর কার্য্য হইলেও তাহাতে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহাতে ঘট-যন্ত্রাদির অপেক্ষা নাই; ইহারও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা উচিত। তথাপি পূর্ব্ব কৰ্ম্ম ফলে বিজ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকের বিশেষ আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দরসে মগ্ন হইয়া সাধক ব্যক্তি পূজা সমাপন করিবার কামনায় যত্নবান্ হয়। সুতরাং এককালে প্রভূতোপচার দ্বারা অচ্চর্নামাত্র করিয়া কার্য্যে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণান্ত করে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমার আর পূজায় বিশেষ আদর নাই; আমার ইচ্ছা পূজন কৰ্ম্ম এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। কিন্তু, হোমচ্ছলে ইহা জানাইতেছেন যে, আমি ব্রহ্মায়িতে সমস্ত কৰ্ম্মকে আহুতি দিয়া ভস্মীভূত করিয়া এক্ষণে বাহ্য লৌকিক কৰ্ম্মে আর আবদ্ধ থাকিব না; যাবৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকিব, তাবৎ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মভূতপ্রায় ও আনন্দময় বিগ্রহে প্রণবোচ্চারণে নিবিষ্টচেতাঃ হইয়া যথারূচি তথা ব্যবহারে কেবল আনন্দসূচক সংগীতেই কালক্ষেপ করিব।

এই উপদেশের নিমিত্ত “নবম্যাং শারদোৎসবঃ” অর্থাৎ সেই দিন জাতি বিজাতি-জ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবল তত্ত্বোবাধ

সংগীতাদি করিবে; ইহাতে লোক-লজ্জানুরোধে আপন আনন্দের বিরাম করিবে না—এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এদিকে জীবমুক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ লৌকিক কার্যে শঙ্কা-রহিত হয়, ইহা জানাইয়া গিয়াছেন।

শারদীয় দুর্গাপূজাদীভূত বিসজ্জন কল্পকে তত্ত্বজ্ঞানানুকল্প রূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরমার্থ বিষয়ে আনয়ন করাই পুরুষার্থ-সিদ্ধির কারণ। আদৌ বিবেচনা করা কর্তব্য যে, দুর্গোৎসবের বিশেষ তাৎপর্য একবচনেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা,—

“আত্মায়াং বোধয়েদেবীং মূলে নৈব প্রবেশয়েৎ।

পূর্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ ॥

আত্মে বোধন, মূলে প্রবেশন, পূর্বোত্তরে সংপূজন, শ্রবণে বিসজ্জন করিবে।

দেবী শব্দে বিদ্যা, অর্থাৎ পরাবিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) যোগা-র্জচিত্ত-বৃত্তিতে উদ্বোধিত হয়। সেই পরাবিদ্যা কুণ্ডলিনী শক্তির মূলাধারে অর্থাৎ স্বয়ম্ভুরক্ষে প্রবেশ চরলগ্নে অর্থাৎ ইড়াতে হয়। চরাংশে পিঙ্গলায় প্রবেশেও প্রবেশন গণ্য হয়। অনন্তর স্থিরলগ্নপদে সুষুম্নাছিদ্র; তাহাতে প্রবেশ করাতে কুস্তক হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার সমতাবস্থাতে সুষুম্নাস্থ বায়ুর স্থিরতার কালকে দ্ব্যঙ্গক লগ্ন কহিয়া থাকে। এই মূলাধারপ্রবেশের নাম মূলে প্রবেশন। কিন্তু পূর্বোত্তরে পূজার অভিপ্রায় এই যে, সকামনিকামভেদে পূজা দ্বিবিধ। যে পর্য্যন্ত ফলাভিলাষের বিরতি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের

পূর্বাবস্থা ; অর্থাৎ বিনাভোগে মোক্ষপ্রবৃত্তি জন্মে না ; সুতরাং সাধক ব্যক্তি ভোগে অভিলাষী থাকিয়া পূজনাদি দ্বারা জ্ঞানাবিলাষ করে । যখন ফলাভিসন্ধানের প্রয়োজনাভাব হয়, তখন সাধকের উত্তরাবস্থা ; তৎকালে চিত্তশুদ্ধি রাখিবার জন্য নিকারণে পূজাদি করিবে ;— এই নিমিত্ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, যে “পূর্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য ;” সুতরাং পণ্ডিতগণ দুর্গোৎসবের কাম্যত্ব ও নিত্যত্ব উভয়ই স্থির করিয়া গিয়াছেন । “আত্মা বা অরে শ্রোতব্যা মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ-কারকর্তব্যশ্চেতি” আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎ-কার করিতে হয় । এই শ্রুতি প্রমাণের ফল প্রদর্শনার্থে সিংহা-বলোকন ন্যায়ে শ্রুত্যাঙ্ক চতুর্বিধ সাধকের অবস্থাভেদ দ্বারা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । বোধনানন্তর মূলাধারে চৈতন্য-শক্তি প্রবেশের নাম “ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ;” অষ্টমীতে মননদ্বারা জ্ঞানাস্বরূপ শাস্তি-পুষ্টিাদির অনুস্মরণ ও ভদ্রমণ্ডলে আবরণশক্তি পূজ-নের নাম আত্মার “ মনন ।” নবমীতে সাধক আনন্দময় হইয়া আপনাতে দেবীরূপ ভাবনা দ্বারা উৎসবাস্থিতচিত্তে হর্ষোৎ-সাহ প্রবৃদ্ধি করিবে, ইহার নাম আত্মার ‘নিদিধ্যাসন’ । যখন নবমীর শেষে কেবল আনন্দের প্রতি নির্ভর করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, তখন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে সাধকের আর বিশেষ পূজার প্রয়োজন নাই ; তবে ইচ্ছামত পূজা করিলেও হানি নাই । সেই অবস্থার নাম জীবমুক্তি । তাহাতে

কেবল আত্মার “শ্রবণ” প্রয়োজন হয় ; এজন্য “আত্মাই শ্রোতব্য” বলিয়া ঐশ্বর্য অনুশাসন করিয়াছেন ; অর্থাৎ যুক্ত পুরুষেরা সর্বোপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মার শ্রবণেই জীবন-তিপাত করিবেন ; পূর্বান্ন যাবৎ কৰ্ম্ম, সেই তাবৎ কৰ্ম্মই আত্ম-শ্রবণ দ্বারা বিসৰ্জ্জন করেন । তত্ত্বজ্ঞান সাধনের পক্ষে আত্মার শ্রবণই সর্বপ্রধান কৰ্ম্ম । ইহা জানাইবার জন্য “শ্রবণেন বিসৰ্জ্জয়েৎ” বলিয়াছেন । অতএব সৰ্ব্ব বেদ বেদান্তাদি প্রমাণে তত্ত্বজ্ঞান সাধনার উপদেশাভিপ্রায়ে দুর্গোৎসব কার্য্য সৰ্ব্বকালই জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ।

অতএব দুর্গোৎসব কৰ্ম্মের উহ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় । যাহারা এই স্বরূপার্থ পরিগ্রহে দুর্গোৎসব করেন, তাহাদিগের ঐশ্বর্য-প্রতিপাদ্য নিরতিশয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব লাভের ব্যাঘাত নাই । সকল পুরাণ, সকল সংহিতা, সকল বেদবেদান্তাদিতে দুর্গাদেবীকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপাকার ব্রহ্মময়ী বলিয়া উক্তি করিয়াছেন । তবে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের পথে চলে না, অথচ জ্ঞানান্ধিমায়ী হয়, তাহারাই সামান্য ক্রিয়া বলিয়া দুর্গোৎসবদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে । তন্নিমিত্ত দুর্গোৎসবের মৰ্য্যাদার হানি হইতে পারে না ।

এক্কে নবপত্রিকা সংগ্রহ ও তৎপূজন দ্বারা কিরূপ তত্ত্বোপদেশ পাওয়া যায়, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে ।

“রস্তা কচী হরিদ্রা জয়ন্তীবিষদাড়িমো ।

অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকাঃ ॥”

রস্তা, কচী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিষ, দাড়িম, অশোক, মানক ও ধান্য এই নববৃক্ষে নবপত্রিকা হয় । এই নবপত্রিকা অপরাজিতা লতা দ্বারা পরিবেষ্টন করিবার বিধি ও ব্যবহার আছে । ইহার তাৎপর্য্য এই,—সরস্বতী-নাড়ী তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী । ঐ নাড়ীর ছিদ্রে প্রাণবায়ুর সঞ্চারে জ্ঞানোপ-যোগিনী মেধা জন্মে । সেই মেধা বিষ্ণুবৎ সর্ব-প্রবেশন-শক্তিমতী । একারণ, তাহার নাম বিষ্ণুক্রান্তালতা । ঐ বিষ্ণু-ক্রান্তা লতার নামান্তর অপরাজিতা লতা । সুতরাং অপরা-জিতা বেষ্টিনের তাৎপর্য্য এই যে, মেধাকে পরাজয় করিতে কেহ পারেন না । সত্ত্বরজস্তমোগুণাকারে ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞান-রূপকে ত্রিবিধ বেষ্টিন করিয়া রাখিলে সাধকব্যক্তি অস্থায়িত-রূপে তত্ত্বজ্ঞান-সোপানে স্থির থাকিতে পারে । ইহা জানা-ইবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বারম্ভক রস্তাতরুকে অপরাজিতা দ্বারা বন্ধন করিতে কহিয়াছেন । তাহার তাৎ-পর্য্য অচর্চনমন্ত্রার্থেই সুব্যক্ত আছে । যথা—

রস্তাঞ্চ দ্বিভুজাং পীতাং শূলপুস্তকধারিণীং ।

পূজয়েৎ কামবীজেন মন্ত্ৰেণানেন শঙ্করি ॥

চুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ।

রস্তারূপেণ মে দেবি শাস্তিঃ কুরু নমোহস্ত তে ॥

হে শঙ্করি ! রস্তাকে পীতবর্ণা, দ্বিভুজা, শূল ও পুস্তক-



ধারিণীরূপে ধ্যান করিবে এবং কামবীজ-মন্ত্রে পূজা করিবে।  
যথা—হে দুর্গে দেবি ! তুমি মম গৃহে সমাগমন করতঃ রম্ভা-  
রূপে আমার শান্তি বিধান কর। আমি তোমাকে নমস্কার  
করি।

তাৎপর্য—যখন “শূল-পুস্তক-ধারিণী” এই বিশেষণ  
প্রদত্ত হইয়াছে, তখন রম্ভারূপা যে বুদ্ধিশক্তি পরা প্রকৃতি  
সরস্বতী, তাহা বলা হইয়াছে। মম হৃদগাহররূপ গৃহে সমা-  
গমন পূর্বক সংসার-দুঃখের শান্তি বিধান কর। অর্থাৎ পুনঃ  
পুনঃ জন্ম-মরণ-যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত কর। ইত্যর্থেরূপক-  
সজ্জাতে রম্ভারূপা বলিয়া সম্বোধন মাত্র। বস্তুতঃ ইহা রম্ভা-  
তরুস্থিতা ব্রহ্মশক্তির অর্চনা ; ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী।

কচ্চীস্বাকালিকার অর্চনা ও প্রার্থনা বাক্য এই ;—

মহিষাসুরযুদ্ধে ত্বং কচ্চীরূপাসি সূত্রতে।

মমচানুগ্রহার্থায় আগচ্ছ মম মন্দিরং।

মায়াবীজেন সা পূজ্যা হরিদ্রামথ চিত্তয়েৎ।

হে দেবি ! তুমি মহিষাসুরযুদ্ধে (দেবরাজের প্রতি অনুকম্পা  
করিয়া) কচ্চীরূপা হইয়া মহিষ নির্যাতন করিয়াছ ; অতএব  
তুমি আমার মন্দিরে আগমন কর। এইরূপে ইহাকে মায়া-  
বীজে পূজা করিয়া অনন্তর হরিদ্রার পূজা করিবে।

পূর্বোক্ত মহিষমর্দিনীর স্বরূপার্থে যত্নরূপ মহিষকে  
তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপা দুর্গা দেবী নির্যাতন করিয়াছিলেন। সেই  
বিষ্ণু-দুর্গা বৈষ্ণবীশক্তির সম্যক্ উদয়ে সাধক যত্নকে জয়

করিয়া সাক্ষাৎ যুক্ত্যঞ্জয় হয়। এস্থলে এইরূপ অভিপ্রায় নিগূঢ় রহিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য ব্রহ্মের অর্চনাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে এ সকলই অধ্যাত্মতত্ত্ব-পক্ষে ব্রহ্ম-নাড়ীর শাখা নাড়ী হয়; তাহাতে প্রাণায়াম-প্রভাবে প্রাণ-বায়ুর সঞ্চারে তত্ত্বোপযোগী সাধন সামগ্রী অর্থাৎ স্মৃতি, বৃত্তি, দয়াদির উদয় হয়। তাহা হইলেই অমরগ ধর্ম লাভ হইয়া থাকে। অগ্রে এই নয় প্রকার উপকরণসিদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে যে প্রাণবায়ুর প্রবেশ, তাহাই এস্থলে পত্রিকা-প্রবেশ বলিয়া গণনীয়।

এই নবপত্রিকা না হইলে দুর্গোৎসব হয় না; অর্থাৎ পূর্বের সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের অধিকারী হয় না; শাস্ত্রকর্তারা রূপকব্যাজে ইহাই জানাইয়াছেন। ইহাতে ভোগ ও মোক্ষ দুই ফলই আছে; একারণ শ্রীফলযুগ্মে অন্বিত করিতে কহিয়াছেন।

দেবীপক্ষে যত মূর্তি, সে সমুদায়ই কেবল ব্রহ্মবিভূতি। ইহার কিছুমাত্রই অলৌক পদার্থ নহে। যেমন স্বর্ণ একমাত্র পদার্থ, কিন্তু তাহাতে কেয়ুর, কটক, কটিসূত্র, বলয়, কঙ্কণাদি উপাধিভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সকলই স্বর্ণ ব্যতীত অন্য পদার্থ নহে; সেইরূপ ব্রহ্ম এক পদার্থ; কিন্তু উপাধি-যোগে নানারূপে বিভাতি অর্থাৎ সাধকদিগের রুচিবৈচিত্র্য-প্রযুক্ত বহুবিধ হইয়াছেন। যাহার যাঁহাতে রুচি, সে তাঁহা-কেই উপাসনা করিয়া থাকে এবং তৎসেবাতেই যুক্ত হয়;

ইহার অন্যথা নাই, শাস্ত্রপ্রণেতারা এই অভিপ্রায় নানাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি বল, ঐ সকলকে ব্রহ্মবিভূতি স্বীকার করিলে ব্রহ্মোপাসনা করাই কৰ্ত্তব্য, বিভূতিরূপের উপাসনার ফল কি? তাহার উত্তর এই যে, পরমব্রহ্মোপাসনাপক্ষে বাহ্যে বিশেষ আড়ম্বর নাই, তাহাতে অন্তর্যাগমাত্র করিবে; কিন্তু অন্তর্যাগাপেক্ষা বহির্যোগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে, যে পরমাত্মা যেমন প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে আছেন, সেইরূপ বাহিরেও আছেন। যথা—

“অন্তর্কর্ষিঃ পুরুষঃ কালরূপ ইতি।”

অর্থাৎ তৎসত্তা-রহিত স্থানমাত্র নাই। অতএব গন্ধ-পুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখ-চন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি—এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে যে কোন প্রতিমাদি সন্নিধানে অর্পণ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এইরূপ বিবেচনাতেই শাস্ত্রে বাহ্য-পূজার বিধান উক্ত করিয়াছেন। যথা—

“পত্রং পুষ্পং ফলং তৈরং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতীতি।”

যে ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি ভক্তি পূর্বক প্রদান করে, তাহার প্রতি তাহাতেই আমার তুষ্টি জন্মে। অতএব পৌত্তলিক বলিয়া দেবপূজকের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিলে যে যথার্থ জ্ঞানী হয়, এমত নহে।

সকল শাস্ত্রেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যে জৈমিনি ঋষি সন্দিহান হইয়া পক্ষিরূপী দ্রোণপুত্রচতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক-আধার ভগবান্ বাসুদেব সকলের কারণ-স্বরূপ এবং কারণের কারণ, নিগূর্ণ হইয়াও কি কারণে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? পক্ষিগণ উত্তর করেন, হে ঋষে ! অনাদিনিধন ভগবান্ বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা মায়ো-পাধি-বিশিষ্ট হইয়া জীববৎ ক্রীড়া করিয়াছেন। ফলে তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ বিবেচনা করিও না। কারণ, রূপের স্বরূপ বিবেচনা করিলে জ্ঞানমূল সচ্চিদানন্দ পরাবিদ্যাই কল্পিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেই মূর্ত্তি শুদ্ধা, অতি নিৰ্ম্মলা, সামান্য জীবমূর্ত্তির ন্যায় নহে। তত্ত্বমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা স্বরূপা হইয়া বর্ত্তমানই রহিয়াছে। হে ঋষিবর ! তুমি ইহাই যথার্থ জ্ঞান করিও। যদি বল, পূৰ্ব্বোক্ত পূজাদি গ্রহণ ও স্তবাদি শ্রবণ অশরীররূপে প্রতিপন্ন হইবার সম্ভতি কি ? তাহার উত্তর এই যে, শ্রুতিতে তাঁহাকে সৰ্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। যথা—

“অপাণিপাদে। জবনগ্রহীতা,

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ।

স সৰ্ব্বেভ্যো নহি তস্য বেত্তা

তমাছরাদ্যং পুরুষপ্রধানম্ ॥”

তাঁহার হস্ত নাই, কিন্তু তিনি সকলই গ্রহণ করেন ; চরণ নাই, কিন্তু সৰ্ব্বত্র গমন করেন ; তিনি অচক্ষু, কিন্তু সকলই

দেখিতে পান ; কর্ণ নাই, অথচ সকল শুনেন ; তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, সেই পুরুষ-প্রধান পরমাত্মা সকলের আদি হইলেন ।

এরূপ শক্তিমান্ পরমাত্মার যে কোনরূপে অর্চনা করিলে যে পূজা না হয়, এমত কেহই বলিতে পারেন না ; এবং পূজাতেও যে তাঁহার তুষ্টি না জন্মে, এমত প্রমাণ কি আছে ? আর তাহাতে যে মোক্ষ লাভ হইবে না, ইহাই বা কে বলে ? তিনি এক, কিন্তু অনেক হইয়াছেন । অনেকত্ব পরিচ্ছিন্নের গুণ । অতএব তাঁহাকে অপরিচ্ছিন্নরূপেই মান্য করিতে হইবে । তিনি যে স্বরূপ, কি অরূপ, ইহার কিছুই নির্ণয় হয় না । যথা শ্রুতিঃ—

অগ্নির্ধৈকো ভুবনপ্রবিষ্টো  
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।  
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা  
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ । ইতি ॥

যেমন অগ্নি এক, কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ-পাষাণাদিতে নানারূপ হইয়াছেন, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্নি হইলেন ; সেইরূপ পরমাত্মা সর্বজীবের এক অন্তরাত্মা হইয়াও রূপে রূপে অনেকরূপ হইয়াছেন । ইহাতেও পরমেশ্বরকে সগুণ-নিগুণ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ তাঁহাতে ও বিভূতিতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই । সর্বত্র সকল রূপেই তিনি উপাস্য হইলেন ; এবং ভাগবতেও কহিয়াছেন যথা—

যঃ প্রাকৃতৈজ্ঞানপথৈর্জনানাং  
 যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি ।  
 যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণঃ  
 স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥

যেমন একমাত্র ( গন্ধগুণরহিত ) বায়ু বিবিধ পার্থিব  
 পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে,  
 সেইরূপ যিনি মনুষ্যগণের প্রাকৃত উপাসনা দ্বারা তাহাদিগের  
 অভিলাষানুরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি পান,  
 সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ সফল করুন ।

ইহাতেও তাঁহাকে সগুণ-নিগুণ কহিয়াছেন, স্মৃতরাং

“ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ।”

এই বচনের চরিতার্থতা হইল ; অর্থাৎ সাধকদিগের  
 সাধ্য যতরূপ, সকলই পরমেশ্বর-রূপ বলিতে হইবে । মুণ্ড-  
 মালাতন্ত্রেও মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিয়াছেন ; যথা—

নিগুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেবচ নিগুণঃ ।  
 যদৈব সগুণাৎসংহি সগুণোহং সদাশিবঃ ॥  
 সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নিগুণঃ শিবঃ ।  
 উপাসকানাং সিদ্ধার্থং সগুণা সগুণোমতঃ ॥

সপ্তম পটলম্ ।

প্রকৃতি বস্তুতঃ নিগুণা এবং আমিও নিগুণ । যেকালে  
 তুমি সগুণা হও, সেকালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হই ।  
 প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য ; শিব যে নিগুণ, ইহাও সত্য ;

ফলতঃ উপাসকদিগের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণরূপে কল্পিত হই।

এই প্রমাণে পরমেশ্বরকে সগুণ ও নিগুণ উভয়রূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা মায়াতীত উপাসনাকাণ্ডে শিবসংজ্ঞা গ্রহণ করতঃ তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে জ্ঞাতব্য যে, পরমেশ্বরের মায়ারূপা শক্তিই কেনেঘিত উপনিষদে উমানামে বাচ্য হইয়াছেন। যথা—

তন্মিন্নেবাকাশে স্তিয়মাজগাম বহুশোভমানমুখাং

হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি । ২৫ ।

তাৎপর্য্য সহিত অর্থ এই যে—যৎকালে অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মকে জানিতে গিয়া পরাজিত হন এবং দেবরাজ ইন্দ্র গমন করাতে ব্রহ্ম অদর্শন হইলেন, তৎকালে সেই আকাশ মণ্ডলে বহুশোভমানা অর্থাৎ নানালঙ্কারবিশিষ্টা উমা নামে একটি স্ত্রী আগমন করিলেন ; তাহাকে হৈমবতী অর্থাৎ হিম-বদুহিতা বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লেখ করেন। তাহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, এই যক্ষ অর্থাৎ পূজ্য পুরুষ কে ?

ইহাতে ইহাই ভাসমান হইল, যে পরব্রহ্ম দেবরাজকে প্রকৃতিরূপে উপদেশ দিবার জন্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; নতুবা অন্যে ব্রহ্মের স্বরূপ কহিতে শক্তিমান নহেন। সূতরাং এতৎ-শ্রুতি-প্রমাণে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্ম জানিয়া তন্ত্ৰাদিতে হরপার্বতীকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বক্তা ও শ্রোত্রী হরপার্বতী দম্পতিরূপে দেবদেবী নহেন।

কিঞ্চ

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যন্ত্রকৃতাদেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥

স্মৃতিঃ, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং ।

ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদান্তের স্তাবক মাত্র ; অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট বেদ প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হন ।

অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করতঃ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারকে স্পর্শ করিয়া পাণ্ডিত্য-ভিমানী হয়, তাহারা কখনই বেদের স্বরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না । পরিশেষে প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তর্কদ্বারা অর্থবাদ সকলকেই যথার্থবাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে । ফলিতার্থ একালে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে । এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপ ও দেবদেবীর উপাসনা বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । বেদে যে অর্থ বাদ আছে, তাহা ভগবান্ বাদরায়ণি ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশং শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন । পরমদয়ালু ঋষিগণ বেদান্ত বুঝাইবার জন্য উপান্যাসচ্ছলে পুরাণাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন । কালক্রমে হতভাগ্য জনেরা সে ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া পুরাণাখ্যানকে যথার্থই উপন্যাস জ্ঞান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।



## উপসংহার।

“হিন্দুধর্মতত্ত্ব” পুস্তকে অনির্দেশ্য অসীমবৎ কাল হইতে প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্মের যে কয়েকটি মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, যথার্থ বুঝুৎসুভাবে তাহা অনুধ্যান করিলে কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার লাভ হইতে পারে কি না, তাহার সিদ্ধান্ত চিন্তাশীল পাঠকমহাশয়দিগের প্রতিই নির্ভর করিতেছে।

আমাদিগের সনাতন হিন্দুধর্ম যে, কেবল আমাদিগের পিতৃপৈতামহিক ধর্ম বলিয়া আমরা পক্ষপাত বশতঃ তাহার উৎকৃষ্টতা প্রত্যাশন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, অথবা তদ্বিষয়ে আমাদের কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, এরূপ নহে; গভীর চিন্তা এবং কঠোর তর্কবারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মের মধ্যে ইহার সর্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। (১)

হিন্দুধর্ম পূর্ণাবয়ব। মানবজাতির পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে যে কোন ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তাহা কদাচই পূর্ণাবয়ব হয় না। পৃথিবীতে সভ্যতাসম্পন্ন জটিল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বদীর্ঘ-বিবেচনা পূর্বক সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যে সকল রাজ্যশাসন ব্যবস্থা (আইন) স্থাপ্তি করিতেছেন, কিছুদিন

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” নামক পুস্তক দেখ।

পরেই তাহার অনেকাংশের অসারতা ও অকর্মণ্যতা প্রতি-  
পন্ন হইতেছে এবং তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের  
অভাব লক্ষিত হইতেছে। হিন্দুধর্মের অবয়ব সংঘটনের  
বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহার সৃষ্টিকর্তাকে  
পরিচ্ছন্ন-বুদ্ধি মনুষ্য বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না।  
তথাহি,—

( ১ ) হিন্দুধর্মের মনুষ্যের মনোবৃত্তিগত বৈলক্ষণ্যরূপ  
অকাল্পনিক প্রাকৃতিক বিভাগ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য সমা-  
জকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। কতকগুলি সত্ত্ব-  
প্রধান, কতকগুলি রজোগুণ-প্রধান এবং কতকগুলি তমো-  
গুণ-প্রধান। তদনুসারে মনুষ্যের কর্তব্য-কার্যের ব্যবস্থা-  
সকল সাধারণতঃ তিন ভাগে পর্যাবসিত হইয়াছে। কি বেদ,  
কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সর্বশাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ প্রদ-  
র্শন করিতেছে।

( ২ ) ইহাতে মনুষ্যদিগের মাসিক প্রকৃতি, শারী-  
রিক শক্তি এবং কার্যসাধনের উপযোগিতা ইত্যাদি প্রাকৃ-  
তিক বিভাগ অনুসারে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির নিমিত্ত ভিন্ন  
ভিন্ন প্রকার কর্তব্য কার্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

( ৩ ) হিন্দুধর্মের মানবদিগের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিমান,  
মধ্যবিধ এবং নিতান্ত মূঢ় এই ত্রিবিধ ব্যক্তির পক্ষে একবিধ  
ধর্মামুষ্ঠানের ব্যবস্থা নহে। ইহাদিগের বিভিন্ন প্রকার  
ধর্মামুষ্ঠান ব্যবস্থা সর্বশাস্ত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

( ৪ ) হিন্দুধর্মে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোকের বয়ঃক্রম অনুসারে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুযায়িক্রমে বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্তব্য কার্যের ব্যবস্থা সর্বশাস্ত্রে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

( ৫ ) মনুষ্যের সহজ অবস্থা এবং আপৎকাল এই উভয়ত্র একবিধ কার্য্যানুষ্ঠান ব্যবস্থা ন্যায়ময় জগদীশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ ন্যায়পরতারূপের অনুমোদিত নহে । এই নিমিত্ত হিন্দুধর্মে মনুষ্যের উল্লিখিত দ্বিবিধ অবস্থার কার্য্যকে দুই ভাগ করিয়া শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে । এক মাত্র মহাভারত গ্রন্থের “রাজধর্ম ” ও “ আপদধর্ম ” ইহার প্রবলতর প্রমাণস্বরূপ ।

( ৬ ) একজন অসাধারণ ধনবান্ ব্যক্তির দশসহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তির এক মুদ্রা অর্থদণ্ড এই উভয়ই তুল্য, ইহা ক্ষুণ্ণজ্ঞান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন । হিন্দুধর্মে দূরদর্শী শাস্ত্রপ্রণেতারা তদ্বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । ইহাতে পাপের অর্থদণ্ড স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি বিষয়ে অধিক ধনী, অল্প ধনী, দরিদ্র, দরিদ্রতর ও দরিদ্রতম ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে বিশদরূপে বর্ণিত থাকিয়া তদ্বিষয়ের সাক্ষ্যদান করিতেছে ।

( ৭ ) হিন্দুধর্মশাস্ত্রে হুস্থ ও পীড়িত, বলবান্ ও দুর্বল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ক্ষমতা বিশিষ্ট মানবগণের পাপ ও

পুণ্যের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঐ সকল শাস্ত্রের প্রণেতাদিগকে ন্যায়ময় জগদীশ্বরের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধিত হইয়া উঠেন।

( ৮ ) হিন্দুধর্মের যাবতীয় শাস্ত্র এক বাক্যে মানবগণের পাপ ও পুণ্যের আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে দণ্ড ও পুরস্কারের নূন্যাধিক্য বর্ণন করিয়া হিন্দুধর্ম যে, ন্যায়ময় ও দয়াময় জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ, ইহার স্পষ্টতর সাক্ষ্য দান করিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য আড়ম্বরময় অসার ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম এরূপ বলেন না যে, “একটি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে জীবাত্মা অনন্তকাল নরকভোগ করিবে, অথবা একটা পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে।

( ৯ ) এই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কি শারীরিক কি মানসিক, কি ভৌতিক কোন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন অথবা অপ্রতিপালনের আবশ্যিকতা হয় না। প্রত্যুত দেশ, কাল, পাত্র ও অধিকারী ভেদে ঐ সর্ব প্রকার নিয়ম সামঞ্জস্যরূপে প্রতিপালন করিবার স্পষ্টতর বিধি দৃঢ়রূপে প্রণীত হইয়াছে।

( ১০ ) কোন কোন ব্যক্তির এরূপ সংস্কার আছে যে, হিন্দুধর্মশাস্ত্র সকল ধর্ম্যানুষ্ঠান বিষয়ে এত বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছে যে, তদ্বারা ধর্মবিষয়ক কোন রূপ স্থির-সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

“বেদা বিভিমাঃ স্মৃতয়ো বিভিমাঃ

নাসৌ মুনির্ধন্য মতং ন তিগম্।

ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং

মহাজনো যেন গতঃ স পশ্বাঃ ॥”

এইরূপ দুই চারিটা কথা শ্রবণ করিয়া ঐরূপ সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক মাত্র। হিন্দুধর্ম বিষয়ে “কোরাণ” অথবা “বাইবেলের” ন্যায় একখানি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তকে সর্ব প্রকার ব্যবস্থার সমাপ্তি নাই; সমুদ্রবৎ বিস্তৃত গ্রন্থ সমূহে ইহার ব্যবস্থা সকল বিস্তারিত রহিয়াছে। সুতরাং দুই একখানি গ্রন্থ পাঠ অথবা দুই এক ব্যক্তির উপদেশবাক্য শ্রবণ দ্বারা আপাততঃ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলতা অনুভব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ফলতঃ হিন্দুধর্মশাস্ত্রে প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে কিছু মাত্র মতদ্বৈধ নাই; ইহা মীমাংসা শাস্ত্র সকলে অতি স্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধিক কি রঘুনন্দন প্রণীত একমাত্র “স্মৃতি সংগ্রহ” গ্রন্থ ইহার সম্ভাবজনক প্রমাণ হইতে পারে।

(১১) ভাগবত গ্রন্থের “রাসলীলা” তন্ত্রশাস্ত্রের “পঞ্চোপাসনা” ইত্যাদি বর্ণনা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কোন কোন ব্যক্তির এরূপ সংস্কারও জন্মিতে পারে যে, নানাবদ্বিপকে বিমোহিত করা ঐ সকল শাস্ত্রকর্তার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বিনা কারণে অন্যের অপকার সাধনার্থ

দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে শাস্ত্রকর্তাদিগের প্রবৃত্তি হওয়া কি সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থকর্তা শাস্ত্রান্তরে আপনার অপরিমিত জ্ঞান, অসাধারণ বুদ্ধি ও অলৌকিক পরহিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা লোকের অপকার সাধনার্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, হতজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হয়। ফলতঃ যে সকল শাস্ত্রের কিয়দংশের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া লোকের উল্লিখিতরূপ বিষম কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহারই অপরাংশের বর্ণনা শ্রবণ করিলে তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের ভ্রমাস্ককার নিরাকৃত হইয়া জ্ঞানালোক সমুদীপিত হইতে পারে।

( ১২ ) এতদ্ভিন্ন সনাতন হিন্দুধর্ম পরলোকের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া ন্যায়ময় জগদীশ্বরের দণ্ড ও পুরস্কারের যেরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্টতা-সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আর কি অকাটা প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে?

ফলতঃ অনুধ্যানশীল ব্যক্তিগণের ইহা অনুধাবন করা আবশ্যক যে পৃথিবীতে মানব সমাজে যে কয়েক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী প্রচলিত আছে, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি বাস্তবিক তাহার কাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অথবা ইহা সর্ব-গুণ-সম্পন্ন হইয়াও বর্তমান জনসমাজের অনবধান অথবা অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত অবজ্ঞাত হইতেছে? যদি কোন চির-

সম্ভ্রান্ত ধার্মিক ব্যক্তিকে বিনাপরাধে দণ্ডিত হইতে দেখিয়া, দয়াপ্রধান মানবজীব বাষ্প বিসর্জ্জন না করে, যদি কোন মহোপকারী ব্যক্তির নিকট স্বদীর্ঘকাল উপকার লাভ করিয়া, ভ্রম-প্রমাদাদি বশতঃ তাঁহার প্রতি অসদ্ ব্যবহার করিবার পরক্ষণেই অন্তঃকরণ ক্ষোভানলে দগ্ধ না হয়, তবে কি পশ্বাদি নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা মানব জাতির কিছুমাত্র মহত্ত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে ?

পরিশেষে পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই যে, বিদ্বেষ বুদ্ধি অথবা অবজ্ঞার সহিত কোন পদার্থের আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেও তাহার সুন্দরতা বা উৎকৃষ্টতা অনুভূত হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বিজাতীয় ধর্মাস্তরের প্রতি পক্ষপাত অথবা হিন্দুধর্মের প্রতি বিষম বিদ্বেষ ও দারুণ অবজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং যেন কোন ধর্মাবলম্বী নহি, এইরূপ বোধের সহিত যথার্থ বুভুৎসুভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের দোষ, গুণ বিচার করিয়া দেখিলেই হিন্দুধর্ম যে, কুরুপা পদার্থ, আমা-দিগের অর্থাৎ হিন্দুজাতীয় ব্যক্তিদিগের হিন্দুধর্মের সহিত কেমন গুরুতর সম্বন্ধ,—আমাদিগের পূর্বতন পুরুষেরা হিন্দুধর্মের নিকট কেমন ঋণী আছেন,—আমাদিগের শারীরিক ও মান-সিক প্রকৃতির পক্ষে হিন্দুধর্ম কেমন পূর্ণরূপে উপযোগী, তাহা অনেক পরিমাণে অনুভূত হইতে পারিবে।

আমরা হিন্দুজাতিতে উৎপন্ন ও হিন্দুর সম্ভানরূপে পরি-চিত হইয়া হিন্দুধর্মকে কিরূপে বিন্যস্ত হইব ?—হিন্দুধর্মের

স্নেহবন্ধনকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব ? যখন আমরা হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাত্ৰচন্দ্রশ্রী-জটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন,—

“আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।”

যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনঃচক্ষু সন্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্তি আবির্ভূত হয়। যিনি বলিয়াছেন,—

“ যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি ।

অন্যং ত্বগমিব ত্যজ্যামপ্যুক্তং পদ্মজয়না ” ॥

হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনঃচক্ষু-সন্মুখে সেই নবীন দূর্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্তমূর্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্য পালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসরকাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন এবং জিতেদ্রিয়ত্ব ও সত্যবাদিতার পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনঃচক্ষু সন্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্মশব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে সেই অলোক-নামান্য পুরুষ আমাদের মনঃচক্ষু-সন্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যা কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য



ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।—এই নাম উচ্চারিত হইলে সেই মহামনাঃ রাজর্ষি জনক আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পূজ্যাপূজ্যরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও এক মুহূর্ত্তও অধ্যাত্মযোগ হইতে স্থানিত হইতেন না।—হিন্দু নাম কি মনোহর! এ নাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভা ধারণ করে। এই নাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাহ্মণত্রে সম্বন্ধ হইবে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রাজপুত, মারহাট্টা, মান্দ্রাজি, সমস্ত হিন্দুবর্গ একহৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত অর্থ্য শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদের শিরায় প্রবাহিত হইবে, আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুকরণ করিব? ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বৌদ্ধের হানি হয় এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। এমন অনুকরণপ্রিয় যে, আজি যদি চীনেরা আসিয়া আমাদের দেশের রাজা হয়, তাহা হইলে তাহারা কল্য পশ্চাদ্দেশে আপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে? ভারতবর্ষে কি শত শত, সহস্র

সকল লোক নাই, যাঁহারা এইরূপ ক্রীতদাসের ন্যায়  
 ক্রান্তকে অনুকরণ করিতে বিমুখ ? এমন সকল উন্নত পু  
 রুষদি ভারত ভূমিতে নী থাকেন, তবে ভারত সমুদ্রের তর  
 ফানিয়া ভারতভূমিকে ডুবাইয়া দিউক, ভারতভূমি পৃথিবী  
 মনোচিত হইতে অন্তর্হিত হউক, তাহাতে কিছুমাত্র কা  
 র্য নাই।

ইতি।











